
অভিরূপ সরকার
HOTEL
কুমুদিনী
বিত্ত নিগম
রহস্য

কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্য

কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্য

অভিরূপ সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

KUMUDINI BITTYA NIGOM RAHASHYA
by Avirup Sarkar

ISBN 978-93-89983-32-6
Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

রচনাকাল
৯ মার্চ, ২০২০ (দোলযাত্রা, ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৬)—৩০ অক্টোবর,
২০২০ (লক্ষ্মীপুজো, ১৩ কার্তিক, ১৪২৭)

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ সৌম্যদীপ প্রধান
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

ঋণ স্বীকার

'কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্য' আমার চতুর্থ রহস্য উপন্যাস, তিন নম্বর ডিটেকটিভ বই। টের পাচ্ছি, গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার ব্যাপারে আমার আগ্রহ কিছুতেই কমছে না। আগের দুটি গ্রন্থের প্রকাশক, দীপ প্রকাশন-এর শংকর মণ্ডল, এই বইটিও প্রকাশ করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

সারস্বত গবেষণাপত্র যেমন প্রকাশিত হওয়ার আগে বহু বিদ্বজ্জনের মন্তব্য লাভ করে সমৃদ্ধ এবং পরিবর্তিত হয়, এই বইটির প্রাক-মুদ্রণ পাণ্ডুলিপিটিও সেইরকম নানাজনের পরামর্শে উপকৃত ও পরিমার্জিত হয়েছে। যাঁরা সুপরামর্শ দিয়ে এই গোয়েন্দা কাহিনির বাঁধুনিকে আরও মজবুত করেছেন, সেই অগ্নিরূপ সরকার, পরন্তপ বসু, পার্থ রায়, মহুয়া সেনগুপ্ত, শিউলি সরকার, শ্রীজিৎ মল্লিক সর্বজিৎ সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, সুস্মিতা মৈত্র এবং সৌম্যেন্দ্র সিকদার-এর প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করি।

আরও বড় ঋণ বাংলা সাহিত্যের অনুপম কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আমার আগের দুটি বই পড়ে তিনি উৎসাহ না দিলে পরপর গোয়েন্দা কাহিনি লিখে যাওয়ার সাহস, মনে হয় না, সঞ্চয় করে উঠতে পারতাম। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে এই সামান্য বইটি তাঁকে উৎসর্গ করছি।

অভিরূপ সরকার

শ্রীযুক্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

দুটো লোক ঘরে ঢুকেছে। একটা লম্বা, একটা বেঁটে।

'আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম,' লম্বা লোকটা জানাল। তারপর এগিয়ে আদিত্যর টেবিলের সামনে এসে বলল, 'বসতে পারি?'

'বসুন, বসুন। অবশ্যই বসুন।' আদিত্য লম্বাকে কথাটা বলে তার সঙ্গের বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও বসুন।'

লম্বা লোকটা আদিত্যর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। হাতের বড় নীল রঙের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল পায়ের নিচে। বেঁটে কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে আদিত্য আবার বলল, 'আপনি বসুন।'

আদিত্য বলা সত্ত্বেও বেঁটে লোকটা ঠায় দাঁড়িয়েই রইল। আদিত্যর মনে হল, লম্বা-বেঁটের মধ্যে একটা শ্রেণিবিভাগ আছে। লম্বার পাশে বসার অধিকার বেঁটের নেই। ব্যাপারটা আদিত্যর আগেই বোঝা উচিত ছিল। লম্বা-বেঁটের হাবভাব, পোশাক-আশাক, চেহারা-বয়েস সব কিছুই আলাদা। লম্বার পরনে ধোপদুরস্ত ফুলহাতা সাদা শার্ট, গাঢ় রঙের ট্রাউজার। বুক-পকেটে পেন গোঁজা। বয়েস, মনে হয়, পঞ্চাশের এদিক-ওদিক। তার বেঁটে সঙ্গী প্যান্ট-টি-শার্ট পরেছে, দুটোই একটু বেশি চকচকে, সস্তার জিনিস যেমন হয়। আদিত্য লক্ষ করল, টি-শার্টটা বাঁ-দিকে বগলের নিচ থেকে সামান্য ফুলে আছে। চট করে চোখে পড়ে না, নজর করে দেখলে বোঝা যায়। বেঁটে লোকটার বয়েস তিরিশের বেশি হবে না।

একটু আগে শ্যামল চা আনতে গেছে। যাওয়ার সময় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে যায়নি। সেই ভেজানো দরজা ঠেলে লম্বা-বেঁটে দুজনে আদিত্যর আপিসে ঢুকে পড়েছে। একবার নক করে ঢুকবে তো! বেঁটে না হয় লম্বার তল্পিবাহক হয়ে এসেছে, কিন্তু লম্বার তো এইটুকু সহবত জ্ঞান থাকা উচিত ছিল।

'আমার নাম তারক দাস, আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম।' লম্বা লোকটা দ্বিতীয়বার মনে করিয়ে দিল। তার সঙ্গীর সঙ্গে আদিত্যর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন বোধ করল না সে। বেঁটে লোকটা যেন ঘরে থেকেও নেই।

আদিত্যর মনে পড়ে গেল গত পরশু এই তারক দাসই তাকে ফোন করেছিল। বলেছিল, বিশেষ দরকার, আজ দেখা করতে আসবে। তারপর অবশ্য আর ফোন-টোন করেনি। কী দরকারে আদিত্যর সঙ্গে দেখা করতে চায় সেটাও ফোনে বলেনি।

শ্যামল চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। হাতে কেটলি আর ভাঁড়। আজকাল আদিত্য ঘরেই চা-কফি বানিয়ে নেয়, কিন্তু কদিন হল চা এবং কফি দুটোই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ শ্যামলকে পাঁচ-ছকাপ চা আনতে বলেছিল। ইচ্ছে ছিল, ফ্লাস্কে রেখে সারাদিন চালিয়ে নেবে। ভালই হল, অতিথিদের জন্য চা আনতে শ্যামলকে আর নীচে যেতে হবে না। এই পুরোনো বাড়ির সিঁড়িগুলো বেজায় উঁচু-উঁচু, সিঁড়ি ভাঙতে বেশ কষ্ট হয়। সে লম্বা লোকটাকে বলল, 'আপনারা একটু চা খাবেন তো?'

লোকটা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবার পর আদিত্য খেয়াল করল তার ঘরে মাত্র দুটো কাপই আছে। ভাগ্যিস শ্যামল একটা ভাঁড় সঙ্গে এনেছিল। দুটো কাপে চা ঢেলে শ্যামল আদিত্যর টেবিলে রাখল। একটা আদিত্যর জন্যে, আর-একটা তার উলটো দিকে উপবিষ্ট তারক দাসের জন্যে। তারপর ভাঁড়ে চা ঢেলে এগিয়ে দিল বেঁটের দিকে। মনে হয়, শ্যামলও লম্বা-বেঁটের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্যটা ধরতে পেরেছে। বেঁটে

চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে তাতে সশব্দে চুমুক লাগাল। কেটলির উদ্বৃত্ত চা দেরাজের ওপরে রাখা ফ্লাস্কে ঢেলে দিয়ে শ্যামল চলে গেল। যাওয়ার সময় দরজাটাও বন্ধ করে দিয়ে গেল।

লম্বা লোকটা, অর্থাৎ তারক দাস, মনে হয় শ্যামল চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শ্যামল চলে যাওয়ার পর সে মুখ খুলল, 'আমার আসার কারণটা এবার বলি।'

আদিত্য হাত তুলে বলল, 'এক মিনিট।' তারপর সে উঠে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে ফের চেয়ারে এসে বসল। ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে তারক দাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চলবে?'

খানিক ইতস্তত করে সিগারেট গ্রহণ করল তারক দাস। আদিত্য তার এবং নিজের সিগারেট ধরিয়ে পোড়া দেশলাই কাঠিটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এবার বলুন।'

'আমরা জগৎমাতা টোব্যাকো কম্পানি থেকে আসছি। আমি কম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। হালিশহরের কাছে আমাদের ফ্যাক্টরি। আমাদের কম্পানির নাম নিশ্চয় শুনেছেন।'

তারক দাসের বলার ভঙ্গীতে মনে হল, শিশু বয়েস থেকে প্রতিটি বাঙালির জগৎমাতা টোব্যাকো কম্পানির কথা জানা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, ওরকম কোনও নাম আদিত্য কস্মিনকালেও শোনেনি। কিন্তু তারক দাসকে সেকথা জানালে সে যে শুধু মর্মাহত হবে তাই নয়, সম্ভবত আদিত্যর সাধারণ জ্ঞান নিয়েও সন্দিহান হয়ে উঠবে। তাই আদিত্য মুখ দিয়ে এমন একটা শব্দ করল যার মানে হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে।

তারক দাস অবশ্য আদিত্যর সম্মতির তোয়াক্কা না করেই বলতে লাগল, 'আমাদের ফ্যাক্টরিটা গঙ্গার ধারেই। রামপ্রসাদের ভিটে থেকে পনেরো মিনিটের রাস্তা। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে থেকে সরাসরি এলে মিনিট পঁচিশ। কিছুদিন হল টাকা-পয়সা নিয়ে কম্পানিতে গণ্ডগোল লেগেছে। একটা বড় রকমের টাকা উধাও হয়ে গেছে। তার হদিশ করার জন্য আমাদের কম্পানির মালিক আপনাকে নিয়োগ করতে চান। আপনি রাজি হলে আপনাকে নিয়ে হালিশহর যাব। ওখানেই মালিক থাকেন।'

'আপনাদের কম্পানি তো বিড়ি তৈরি করে।' আদিত্য আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। তবে আন্দাজটা ইংরেজিতে যাকে বলে এডুকেটেড গেস। দিশি টোব্যাকো কম্পানি বিড়ি ছাড়া আর কী তৈরি করতে পারে?

'তৈরি করে মানে?' আদিত্যর ন্যূনকথনে তারক দাস বিস্মিত। 'শুধু উত্তর চব্বিশ পরগনা নয়, সমস্ত সাউথ বেঙ্গলে আমাদের মতো বড় বিড়ি ফ্যাক্টরি আর নেই। মনমোহন বিড়ি অবশ্য দাবি করে ওরা আমাদের থেকেও বড়। কিন্তু ওদের হিসেবে অনেক জল আছে। আমরা বছরে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকার বিড়ি তৈরি করি।'

'পঞ্চাশ-ষাট কোটি!' আদিত্য এবারে সত্যি-সত্যি অপ্রস্তুত। তার কোনও ধারণাই ছিল না বিড়ির ব্যবসা এত বড় হতে পারে।

'তার থেকে বেশি বই কম নয়। আমাদের ফ্যাক্টরিতে কতজন কাজ করে জানেন? সরাসরি কাজ করে পাঁচ হাজার, বাইরে বিড়ি বাঁধার কাজ করে আরও হাজার কুড়ি। এতগুলো মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে যে কম্পানি তার গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন?'

আদিত্য বুঝতে পেরেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'তা আপনাদের কম্পানিতে গণ্ডগোলটা কোথায়, একটু খুলে বলবেন?'

'খুলে আমি বলতে পারব না। ব্যাপারটা আমি ওপর ওপর জানি। এইটুকু জানি যে একটা মোটা টাকার গড়বড় হয়েছে। কীভাবে হল, কে টাকাটা নিতে পারে সেসব জানেন আমাদের মালিক। তিনিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি গেলে তিনি সব কথা খুলে বলবেন। অবশ্য আপনার যদি যেতে আপত্তি না থাকে।'

'না, না। আপত্তি কীসের। কবে যেতে হবে বলুন।'

'আমার ওপর হুকুম হয়েছে সম্ভব হলে আপনাকে আজই নিয়ে যেতে। এখন যেতে পারবেন? ঘন্টা দুয়েক-এ পৌঁছে যাব।'

আদিত্য দেখল ঘড়িতে এগারোটা দশ বেজেছে। এখন রওনা হলে সন্ধে ছ-টা-সাতটার মধ্যে ফিরে আসা যাবে। সে বলল, 'ঠিক আছে। চলুন। আমার অসুবিধে নেই।'

'রবিকে ফোন করে গাড়িটা এখানে নিয়ে আসতে বল। কোথায় পার্ক করেছে কে জানে?' তারক দাস তার বেঁটে সঙ্গীকে নির্দেশ দিল। তারপর আদিত্যর দিকে ফিরে অভিযোগের স্বরে বলল, 'আপনাদের এখানে গাড়ি রাখার খুব ঝামেলা, দাদা।'

বেঁটে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে ফোন করছে, তারক দাস একটু নীচু গলায় আদিত্যকে বলল, 'আপনি আপনার ফিস-এর ব্যাপারটা নিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।'

'সে ঠিক আছে। আপনি শুধু বলুন আপনার এই সঙ্গীটি কে? ও আপনার সঙ্গে এসেছে কেন?'

প্রশ্নটা শুনে তারক দাস একটু থমকে গেল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ওর নাম সহদেব। ও মালিকের বডিগার্ড। মালিক ওকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। আসলে কলকাতায় কয়েকটা বড় পেমেন্ট নেওয়ার ছিল। সেসব নিয়ে আপনার কাছে আসছি। আমাদের ব্যবসায় এখনও ক্যাশটাই চলে বেশি। এই যে ব্যাগটা দেখছেন এতে কিছু টাকা আছে। তাই সহদেবকে কাছে কাছে রেখেছি।' তারক দাস হাসল।

আদিত্যর আগেই সন্দেহ হচ্ছিল, এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে কেন সহদেবের জামার বাঁ-দিকটা ফোলা-ফোলা লাগছিল। লোকটার সঙ্গে অস্ত্র আছে। লোকটা কেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে। পাহারা দিতে গেলে বসা চলে না।

এয়ারপোর্ট পেরিয়ে যশোর রোডে পড়ে গাড়িটা জ্যামে আটকে গেল। কাল দোলযাত্রা। আদিত্য দেখল খাসির মাংসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়েছে। দোলের দিন মাংস খাবার উৎসাহ তাহলে এখনও মানুষের কমেনি। মাংসের দোকানের পাশে বিলিতি মদের দোকানেও ভিড়। আদিত্য খেয়াল করল, মদের লাইনে পেন্টুলুন পরা কয়েকটি যুবতীও দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোধহয় কলেজ-টলেজে পড়ে। পথ চলতি মানুষ দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের হাঁ করে দেখছে। আদিত্য ভাবল, এতে দেখার কী আছে? পুরুষমানুষ লাইন দিয়ে মদ কিনতে পারলে মেয়েরা কিনবে না কেন?

গাড়িটা টয়োটা ইনোভা। সহদেব সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছে। পিছনের সিটে আদিত্যর পাশে তারক দাস। তার পায়ের কাছে টাকার ব্যাগ। একটু একটু করে জ্যামটা ছাড়ছে, গাড়িটা এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে। আরও কয়েক মিনিট পরে রাস্তা ফাঁকা পেয়ে গাড়ি যখন খানিকটা স্পিড নিয়েছে তখন তারক দাস ড্রাইভারের উদ্দেশে বলে উঠল, 'আর একটু গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে বিরাটির রাস্তাটা ধরে নাও। ওটা ধরে খানিকটা গেলেই কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে পেয়ে যাবে। একটু টেনে চালালে ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারব।'

'বিরাটিতে জ্যাম না থাকলে পৌঁছে যাব দাদা। তবে বিরাটিতে কতটা জ্যাম থাকবে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।' ড্রাইভার রবির গলা শোনা গেল।

রবির আশঙ্কা অমূলক নয়। বিরাটিতে ঢুকেই গাড়ির গতি আবার মন্থর হয়ে গেল। এখানেও হোলির বাজার। ফুটপাথে রঙ, আবীর, পিচকিরির অস্থায়ী বেসাতি। মাংসের দোকানে ভিড়, বিলিতি মদের জন্যে লম্বা লাইন। বিরাটি পেরোতে আধঘন্টা লেগে গেল।

আরও কিছু পরে গাড়ি ব্যারাকপুর পৌঁছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরল। আদিত্য খানিকটা আলাপ করার ভঙ্গীতে তারক দাসকে বলল, 'আপনার কি জগৎমাতা কম্পানিতে অনেকদিন হয়ে গেল?'

'হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর থেকে এখানে কাজ করছি। আমার বাবা আর ছোটকাকা এখানে কাজ করত। তাদের সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যেতাম। আমাদের বাড়ি হালিশহরেই। তা, ইস্কুল পাশ করার পর মালিক

বাবাকে বলল তারকের আর পড়ে কী হবে, আমার কারখানায় ঢুকিয়ে দাও। বাবাও রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে কারখানায় আছি। এখানে কাজ করতে করতে বি কম পাশ করলাম, কস্টিংটা করার ইচ্ছে ছিল, হল না। ফ্যাক্টরিতে প্রচুর কাজ। এত কাজ করে পড়ার সময় পাওয়া যায় না। মালিকও বলল ঢের পড়েছিস, আর পড়ে কী করবি?'

'আপনার বাবা কারখানায় কী কাজ করতেন?'

'বাবাও এখানে হিসেবপত্তর দেখত। মানে অ্যাকাউন্টস-এর কাজ। মালিকের বাবার আমলে আমার বাবা এখানে ঢুকেছিল। মালিকের বাবা আমার বাবাকে খুব বিশ্বাস করত। তবে তখনকার অ্যাকাউন্টস আর এখনকার অ্যাকাউন্টস-এ অনেক ফারাক।'

'আপনার এখনকার মালিকের নাম কী?'

'আমাদের মালিকের নাম জাহাঙ্গির খান।'

'জাহাঙ্গির খান? মুসলিম? মালিক মুসলিম আর কম্পানির নাম জগৎমাতা টোব্যাকো?' আদিত্য বেশ অবাক হয়েছে।

'হ্যাঁ। মুসলমান মালিকের হিন্দু কম্পানি। অনেকেই অবাক হয়। আসলে মালিকের বাবা আসগর খান আর তার বন্ধু কাঁচড়াপাড়ার শ্যামাপদ হাজরা এই দুজন মিলে কম্পানি শুরু করেছিল। শ্যামাপদর টাকা। আর আসগর খান গতরে খেটে কম্পানি চালাবে। শ্যামাপদ শাক্ত বাড়ির লোক। তার ইচ্ছা অনুযায়ী কম্পানির নাম হয় জগৎমাতা টোব্যাকো। বিড়ির ব্যবসায় আসগরের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে কম্পানিটাকে দাঁড় করাচ্ছিল। বছর পনের এইভাবে চলার পর শ্যামাপদর মৃত্যু হয়। শ্যামাপদর ছেলেদের বিড়ির ব্যবসায় থাকার ইচ্ছে ছিল না। কম্পানিতে তাদের অংশগুলো একটু একটু করে কিনে নেয় আসগর খান। কয়েক বছরের মধ্যে পুরো কম্পানিটাই তার হয়ে যায়। ততদিনে কম্পানি খুবই দাঁড়িয়ে গেছে। তাই মালিকানা আসগরের হাতে পুরোপুরি চলে এলেও সে আর কম্পানির নাম বদলাতে চায়নি। এখনও সেই নামই চলে আসছে।'

'বুঝলাম। তা আপনাদের এখনকার মালিকের বয়েস কত?'

'খুব বেশি নয়। এই তো কিছুদিন আগে ঘটা করে মালিকের ষাট বছরের জন্মদিন হল। আর তার পরেই সেই খারাপ ঘটনাটা ঘটল।'

'খারাপ ঘটনা? কী খারাপ ঘটনা?'

'ষাট বছরের জন্মদিন হওয়ার মাস খানেক পরে মালিকের একটা স্ট্রোক হয়। বেশ বড় স্ট্রোক। প্রাণটা যায়নি বটে, তবে একদিকটা একেবারে পড়ে গেছে। স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে মালিক হুইল চেয়ারে। কথাটাও বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। তাই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে। না হলে নিজেই চলে আসত।'

ফাল্গুনের দুপুর। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। রোদ্দুরে তেমন তেজ নেই। এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটা খাল অনেকক্ষণ ধরে আদিত্যদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কখনও কালভার্টের নিচে লুকিয়ে পড়ছে। আবার কখনও উন্মুক্ত প্রান্তরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিরাট জলাশয় তৈরি করছে। আদিত্য দেখতে পেল, জলাশয়ে দু-একটা জেলে নৌকো অনিশ্চিত জাল ফেলে বসে আছে। পাড়ে তাদেরই মতো মাছের আশায় একঠেঙে তপস্বী বক। আর মাঝে মাঝে হাইওয়ের পাশে ভুঁইফোঁড় দৈত্যের মতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এক-একটা পানশালা। এখন সেগুলো বন্ধ। বোধহয় রাত্তিরে খুলবে। তখন খানাপিনা হবে। নাচগান হবে।

'আপনার মালিকের ছেলেমেয়ে নেই? মানে ভাবছিলাম, মালিক তো অসুস্থ। তাহলে কম্পানি দেখাশোনা করে কে?' আদিত্য বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে আলগোছে প্রশ্ন করল।

'মালিকের ছেলেমেয়ে নেই। মালকিনের একটা অকালকুষ্মাণ্ড ভাইপো আছে, তাকে মালিক বিশ্বাস করে অনেক দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু সে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না। তবে মালিকের কড়া হুকুম, মালকিনের ভাইপোকে যেন কেউ পয়সা-কড়ি দিয়ে বা অন্য

কোনওভাবে সাহায্য না করে। এখন কম্পানিটা বলতে গেলে আমরাই চালাই। অবশ্য হুইল চেয়ারে বসে থাকলে কী হবে, মালিকের দাপট এক ফোঁটাও কমেনি। মাথাও পরিষ্কার কাজ করে। বড় সিদ্ধান্তগুলো মালিকই নেয়। তাই আমাদের কাজ করতে কোনও অসুবিধে হয় না।'

নৈহাটির মোড় পেরিয়ে আরও খানিকক্ষণ চলার পর গাড়ি বাঁদিকে বেঁকল। মিনিট দশেক পরে লেভেল ক্রসিং, আর একটু পরে গঙ্গা। গঙ্গার ধারেই জগৎমাতা বিড়ি কম্পানির মস্ত কারখানা। গাড়ি যখন কারখানার মেন গেট দিয়ে ঢুকছে, আদিত্য দেখল তার ঘড়িতে একটা পঁচিশ বেজেছে। তারক দাস তাদের পৌঁছ-সংবাদ দিয়ে কাউকে একটা ফোন করল। তারপর আদিত্যকে বলল, 'আপনাকে প্রথমে আমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাচ্ছি। দুপুরের খাওয়াটা ওখানে খেয়ে একটু গড়িয়ে নেবেন। মালিক আপনার সঙ্গে ঠিক সাড়ে তিনটেতে দেখা করবে। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

আদিত্য আপত্তি করল না। তার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

২

অতিথিশালাটিকে ঠিক ফাইভ স্টার বলা যাবে না। তবু মধ্যাহ্নভোজনটা আদিত্যর ভালই লাগল। সাদামাটা ডাল-ভাত, উচ্ছে-আলু ভাজা, কাতলা মাছের ঝোল, টমেটোর চাটনি। মাছটা বেশ টাটকা, মনে হয় লোকাল, ডালটাও মন্দ করেনি, আর উচ্ছে-আলু ভাজা তো আদিত্যর ফেভারিট। একতলায় খাবার জায়গা, দোতলায় বিশ্রামের ব্যবস্থা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আদিত্য দেখল পাশাপাশি দুটো ঘর। তার মধ্যে একটা খুলে দিয়ে অতিথিশালার ভৃত্যটি চলে গেল। ঘরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। মনে হয় অনেকদিন কেউ থাকেনি। বিছানার চাদরটাও বদলালে ভাল হতো। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে কোনও হাত ধোয়ার বেসিন নেই, শুধু একটা জলের কল আছে, আর চান করার জন্য মগ-বালতি। আদিত্য বালতিটাকে কলের নিচে রেখে সন্তর্পণে হাত-মুখ ধুয়ে নিল, যাতে প্যান্টটা ভিজে না যায়। তারপর ঘরে ফিরে জামা খুলে বিছানায় লম্বা হল।

আদিত্য ঘুমিয়ে পড়েছিল, দরজায় খট-খট শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজা খুলে দ্যাখে মধ্য-তিরিশের এক যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদিত্য তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আপনার সঙ্গে খুব দরকারি কয়েকটা কথা আছে। আমাকে একটু ভেতরে ঢুকতে দেবেন? এখানে আমাকে কেউ দেখতে পেলে খুব বিপদে পড়ে যাব।'

কথাগুলো বলতে বলতে মেয়েটি আদিত্যর অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে নিজেই ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর কাতর গলায় বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন, প্লিজ।'

মেয়েটির মরিয়া ভাব দেখে আদিত্য দরজাটা বন্ধ করে দিল। যদিও দরজা বন্ধ করার সময় আদিত্যর মনে হচ্ছিল কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। ঘরে খাট ছাড়া শুধু একটা প্লাস্টিকের চেয়ার। চেয়ারের পিঠে আদিত্যর শার্টটা ঝোলানো। আদিত্য তাড়াতাড়ি শার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে গলাতে গলাতে বলল, 'বসুন।' সে নিজে খাটের ওপর বসল।

এতক্ষণে আদিত্য মেয়েটিকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেয়েছে। ছিপছিপে, ছোটখাট চেহারা। ময়লা রঙ, তীক্ষ্ন নাক, চোখের মণি ঈষৎ কটা। ময়লা রঙের সঙ্গে কটা চোখটা বেমানান, মনে হয় যেন বাঙালি শরীরে বিদেশি কোনও রক্তের বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আদিত্য মেয়েটির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে একটু কড়া গলায় বলল, 'ব্যাপার কী? আপনি হুট করে আমার ঘরে ঢুকে এলেন কেন?'

'বলছি দাদা, সব বলছি। বলব বলেই তো এসেছি।' মেয়েটি সামান্য হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় না পরিশ্রমে বোঝা গেল না। একটু দম নিয়ে মেয়েটি বলল, 'আমার নাম সাবিনা, সাবিনা খাতুন। আমার হাসবেন্ডের ফুপু, মানে পিসি এই কম্পানির মালিক জাহাঙ্গির খানের ওয়াইফ।' মেয়েটি আবার দম নেওয়ার জন্য থামল।

'মানে, আপনার স্বামী এখানকার মালকিনের ভাইপো। তা আপনার স্বামীর নাম কী?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমার হাসবেন্ডের নাম ফিরদৌস। ফিরদৌস রহমান। আমরা এখানেই থাকি। ফিরদৌস এই কম্পানির কাজও করে আবার অন্য কাজও করে। আগে পুরোটাই অন্য কাজ করত, তারপর ফুপাজি আমাদের এখানে নিয়ে এলেন। ফুপাজির তো ছেলেমেয়ে নেই, তাই ফিরদৌসকে তিনি নিজের ছেলের মতোই দেখতেন।'

'দেখতেন কেন? এখন আর দেখেন না?'

'সেটাই তো বলতে এসেছি। কিছুদিন আগে কম্পানিতে একটা মোটা টাকার গরমিল ধরা পড়ে। ফুপাজির মনে হয়েছে টাকাটা ফিরদৌস সরিয়েছে। আল্লা জানেন ফিরদৌস নির্দোষ। আর আমি জানি ফিরদৌস এরকম কাজ করতেই পারে না। আমাদের পনের বছর বিয়ে হয়েছে। ফিরদৌস যদি চোর হত আমি ঠিক বুঝতে পারতাম। দুটো বাচ্চা নিয়ে আমি এখন কী করব? কোথায় যাব? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।' বলতে বলতে সাবিনা খাতুনের গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'ফিরদৌস এখন কোথায়?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সেটাই তো সমস্যা হয়েছে। ফিরদৌস পালিয়ে গেছে। কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথায় আছে আমিও জানি না।'

'ফিরদৌস যদি নির্দোষই হবে তাহলে সে পালাল কেন?'

'ভয়ে, দাদা, ভয়ে। ফুপাজিকে বোধহয় আপনি এখনও দেখেননি। দেখলে বুঝবেন, ভয়ঙ্কর লোক। ভালমানুষ হলে এত বড় বিড়ি কম্পানি চালানো যায় না। এখানে নানারকম ব্যাপার চলে। হয়ত সব বিড়ি কম্পানিতেই চলে। মুন্সি, মানে ঠিকাদারদের সামলাতে হয়। ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের সামলাতে হয়। এসবের জন্যে মালিকের পোষা গুণ্ডারা থাকে। ফুপাজিরও আছে। ফিরদৌস ভয় পেয়েছিল মালিক বুঝি ওর ওপর তার গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেবে। হয়তো তাকে জানেই মেরে ফেলবে। ফিরদৌস মিছিমিছি ভয় পায়নি। ফুপাজি খুব রাগী লোক। রাগ পুষেও রাখে। ফিরদৌস গা-ঢাকা দেওয়ার পর আমার ওপরেও অনেক চোটপাট হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল, ফিরদৌস কোথায় লুকিয়ে আছে না বললে আমি আর আমার বাচ্চারা কেউ রেহাই পাব না। আমি তো জানিই না ফিরদৌস কোথায় আছে, কী করে বলব?'

'আমার কাছে এলেন কেন?'

'আমি জানি আপনাকে টাকা উদ্ধারের জন্য ডাকা হয়েছে। হয়ত ফিরদৌসকেও খুঁজে বার করতে বলবে। আপনি ফিরদৌসকে বাঁচান।'

'ফিরদৌস যদি দোষী হয়, তাকে বাঁচাবো কী করে?'

'আমি জানি, ফিরদৌস টাকা সরায়নি। কিন্তু যদি সে টাকা নিয়েও থাকে, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। দয়া করে ফুপাজির হাতে তুলে দেবেন না। তাহলে ওরা ফিরদৌসকে মেরেই ফেলবে। অবশ্য পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় ফুপাজি যেতে চাইবে না। কারণ আমার ধারণা যে টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে না তার পুরোটাই দু-নম্বরি।'

'আমি এখানে আসছি আপনাকে কে বলল?'

'সেটা আমি বলতে পারব না। আমাকে বিশ্বাস করে যে বলেছে আমি কী করে তার সঙ্গে বেইমানি করব?'

আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। তিনটে পাঁচ। একটু পরেই তারক দাস তাকে নিতে আসবে। সে সাবিনাকে বলল, 'আপনি এবার আসুন। এক্ষুনি আমাকে নিতে লোক আসবে। আপনাকে এখানে দেখলে আমরা দুজনেই বিপদে পড়ব। একটা কথা মনে রাখবেন। আমি বেআইনি কোনও কাজ করি না। আর যদি মনে হয় ফিরদৌসকে আপনাদের মালিকের হাতে তুলে দিলে তার প্রাণসংশয় হতে পারে, তাহলে আমি কখনই সে কাজ করব না। এবার আসুন। নমস্কার।'

আদিত্য আগে খেয়াল করেনি দোতলার বারান্দার একধার দিয়ে একটা লোহার সিঁড়ি আছে। সাবিনা এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিঃশব্দে সেই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেল। সম্ভবত এই পথেই সে এসেছিল।

৩

বারান্দাটা বিশাল। এ-মুড়ো ও-মুড়ো মিলিয়ে মাথার ওপর তিনটে ফ্যান ঘুরছে। না ঘুরলেও চলত। সামনে গঙ্গা। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফ্যানগুলো বন্ধ থাকলে গঙ্গার হাওয়াটা আরও উপভোগ করা যেত।

'আমাদের ব্যবসায় তিনটে লেভেল আছে।' জাহাঙ্গির খান তার ব্যবসার কথা বলছিল। 'একেবারে নিচের তলায় আছে বিড়ি বাঁধার মেয়ে-বউরা। এরা নিজেদের বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধার কাজ করে। ঠিকেদাররা আছে মাঝের স্তরে, এদের বলা হয় মুন্সি। ঠিকেদাররা মেয়েদের বিড়ি বাঁধার জিনিসপত্র আগাম দেয়। আবার বাঁধা হয়ে গেলে কাঁচা বিড়িগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে জমা করে দেয়। ফ্যাক্টরিটা তিন নম্বর লেভেল। সেই বিড়িগুলো এখানে কাঠকয়লার আঁচে স্যাঁকা হয়। বান্ডিল করে প্যাকিং হয়। তারপর গ্রামে-গঞ্জে বিক্রির জন্য চালান হয়ে যায়।'

জাহাঙ্গির খানের কথা শুনতে শুনতে আদিত্য তাকে ভাল করে লক্ষ করছিল। হুইল চেয়ারে বসা লোকটার কথায় জড়তা আছে। কী বলছে বুঝতে গেলে একটু মন দিয়ে শুনতে হবে। কিন্তু কথা বলায় জড়তা থাকলেও চিন্তায় জড়তা নেই। মনে হয়, লোকটা শরীরের বাঁ-দিকটা নাড়াতে পারে না। ডান হাত, ডান পা নাড়াতে পারছে। হাতের কব্জি, চওড়া কাঁধ, ঘাড়ের গড়ন দেখলে বোঝা যায় এক সময় লোকটা বেশ জোয়ান ছিল। সম্ভবত নিয়মিত শরীরচর্চা করত। কঠিন মুখ। তার ওপর চৌকো মুখমণ্ডলের একদিকটা পড়ে যাওয়ার ফলে মনের ভাবগুলো পুরোপুরি মুখে ফুটে ওঠে না। এই অর্ধ-অভিব্যক্তিহীনতা জাহাঙ্গির খানের মুখমণ্ডলকে বাড়তি নিষ্ঠুরতা দিয়েছে।

'কতদূর চালান যায় আপনাদের বিড়ি?'

'উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি আমাদের মাল সব জায়গায় যায়। বাংলাদেশেও প্রচুর এক্সপোর্ট হয়। আমাদের বিড়ি একবার খেলে ভোলা যাবে না। আপনি বিড়ি-সিগ্রেট খান তো? আমাদের বিড়ি একটা খেয়ে দেখুন না।'

টেবিলে রাখা একটা সুদৃশ্য রুপোর কৌটো খুলে জাহাঙ্গির খান আদিত্যর দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল। নিজেও একটা নিল। দামী লাইটার দিয়ে তার নিজের বিড়িটা ধরিয়ে আদিত্যরটাও ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমি নিজের ফ্যাক্টরির বিড়ি ছাড়া আর কিচ্ছু খেতে পারি না। বিদেশি সিগ্রেটও স্বাদে আমাদের বিড়ির কাছে হার মানবে। অন্তত আমার তাই মনে হয়। অবশ্য এই অসুখটার পরে ডাক্তার আমাকে বিড়ি-সিগ্রেট ছেড়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু ও কী ছাড়া যায়? ক্লাশ সিক্স থেকে খেয়ে আসছি। কী? কেমন লাগছে আমাদের বিড়ি?'

বিড়ির স্বাদ আদিত্যর কাছে নতুন নয়। গোয়েন্দাগিরির পেশায় আসার আগে একটা সময় এসেছিল যখন সে প্রায় এক বছর ধরে বেকার। ইস্কুলের চাকরিটা চলে গেছে। জমা টাকাও দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ফলে মেসের ভাড়া বাকি পড়ছে। মেসের মিলও বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সময় মাস ছয়েক আদিত্য বিড়িই খেত। তবে স্বীকার করতেই হবে এই বিড়িটার স্বাদ অনেকটাই আলাদা। সে বলল, 'আপনাদের বিড়ি কিন্তু সত্যিই খুব ভাল। আপনার জেনারেল ম্যানেজার বলছিলেন আপনাদের ফ্যাক্টরিতে বছরে পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকার বিড়ি প্রোডাকশান হয়।'

'আগে আরও বেশি হতো। এই শালা নোট বাতিলের ঝামেলা এসে ব্যবসার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

'সে তো তিন বছর হতে চলল। এখনও ঝামেলা?'

'ব্যবসায় একবার চোট লাগলে সারতে সময় লাগে। অনেক সময় কোনও দিনই সারে না। নোট বাতিল তো বিরাট একটা চোট।'

'আপনাদের বোধহয় সবই ক্যাশ ট্র্যানসাকশন?' আদিত্য ব্যবসায় চোটের ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্যে প্রশ্নটা করল।

'ঠিক ধরেছেন। আমাদের এখানে সব লেনদেনই নগদে হয়। যেসব মেয়ে-বউরা বিড়ি বাঁধে তাদের বেশিরভাগেরই তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। তারা চেক নিয়ে কী করবে? নোট বাতিল হয়ে যেতে হঠাৎ লেনদেন ভীষণ কমে গেল। ব্যবসা হবে কোথা থেকে? সেই ধাক্কা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারিনি।'

'আপনাদের কাছে যে ক্যাশটা ছিল সেটা কী করলেন? ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিলেন?' আদিত্য নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা দৃশ্যতই জাহাঙ্গির খানকে বিদ্ধ করেছে। লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার মুখের যেদিকটা সচল সেদিকটা কয়েকবার কেঁপে উঠে থেমে গেল। যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর জাহাঙ্গির খান বলল, 'আপনাকে যে কাজে ডেকেছি সেটার জন্য সব কথাই খুলে বলতে হবে। ঘটনাটার শুরু কিন্তু ওই নোট বাতিলের সময় থেকে।'

সত্যি বলতে কি, বিড়িটা খেয়ে আদিত্যর তেমন জুত হয়নি। সে বলল, 'আপনি শুরু করার আগে আপনার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছি।'

'ধরান, ধরান। নিশ্চয় ধরান। যার যেটা নেশা তার সেটা না হলে চলে?' তারপর আদিত্যর সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে জাহাঙ্গির খান বলতে শুরু করল, 'আপনাকে খোলাখুলি বলি। আমাদের ব্যবসায় যেহেতু লেনদেনগুলো নগদে হয়, তাই তার অনেকটাই দেখানো হয় না। শুধু আয় নয়, যে নগদটা রোজকার লেনদেনের জন্য হাতে রাখতে হচ্ছে, সেটাও। বেশ বড় একটা নগদ লেনদেনের জন্য আমাদের ধরে রাখতে হয়। যে রাত্তিরে হঠাৎ নোট বাতিল ঘোষণা হল, আমাদের হাতে তখন বেশ কয়েক কোটি টাকা। তার বেশির ভাগটাই দেখানো নেই। মানে আপনাদের ভাষায় দু-নম্বরি। কিছু টাকা এর ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। তাও হাতে বেশ কিছু রয়ে গেল। এই নিয়ে আমার খুব দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল। হাতে তখন আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি আছে যার মধ্যে বাতিল নোটগুলো বদলে নিতে হবে, এই সময় ফিরদৌস এসে হাজির। ফিরদৌস আমার বড় শালার ছেলে। ভদ্র, নম্র ছেলেটাকে আমার বেশ ভালই লাগত। ফিরদৌস আমার সমস্যাটা আন্দাজ করেছিল। সে আমাকে বলল, ফুপাজি আমি আপনার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব যিনি আপনাকে হেল্প করতে পারবেন। আমি তার কম্পানিতেই কাজ করি।'

'ফিরদৌসের সঙ্গে এর আগে আপনার কখনও ব্যবসার ব্যাপারে কথা বা লেনদেন হয়েছিল?'

'না। হয়নি। ফিরদৌস কী করে সেটাও আমি জানতাম না। কখনও কখনও ছুটি বা পরবের সময় ফিরদৌস তার বউ-বাচ্চা নিয়ে আমাদের এখানে আসত। তার ফুপি তাকে খুব ভালবাসত। বোধহয় এখনও বাসে।'

'বেশ। তারপর কী হল বলুন।'

'আমাদের হাতে সময় বেশি ছিল না। তাই ফিরদৌসকে নিয়ে পরের দিনই ওই ভদ্রলোকের অফিসে হাজির হলাম। কলকাতার পোদ্দার কোর্ট-এ অফিস। বিবাদী বাগের খুব কাছে। অফিসের দরজায় লেখা 'কুমুদিনী বিত্ত নিগম, স্টক ব্রোকার'। আমি একটু অবাক হলাম, ফিরদৌস আমাকে স্টক ব্রোকারদের কাছে নিয়ে এল কেন?'

'কুমুদিনী বিত্ত নিগম? নামটা চেনা লাগছে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, কিছুদিন আগে এর মালিককে পুলিশ ধরেছিল না? কম্পানিটা কি পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে? কাগজে তাই যেন পড়েছিলাম।' আদিত্য ভুরু কোঁচকাল।

'আপনি একদম ঠিক বলেছেন। কুমুদিনীর মালিক অ্যারেস্টেড হয়েছে। কম্পানিটাও এখন বন্ধ। কিন্তু তিন বছর আগে প্রথম যখন মালিকের সঙ্গে আলাপ হল তখন কুমুদিনীর ব্যবসা খুব ভালই চলছে। সেদিন ভেতরে ঢুকে দেখলাম একটা বড় হল ঘরে দশ-বারোজন লোক কম্পিউটারে কাজ করছে। হলের ভেতর

দিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিরদৌস আমাকে আরেকটা ছোট ঘরে ঢোকাল। এটা মালিকের খাস কামরায় ঢোকার ওয়েটিং রুম। একজন সেক্রেটারি বসে আছে। তাকে আমার নাম বলতেই সে খুব খাতির করে আমাকে মালিকের খাস কামরায় নিয়ে গেল। নিশ্চয় আমার নামটা আগে থেকে বলা ছিল। এই ঘরটা খুব সাজানো, সাইজেও বেশ বড়। মালিকের সঙ্গে ফিরদৌস আলাপ করিয়ে দিল, মালিকের নাম সত্যজিৎ সামন্ত, সবাই বলে বটুক সামন্ত। বটুকবাবু আমাকে বলল ফিরদৌস তাকে আমার কথা বলেছে। তারপর যা বলল সেটা সংক্ষেপ করলে এটাই দাঁড়ায় যে, ওপর ওপর স্টক ব্রোকার ফার্ম হলেও কুমুদিনীর আসল ব্যবসা টাকা তুলে খাটানো। বড় বড় ব্যবসাদার, যাদের কিছু দু-নম্বরি বাড়তি টাকা আছে, কুমুদিনী তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খাটায়। টাকা খাটানোর প্রধান জায়গা বাংলা সিনেমা। টালিগঞ্জের প্রডিউসাররা সকলেই বটুকবাবুকে একডাকে চেনে। সিনেমা ছাড়াও তার কিছু টাকা যাত্রায় খাটছে, কিছু টাকা বার নাইট-ক্লাবে। আরও কিছু কিছু জায়গায়। সব কটার কথা বটুকবাবু বলেনি, আমিও জানি না। বটুকবাবু দুটো জিনিস জোর দিয়ে বলল। এক, কুমুদিনী কখনও কোনও বেআইনি ব্যবসায় টাকা খাটায় না। সিনেমা-যাত্রা-বার-নাইট-ক্লাব যেখানে যেখানে টাকা খাটানো হয়েছে তার প্রত্যেকটা লিগাল। দুই, এইসব ইনভেস্টমেন্টে রিস্ক আছে। হয়ত একটু বেশি রিস্ক। এই রিস্কটা যার টাকা তার সঙ্গে কুমুদিনী ফিফটি-ফিফটি হিসেবে শেয়ার করে নেয়। অর্থাৎ একশ টাকা খাটিয়ে যদি পঞ্চাশ টাকা ফেরত পাওয়া যায় তাহলে টাকার মালিককে বাকি পঞ্চাশ টাকার অর্ধেক মানে পঁচিশ টাকা কুমুদিনী ফেরত দিয়ে দেবে। অর্থাৎ সেই পঁচিশ টাকাটা কুমুদিনীর ক্ষতি। আর টাকার মালিক একশ টাকা খাটিয়ে পঁচাত্তর টাকা ফেরত পাচ্ছে। আর যদি পুরো টাকাটাই মার যায়, অর্থাৎ সিনেমা কম্পানি কিছুই ফেরত দিতে না পারে, তাহলেও টাকার মালিক পঞ্চাশ টাকা ফেরত পাচ্ছে। উল্টোদিকে ব্যবসা চললে টাকার মালিক মাসে এক পার্সেন্ট সুদ সহ টাকা ফেরত পাবে। আর কুমুদিনীও পাবে এক পার্সেন্ট। তবে কুমুদিনী খুব দেখেশুনে টাকা ধার দেয়। তাই তাদের খাটানো টাকা সচরাচর মার যায় না।'

জাহাঙ্গির খান থামল। বারান্দায় একজন এসেছে। তার হাতের ট্রেতে লস্যির গ্লাস, কাজুবাদামের প্লেট। সে চলে যাওয়া অব্দি জাহাঙ্গির খান চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'খেয়ে নিন। সবাই বলে আমাদের লস্যিটা খুব ভাল।'

'একটা কথা বলুন,' আদিত্য লস্যির গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'ব্যবসায় কত টাকা ক্ষতি হচ্ছে সেটা কুমুদিনী জানবে কী করে? আর জানলেই বা সঠিক অঙ্কটা টাকার মালিককে জানাবে কেন? ব্যবসায়ীর সঙ্গে ষড় করে কুমুদিনী তো টাকার মালিককে ঠকাতে পারে।'

'আমার মাথাতেও ঠিক এই প্রশ্নটাই এসেছিল। কিন্তু আমি প্রশ্নটা করার আগেই বটুকবাবু বোধহয় আমার মনের দুশ্চিন্তাটা বুঝতে পারল। আমাকে বলল, দেখুন আমি তিরিশ বছরের ওপর কুমুদিনী চালাচ্ছি। এই কম্পানিটা চলে পুরোপুরি বিশ্বাসের ওপরে। যারা আমার কাছ থেকে টাকা নেয় এবং যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি খাটাই তারা সকলেই আমাকে বিশ্বাস করে। আমিও সকলকে বিশ্বাস করি। আপনি যদি আমার সঙ্গে কারবার করতে চান তাহলে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। কুমুদিনী আমার মায়ের নাম। আমার ছোটবেলায় মা মারা গেছেন। আমি মায়ের নাম নিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করি না। অবশ্য আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন কি না সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।'

আদিত্য ভাবল, বিশ্বাস? নাকি গুডউইল? বিশ্বাসভঙ্গ করে একবার কিছু টাকা মেরে দেওয়া যায়। কিন্তু তাহলে ভবিষ্যতে আর ব্যবসা করা চলবে না। অর্থাৎ ব্যবসা চালাতে গেলে গুডউইল অক্ষুণ রাখতে হবে, আর গুডউইল অক্ষুণ রাখতে গেলে বিশ্বাস অটুট রাখা দরকার। সে লস্যির গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার তো তখন একটা এমার্জেন্সি অবস্থা। টাকাগুলো পাল্টাতে না পারলে কিছুদিনের মধ্যেই তামাদি হয়ে যাবে।'

'সেই চাপটা তো ছিলই। কিন্তু সেটা ছাড়াও বটুকবাবুকে দেখে মনে হলো লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। আমরা ব্যবসা করে খাই। তাই লোক দেখে মোটামুটি বুঝতে পারি কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে যায় না। মোট কথা আমি রাজি হয়ে গেলাম। পরের দিন ফিরদৌসকে সঙ্গে নিয়ে পুরোনো এক হাজারের নোটে পাঁচ কোটি টাকা বটুকবাবুকে দিয়ে এলাম। বটুকবাবু একটা কাঁচা রসিদ কেটে দিল। আমি জানতাম ওই রসিদের কোনও দাম নেই। বটুকবাবুর মুখের কথারই যেটুকু দাম। আমি বটুকবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকাটা আপনি পাল্টাবেন কী করে? বটুকবাবু বলল, ওটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওসবের অনেক রাস্তা আছে। তবে বলে রাখি, আপনার এই টাকাটা আমি টালিগঞ্জে খাটাব। রোহিত ধামানি বলে একজন প্রডিউসার আছে। খুব বড় নয়, আবার খুব ছোটোও নয়। ওর সিনেমা গ্রামের দিকেই চলে বেশি। একটা কাজ হাতে নিয়ে এখন লাস্ট মোমেন্টে ওর কিছু টাকা শর্ট পড়ে গেছে। আপনার টাকাটা পেলে ওর খুব সুবিধে হবে।'

'তারপর?'

'এক বছরের মধ্যে মাসিক এক পার্সেন্ট সুদ সমেত আমি টাকাটা ফেরত পেয়ে গেলাম। বাতিল নোট দিয়েছিলাম বলে আলাদা করে ওরা কিছু টাকা কাটল না। আমি কুমুদিনীতে আবার ইনভেস্ট করলাম, এবার আর একটু বেশি। টাকাটা এবার ছ-মাসের মধ্যে ফেরত পেয়ে গেলাম। অবশ্যই সুদ সমেত। এরকম করে আরও দুবার টাকা ঢাললাম। কুমুদিনী আমাকে কোনওবারই নিরাশ করল না।'

'তাহলে সমস্যা কবে দেখা দিল?'

'হ্যাঁ, সেটাই বলছি।' জাহাঙ্গির খান আর-একটা বিড়ি ধরাল। তার দেখাদেখি আদিত্যও সিগারেট ধরিয়েছে।

'বছর দেড়েক আগে আমার একটা স্ট্রোক হয়।' জাহাঙ্গির খান আবার বলতে শুরু করল। 'সেই থেকে সমস্যার শুরু। মাস তিনেকের মধ্যে কিছুটা ভাল হয়ে উঠলাম, কিন্তু পুরো সুস্থ আর কোনওদিনই হলাম না। মাথা পরিষ্কার কাজ করে, কিন্তু শরীরের একদিকটা কাজ করে না। কোথাও যাওয়া একেবারে বন্ধ। আমার স্ট্রোকের পরে দুবার কুমুদিনীতে টাকা দিয়েছি। দুবারই ফিরদৌস টাকা নিয়ে গেছে, আবার সময়মতো সুদ সমেত টাকা ফেরত নিয়ে এসেছে। আমি তখন ফিরদৌসকে নিজের ছেলের মতো বিশ্বাস করি।'

'ফিরদৌস কি তখন এখানে থাকত?'

'ফিরদৌসের বউ-বাচ্চা থাকত। এখনও থাকে। ফিরদৌস এখান থেকে কলকাতায় যাতায়াত করত। কুমুদিনীর কাজটা ও ছাড়েনি।'

'বেশ। বেশ। তারপর?'

'তারপর মাস দুয়েক আগে, মানে গত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, বটুকবাবু আমাকে ফোন করল। বলল, ওই ফিলিম প্রডিউসার রোহিত ধামানি একটা বিরাট প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। ফরেনে সুটিং হবে। নামকরা সব আর্টিস্ট থাকবে। পঞ্চাশ কোটির প্রজেক্ট। আপনি কুড়ি কোটি মতো ইনভেস্ট করতে পারেন। আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি, একেবারে সিয়োর রিটার্ন। এক বছরে টাকা শোধ করে দেবে।'

'আপনি দিলেন কুড়ি কোটি?'

'আমি একটু লোভে পড়ে গেলাম। অত টাকা আমার হাতে তো বেকার পড়ে থাকে না। কুড়ি কোটি দিতে গেলে আমাকে ব্যবসা থেকে কিছু টাকা তুলে নিতে হবে। কিন্তু এদিকে তো বিড়ির ব্যবসাও দিন দিন খারাপ হচ্ছে। রেডিয়োতে-টিভিতে সরকার বড় করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিড়ি-সিগ্রেট খাওয়া কত খারাপ। ফলে আমাদের বিক্রি কমে যাচ্ছে। সেদিক থেকে ভেবে মনে হল, সিনেমায় কুড়ি কোটি ঢাললে মন্দ হবে না। টাকাটা জোগাড় করতে কটা দিন লেগে গেল। ফেব্রুয়ারির আট তারিখে, তারিখটা আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমি ফিরদৌসের হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম বটুকবাবুকে দিয়ে এস। ওর সঙ্গে প্রোটেকশন হিসেবে সহদেব আর জামিলকে দিয়ে দিলাম। ওরা দুজনেই আমার বডিগার্ড, খুব বিশ্বাসী। সেদিন সন্ধেবেলা সহদেব

আর জামিল ফিরে এল। বলল, ফিরদৌস কলকাতায় রয়ে গেছে, ওর কী একটা দরকারি কাজ আছে নাকি। রাত্তিরে ফিরদৌস ফোন করে বলল, টাকা বটুকবাবুর কাছে পৌঁছে গেছে। তবে ও নিজে একটা কাজে আটকে গেছে, দুদিন পরে ফিরবে। আমি তখন ফিরদৌসকে এতটাই বিশ্বাস করি যে বটুকবাবুকে ফোন করে ভেরিফাই করার কথাটা মাথাতেই আসেনি। দুদিন কেটে গেল, ফিরদৌস ফিরল না। ওকে ফোন করলাম। ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে। আমি ওর বউকে জিজ্ঞাসা করলাম ফিরদৌস কোথায়। সেও কিছু বলতে পারল না। আমি এবার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বটুকবাবুর মোবাইলে ফোন করলাম। ফোন সুইচড অফ। কুমুদিনীর ল্যাণ্ডলাইনে ফোন করলাম, ফোন বেজে গেল। সহদেব আর জামিলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কী ফিরদৌসকে বটুকবাবুর হাতে টাকাটা তুলে দিতে দেখেছে? তারা বলল, ফিরদৌস তাদের বাইরে বসিয়ে রেখে কুমুদিনীর মালিকের ঘরে ঢুকেছিল। তারা এর বেশি আর কিছু দেখেনি। বটুকবাবুর সেক্রেটারির ফোন নম্বরটা আমার কাছে ছিল। সেখানে ফোন করলাম। এই ফোনটাও সুইচড অফ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এমার্জেন্সির জন্য বটুকবাবু আর-একটা নম্বর আমাকে দিয়েছিল। সেই নম্বরে ফোন করলাম। একজন ফোনটা ধরল। মেয়েছেলের গলা। আমি নিজের পরিচয় দিলাম। সে বলল, কিছুদিন আগে বটুকবাবুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। এখন কুমুদিনীর অফিস সিল করা। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ফিরদৌসের হাত দিয়ে যে কুড়ি কোটি পাঠিয়েছিলাম সেটা বটুকবাবু পেয়েছেন তো? শুনে সেই মহিলা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় আমাকে বলল, ওরকম কোনও টাকা বটুকবাবু পাননি, পেলে আমি অবশ্যই জানতে পারতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? মেয়েটা বলল, আমি কুমুদিনীতে কাজ করি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। এর দুদিন পরে কুমুদিনীর ব্যাপারটা বড় করে কাগজে বেরল।'

জাহাঙ্গির খান থামল। উত্তেজনায় তার শরীরের ডান দিকটা থরথর করে কাঁপছে। কাঁপা হাতে সে আবার একটা বিড়ি ধরাল। তারপর যখন কথা বলতে শুরু করল তখন তার মুখে একটা আশ্চর্য প্রশান্তি এসেছে। খুব ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, 'আমি যেমন ভালবাসতে জানি তেমনি শাস্তিও দিতে জানি। ফিরদৌসকে আমি নিজের ছেলের মতো দেখতাম। প্রতিদানে সে যদি আমার সঙ্গে নেমখহারামি করে থাকে তাহলে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আপনাকে আমি দু-টো কাজ করতে বলব। এক, বটুকবাবু সত্যিই টাকাটা পেয়েছেন কি না এটা আপনাকে জানতে হবে। দুই, ফিরদৌসকে খুঁজে বার করতে হবে। তার ঠিকানাটা আমার চাই।'

জাহাঙ্গির খানের গলায় একটা অমোঘ নিষ্ঠুরতা ছিল। আদিত্য বুঝতে পারল কেন সাবিনা খাতুন এত ভয় পেয়েছে।

'যেদিন ফিরদৌস আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে গেল সেদিনটা ঠিক কী কী ঘটেছিল আপনি আর একটু ডিটেলে বলতে পারবেন?' আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল।

'একটু মনে করে বলতে হবে।' জাহাঙ্গির খান একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'সকালে, এই নটা সাড়ে নটা নাগাদ আমি ফিরদৌসকে ডাকলাম। টাকাটা আমার কাছে একটা ব্যাগের মধ্যে ছিল। ওই বড় ট্র্যাভেল ব্যাগগুলো যেমন হয়। আমি ফিরদৌসকে বললাম টাকাটা গুনে নাও। ফিরদৌস গুনে নিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বটুকবাবুকে ফোন করে বলে দিয়েছ তো টাকা নিয়ে আজ যাচ্ছ? ফিরদৌস বলল হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে বলে দিয়েছি। তবে এখন আর একবার ফোন করে বলে দিচ্ছি। তারপর ফিরদৌস ফোন করার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে বলল, এই যাঃ, আমার মোবাইলটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। ফুফাজি আপনার মোবাইলটা থেকে ফোন করব?'

আদিত্য নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। জাহাঙ্গির একটু থামতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিজে না ফোন করে ফিরদৌসকে ফোন করতে বললেন কেন?'

'দেখুন স্ট্রোকটা হওয়ার পর থেকে দেখতেই তো পাচ্ছেন আমার কথা জড়িয়ে গেছে। টেলিফোনে আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না। তাই ফিরদৌসকে ফোন করতে বলেছিলাম।' জাহাঙ্গির খানের গলাটা বিষণ্ণ শোনাল।

'বুঝতে পেরেছি। তারপর?'

'তারপর আমার ফোন থেকেই ফিরদৌস বটুকবাবুকে ফোন করল। ফোনটা সুইচড অফ। ফিরদৌস বলল, আমার বোঝা উচিত ছিল। এই সময় তো বটুকবাবু ফোন অফ করে পুজো-পাঠ করেন। আমি বরং বটুকবাবুর সেক্রেটারি শৌভিক নন্দকে ফোন করে বলে দিই। ও বটুকবাবুকে জানিয়ে দেবে যে আমরা যাচ্ছি। ফিরদৌস বটুকবাবুর সেক্রেটারিকে ফোন করে বলে দিল।'

'আপনার ফোন থেকে ফোনটা যেতে সেক্রেটারি অবাক হল না?'

'আপনি বলতে এখন আমার মনে পড়ছে। ফিরদৌস ফোন করে প্রথমেই বলল আমি ফিরদৌস বলছি। আমার ফোনটা সঙ্গে নেই বলে ফুপাজির ফোন থেকে ফোন করছি। তুমি বটুকবাবুকে বলে দিও আজ দুপুরে আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। উনি বললেই বুঝতে পারবেন।'

'এর বেশি আর কিছু ফিরদৌস বলেনি?'

'না। এইটুকুই বলেছিল। হয়ত সেক্রেটারিকে পুরোটা বলতে চায়নি।'

'হুঁ। আচ্ছা ফিরদৌস যে বটুকবাবু আর তার সেক্রেটারিকেই ফোন করেছিল এটা আপনি চেক করেছিলেন।'

'নিশ্চয়। ফোনটা তো আমার মোবাইল থেকেই করেছিল। তাই চেক করতে অসুবিধে হয়নি।'

'আচ্ছা, সহদেব আর জামিলও তো ফিরদৌসের সঙ্গে গিয়েছিল। ওরা তিনজন মিলেই তো টাকাটা সরাতে পারে। আপনি একা ফিরদৌসকে কেন সন্দেহ করছেন?'

'দেখুন, সহদেব আর জামিল দুজনেই বহুদিন আমার সঙ্গে আছে। টাকা চুরি করার হলে ওরা আরও অনেক বেশি টাকা অনেক দিন আগেই সরাতে পারত। আদিত্যবাবু, আমাকে ব্যবসা করে খেতে হয় তাই আমি লোক চিনি। সহদেব আর জামিলকে আমি নিজের ওয়াইফের থেকেও বেশি বিশ্বাস করি। ওরা আমার জন্য জান দিয়ে দিতে পারে। আমি তার প্রমাণও পেয়েছি।'

'তাহলে কি আপনি নিজের ওয়াইফকে ততটা বিশ্বাস করেন না?'

'আরে না, না। ওটা একটা কথার কথা বললাম। আমার ওয়াইফকে আমি পুরো বিশ্বাস করি।' জাহাঙ্গির খানকে একটু লজ্জিত মনে হল।

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। তারপর বলল, 'আমার একটা চিঠি দরকার। বটুক সামন্তর সঙ্গে দেখা হলে সে বিশ্বাস করবে কেন আমি আপনার কাছ থেকে আসছি?'

'চিঠি?' জাহাঙ্গির খানের গলাটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত শোনাল। 'স্ট্রোকটা হওয়ার পর থেকে আমি খুব ভাল লিখতে পারি না। খুব কষ্ট করে শুধু সইটা করতে পারি। দেখছি কী করা যায়।'

জাহাঙ্গির খান একটা বেল বাজাল। আদিত্য এতক্ষণ খেয়াল করেনি, বেলটা তার হুইল চেয়ারের ডান হাতলে লাগানো ছিল। 'তারককে একবার আসতে বল।' যে লস্যি নিয়ে এসেছিল সে দেখা দিতে জাহাঙ্গির খান তাকে নির্দেশ দিল।

তারক দাস ঘরে এসে ঢোকার পর আদিত্য শুনতে পেল তাকে জাহাঙ্গির খান বলছে, 'তারক, বাংলায় একটা চিঠি টাইপ করে দিতে হবে। আমি শুধু সই করব। চিঠিটা সত্যজিৎ সামন্তকে লেখা হবে। চিঠিতে লিখবে, প্রিয় বটুকবাবু, আপনার ফোন বন্ধ, তাই সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। এই চিঠি নিয়ে যে যাচ্ছে সে আমার লোক। নাম আদিত্য মজুমদার। সে আমার কথাগুলো আপনাকে বলবে। আপনি আপনার উত্তরটা এই লোকটিকেই দিয়ে দেবেন। আমার নমস্কার নেবেন। ইতি জাহাঙ্গির খান।'

চিঠিটা সই করে, একটা খামে পুরে আদিত্যর হাতে তুলে দিতে দিতে জাহাঙ্গির খান বলল, 'আর কিছু লাগবে?'

'হ্যাঁ, ফিরদৌসের একটা ছবি পেলে ভাল হত।'

'ওটাও তারক ব্যবস্থা করে দেবে। ছবিটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে হবে তো?'

'নিশ্চয়।'

একটু পরে গাড়িতে উঠবে বলে আদিত্য বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গাড়িবারান্দার নিচে অপেক্ষা করছে এমন সময় একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বলল, 'মালকিন আপনাকে একবার ডাকছে।'

মালকিন মানে কি জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী? তিনি কেন আদিত্যকে ডাকবেন? মেয়েটির পেছন পেছন আদিত্য আবার বাড়ির ভেতর ঢুকল। মেয়েটি একতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে। প্রায় আসবাবহীন নিরাভরণ ঘর। শুধু একদিকে একটা তক্তোপোষের ওপর গোটা দুয়েক তাকিয়া। আদিত্য তক্তোপোষের ওপরে বসে ভাবছে, মালকিন এলে কোথায় বসবেন, এই সময় মালকিন এসে ঘরে ঢুকলেন। সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ মেদ জমেছে শরীরে। আদিত্য আন্দাজে ধরে নিল ইনি জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী। সে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

'আপনার সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। অনেক ভেবে মনে হল, আমি যেটুকু জানি সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল।'

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে আদিত্যও দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ও শরীরের ভাষা অত্যন্ত পরিশীলিত, তবে একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে বাংলা উচ্চারণে একটা পশ্চিমের টান আছে। আদিত্য জানত, বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমের মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপন বিরল নয়। সম্ভবত এক্ষেত্রেও কোথাও একটা পুব-পশ্চিমের মিলন ঘটেছে।

'আমিই সাবিনাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। সাবিনা আমাকে বলেছে আপনাদের মধ্যে কী কী কথা হয়েছে।'

আদিত্য উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে রইল।

'আপনি সাবিনাকে কথা দিয়েছেন ফিরদৌসকে আমার স্বামীর হাতে তুলে দেবেন না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি কথা রাখবেন।'

আদিত্য এবারেও উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে রইল।

'আমার নিজের ছেলে নেই। ফিরদৌসকে আমি ছেলের মতই ভালবাসি। কিন্তু একই সঙ্গে ইনসাফের দিকটাও তো বাদ দেওয়া যায় না। যে কথাটা আমি কখনও আমার স্বামীকে বলিনি সেটা আপনাকে বলছি। কথাটা বোধহয় সাবিনাও জানে না। কথাটা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তবু আপনাকে বলছি।'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরের কথাগুলো বলার জন্য যেন শক্তি সঞ্চয় করছেন। আদিত্যও চুপ করে রইল। মিনিট খানেক নীরব থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি যেহেতু এই কেসটা নিয়ে ইনভেস্টিগেট করবেন, আপনার জানা দরকার ফিরদৌসের যখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস তখন সে একটা চুরির কেসে জড়িয়ে পড়ে। এটা ঘটেছিল বহরমপুরে। ওখানে ফিরদৌসের বাবা, মানে আমার বড় দাদা, খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক ছিলেন। কিছুদিন এম এল এ-ও ছিলেন। দাদা তার ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ফিরদৌসকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা দাদাকে এতটাই পারটার্ব করেছিল যে এর পর দাদা আর খুব বেশিদিন বাঁচেনি। হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল।'

'আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?' আদিত্য মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'বলুন।'

'ফিরদৌসের বাবার নাম কী ছিল?'

'ফিরদৌসের বাবার নাম হাবিবুর রহমান।'

'অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম, বাকিটা আমি বার করে নেব। আপনার মতো মানুষ আরও দু-একটা থাকলে পৃথিবীটা অন্য রকম হয়ে যেত।' ভদ্রমহিলার সততায় আদিত্য সত্যিই আপ্লুত হয়েছে।

'আমি কিন্তু একবারও বলতে চাইছি না ফিরদৌস আমার স্বামীর টাকা নিয়ে পালিয়েছে। বরং আমি বলব ফিরদৌস নিজেকে শুধরে নিয়েছিল। তবু আমার মনে হল ফিরদৌসের পাস্ট হিসট্রিটা আপনার জেনে রাখা

দরকার।'

'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, ফিরদৌস যদি নির্দোষ হয় আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি তার কোনও ক্ষতি হবে না।' আদিত্য এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না।

ফেরার পথে আদিত্য একা। দোলপূর্ণিমার চাঁদ আকাশ ও মাটিতে মায়া বিস্তার করেছে। এখন চাঁদের আলো ছাড়া কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে আর কোনও আলো নেই। 'কোন পূর্ণ চাঁদের মায়ায়' গানটা তার মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, অন্য সময় হলে হয়তো দু'এক কলি গেয়েও ফেলত, কিন্তু এই মুহূর্তে আদিত্যর মন ভাল নেই। সে ধর্মসঙ্কটে পড়েছে। ফিরদৌসকে কি ধরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে? সাবিনা বলছে ধরতে পারলে জাহাঙ্গির খান তাকে মেরেও ফেলতে পারে। সাবিনাকে আদিত্য কথা দিয়েছে সে অনৈতিক কিছু করবে না। কিন্তু আসার আগে জাহাঙ্গির খানের কাছ থেকে আদিত্য কিছু অগ্রিম নিয়ে ফেলেছে। টাকা নিলে কাজ তো করতেই হবে। আর একটা অস্বস্তি, যে টাকাটা উদ্ধারের জন্য সে জাহাঙ্গির খানকে সাহায্য করতে চলেছে সেটা সম্ভবত পুরোটাই কালো টাকা। হয়তো যেটা সে অগ্রিম হিসেবে নিয়েছে, সেটাও। ইদানীং খুব টানাটানি যাচ্ছিল। কিছু টাকার খুব দরকার ছিল। না হলে আদিত্য জাহাঙ্গির খানের কাজটা নিত না।

সাড়ে আটটা নাগাদ মেসে ঢোকার সময় আদিত্য দেখল মহাত্মা গান্ধী রোডে ফুটপাথের ওপর বসে একটা লোক বাঁশি বাজাচ্ছে। হোলির গান। সুরটা আদিত্যর চেনা। 'রঙ্গি সারি গুলাবি চুনরিয়া রে/ মোহে মারে নজরিয়া সামরিয়া রে'। মন্দ বাজাচ্ছে না। কিন্তু কোনও শ্রোতা নেই। তাতে অবশ্য লোকটার কিছু যায় আসে বলে মনে হল না। সে নিজের মনেই বাজিয়ে যাচ্ছে। আদিত্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনল। তারপর একসময় ঢুকে গেল তার মেসের গলিতে।

জাহাঙ্গির খানের গল্পতে কোথাও একটা অসংগতি আছে। আদিত্য সেটা এক্ষুনি ধরতে পারছে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

দোলের সকালে আদিত্য পারতপক্ষে বাইরে বেরোয় না। তাদের পাড়াটা অবাঙালি অধ্যুষিত, এখানে দোল খেলার নামে দুদিন ধরে কার্যত তাণ্ডব চলে। বেলুনের মধ্যে নোংরা জল ও নোংরাতর তরল পদার্থ ভর্তি করে নিরীহ, অনিচ্ছুক পথচারীদের গায়ে ছুঁড়ে মারা হয়। এটা করে কারা যে আনন্দ পায়, আদিত্য জানে না। সে শুধু এইটুকু জানে, দোলের দিন ওইসব ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে নিজের ঘরে বসে গান শোনাটাই বুদ্ধির কাজ। আদিত্য এখন তাই করছে। তবে সকালটা ঘরে থাকলেও বিকেলে বেরতেই হবে। অমিতাভ রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে।

এই মুহূর্তে ইউটিউবের মাধ্যমে ভীমসেন যোশী বসন্ত রাগে সেই পুরোনো হোলির গান 'ফাগওয়া ব্রিজ দেখন কো চলরি' শোনাচ্ছেন। গান শুনতে শুনতে আদিত্য ভাবছিল গৌতমকে কিছু ইনফরমেশনের জন্য ফোন করতে হবে। কিছুদিন আগে গৌতমের আর-একটা প্রোমোশন হয়েছে। লালবাজারে এখন তার প্রচুর প্রভাব। পুলিশের কোনও গোপন তথ্য জানতে হলে গৌতমকে ফোন করাটাই সব থেকে ভাল। কিন্তু তার আগে কিছু হোমওয়ার্ক করা দরকার। দেখা দরকার, কুমুদিনী বিত্ত নিগম ও তার মালিক সম্বন্ধে মিডিয়া কতটুকু জানাতে পারছে। রোহিত ধামানি নামক ফিল্ম প্রোডিউসারটির সম্বন্ধেও জানা দরকার।

ইন্টারনেট একটা অফুরন্ত তথ্যের ভাণ্ডার। কুমুদিনী বিত্ত নিগম গুগল করতে বেশ কয়েকটা এনট্রি চলে এল। বেশিরভাগই বিভিন্ন খবর কাগজে কুমুদিনী নিয়ে সাম্প্রতিক যে খবরগুলো বেরিয়েছে তার অন লাইন সংস্করণ। আদিত্য তার ডায়েরিতে মূল ঘটনাগুলো নোট করে নিচ্ছিল। বিভিন্ন খবর কাগজের প্রতিবেদন থেকে কুমুদিনী এবং তার মালিক সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাচ্ছে। তার মধ্যে কিছু তথ্য অবশ্য জাহাঙ্গির খানের কাছ থেকেই জানা গিয়েছিল। সেই তথ্যগুলো এবং বাড়তি আরও যেটুকু ইন্টারনেট থেকে জানা যাচ্ছে সেগুলো পড়ে নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখে নিতে আদিত্যর সারা সকালটা কেটে গেল। ভাগ্যিস বাঙালি পাঠক গল্প ভালবাসে, নাহলে খবর কাগজগুলো এতটা ফেনিয়ে লিখত না। অবশ্য আদিত্যর লেখার মধ্যে তার নিজের কল্পনাও কিছু মিশে ছিল, যেমন 'পারসোনাল নোটস'-এ থাকে। আসলে মিডিয়ার লেখাগুলো থেকে সে একটা গল্প খাড়া করার চেষ্টা করছিল।

কুমুদিনী বিত্ত নিগমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান স্বত্বাধিকারী সত্যজিৎ সামন্ত, ওরফে বটুক সামন্ত। বটুক সামন্তর বাবা মহাদেব সামন্ত বর্ধমানের জোতদার ছিলেন। টাকা ধার দেবারও বড় ব্যবসা ছিল তার। মহাদেবের দুই ছেলের কেউই কিন্তু কৃষিকাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখেনি। মহাদেব মারা যাবার পর দুই ছেলে মিলে বাবার জমিজমা প্রায় সবই বেচে দিয়েছিল। বড় ছেলে তার ভাগের টাকা দিয়ে কন্সট্রাকশনের বিজনেস শুরু করে। ছোট ছেলে বটুক সামন্তই বরং কিছুটা বাবার লাইনে রয়ে গেছে। কুমুদিনী বিত্ত নিগম নামে স্টক ব্রোকিং কম্পানি হলেও তার আসল কাজ টাকা ধার দেওয়া।

প্রথম কয়েক বছর বটুক সামন্ত নিজের পুঁজি থেকে কিছু কিছু নতুন ব্যবসায় ধার দিয়েছিল। এখন হলে তার ধার দেওয়া পুঁজিকে বলা যেত ভেনচার ক্যাপিটাল, নতুন ব্যবসাগুলোকে বলা যেত স্টার্ট আপস। কিন্তু তিন দশক আগে, যখন বটুক সামন্ত তার ব্যবসা শুরু করেছিল, তখনও এসব নাম বাজারে আসেনি। সে যাই হোক, এই ধারগুলোতে ঝুঁকির মাত্রা একটু বেশিই ছিল, তাই বটুক সামন্তর সুদের হারও ছিল বেশ চড়া। তবে লোকে বলে, কাকে ধার দেওয়া উচিত আর কাকে নয় এ-ব্যাপারে বটুক সামন্তর একটা আশ্চর্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করত। ফলে ধার দেওয়া টাকার একটা বড় অংশ শোধ হয়ে যেত। তাছাড়া সঙ্গত কারণে

কেউ ধার শোধ দিতে না পারলে বটুক সামন্ত তাকে নানারকম ছাড় দিত, ধার শোধ করার তারিখটাও পিছিয়ে দিত। বস্তুত, আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর কায়দা-কানুনগুলো কিছুটা তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে আর অনেকটাই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বটুক সামন্ত রপ্ত করে ফেলেছিল।

একটু একটু করে বটুক সামন্ত আরও বড় জায়গায় ধার দিতে শুরু করল। বড় জায়গা মানে যাত্রা, সিনেমা, বার, নাইট ক্লাব। টাকা ধার দেওয়ার সময় বটুক সামন্ত একটা জিনিসই দেখত। সে দেখত, যে-ব্যবসায় সে ধার দিচ্ছে সেটা আইনসম্মত কিনা। বেআইনি ব্যবসায় সে কখনও ধার দিত না। কিন্তু যে-ব্যবসায় সে টাকা ধার দিচ্ছে তার নৈতিকতা নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামাত না। অবশ্য আর একটা দিক থেকে তার ব্যবসাটা বেআইনি রাস্তায় পা দিয়েছিল। ব্যবসাটা বাড়াতে গেলে, অর্থাৎ আরও আরও টাকা ধার দিতে গেলে, সে দেখল তার টাকার প্রয়োজন। কোথায় সে অত টাকা পাবে? কোনো ব্যাঙ্ক তাকে অত টাকা দেবে না। তাই সে বাঁকা পথ ধরল।

আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে এমন লোকের অভাব নেই যাদের বিস্তর কালো সম্পত্তি আছে। সম্পত্তিগুলো অনেক সময় বেনামী জমি-জমায় আটকে থাকে, কখনও পড়ে থাকে নগদে, কখনও বা গয়নাগাঁটিতে। ইচ্ছে থাকলেও টাকার মালিক টাকাটা কোথাও খাটিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারে না। বটুক সামন্ত এইসব কালো টাকার হদিশ করে সেগুলো তার মহাজনী ব্যবসার কাজে লাগাতে শুরু করল। কালো টাকার মালিক পাবে মাসিক এক পার্সেন্ট সুদ, বটুক সামন্তর কম্পানি পাবে আরও এক পার্সেন্ট। যেসব জায়গায় বটুক সামন্ত টাকা ধার দিত সেখান থেকে মাসিক দু-পার্সেন্ট সুদ আদায় করাটা মোটেই শক্ত নয়। কালো টাকা ধার দেওয়া শুরু করার পর থেকে কুমুদিনীর ব্যবসা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। গত ৯ ফেব্রুয়ারি, যখন বটুক সামন্তকে কুমুদিনী থেকে অ্যারেস্ট করে কুমুদিনী বিত্ত নিগমের পুরো অফিস সিল করে দেওয়া হয় তখন, পুলিসের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, বাজারে কুমুদিনীর দেওয়া ধারের পরিমাণ একশো কোটি টাকার বেশি। দুর্ভাগ্যবশত, কারা কতটা ধার নিয়েছে এবং কারা কতটা কালো টাকা কুমুদিনীকে ধার দিয়েছে তার কোনও তালিকা পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। অনুমান করা হচ্ছে, কোথাও একটা তালিকাগুলো আছে, কিন্তু কোথায় পুলিশ জানে না।

সংবাদপত্রগুলো একটা প্রশ্ন বারবার তুলছে। প্রশ্ন উঠছে, কী করে এত বছর ধরে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে কুমুদিনী ব্যবসা চালিয়ে গেল? আর এখনই বা কী এমন ঘটল যাতে হঠাৎ পুলিশ তৎপর হয়ে কুমুদিনীর মালিককে অ্যারেস্ট করে ফেলল? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পুলিশ দেয়নি, কিন্তু সাংবাদিকরা মনে করছে এর পিছনে গভীর কোনও রহস্য আছে।

বটুক সামন্ত সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত তথ্যও মিডিয়া থেকে জানা গেল। বটুক সামন্তর বয়েস বছর ষাট-বাষট্টি। তার স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র, দু-জনেই বর্তমান, কিন্তু কেউই তার সঙ্গে থাকে না। বস্তুত, স্ত্রী-পুত্রর সঙ্গে বটুকবাবুর সম্পর্কটা বেশ ছাড়া-ছাড়া। বহুদিন আগে বটুক সামন্তের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বটুকবাবুর স্ত্রী আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন, এখনও তাই থাকেন। যদিও, মিডিয়ার খবর, কাগজে কলমে বিবাহ-বিচ্ছেদ তাদের হয়নি। ওপর ওপর একটা সম্পর্ক এখনও টিকে আছে। বটুকবাবু মাঝে মাঝে স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে আসেন। বটুকবাবুর ছেলে এখন বড় হয়ে গেছে। তার মা-ই তাকে মানুষ করেছে। সে বর্ধমান মেডিকাল কলেজে বাচ্চাদের ডাক্তার, বর্ধমানেই তার মাকে নিয়ে থাকে। মা-ছেলে বাবার খবর খুব বেশি রাখে না।

বটুক সামন্তর আরেকটা সংসার আছে। সাতপাক ঘোরা, মালাবদল করা সংসার নয়, বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত হাফ-গেরস্থালি। বটুকবাবুর ক্ষেত্রে কিন্তু এই দ্বিতীয় সম্পর্কটাই টিকে আছে। বটুক সামন্তর সঙ্গে যখন অভিনেত্রী সুমনা ঘোষালের প্রথম আলাপ হয় তখন সুমনার ফিল্মি কেরিয়ার নিঃসন্দেহে ঊর্ধ্বমুখী। একটা বাংলা ছবিতে বটুক সামন্ত কিছু পয়সা লগ্নি করেছিল। সেই ছবির ঠিক নায়িকা নয়, সহনায়িকা ছিল সুমনা ঘোষাল। সুমনার বয়েস তখনও তিরিশ ছাড়ায়নি, বটুক সামন্তর বয়েস সদ্য তিরিশ ছাড়িয়েছে। সে

যাত্রা সম্পর্কটা কত দূর এগিয়েছিল জানা যায় না, তবে তার পরের কয়েক বছর ফিল্মি জমায়েত-টমায়েতে মাঝে-মাঝে দু-জনকে এক সঙ্গে দেখা যেত।

সুমনা ঘোষালের বংশ-পরিচয় কিছুটা ঘোলাটে ছিল। তার মা সুনয়না ছিলেন পুরোনো যুগের পেশাদার নাট্যাভিনেত্রী। কিছুদিনের জন্য সুনয়নার সঙ্গে অজয় ঘোষাল নামে এক নাট্য-পরিচালকের সম্পর্ক হয়। থিয়েটার জগতের পুরোনো লোক যারা বেঁচে আছেন, তাঁরা কেউ কেউ মনে করেন, সুমনা সেই সম্পর্কের ফল। অবশ্য অন্য সম্ভবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শোনা যায়, সুমনার জন্মের কিছুদিন বাদে অজয় ঘোষাল তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়। সুমনাকে তার মা একা হাতেই বড় করেছিলেন। অভিনয় করতে এসে একটা ভদ্র গোছের পদবী সুমনার দরকার ছিল। কিন্তু তার মায়ের কোনও পদবী ছিল না। সুমনা অজয় ঘোষালের পদবীটাই গ্রহণ করে। এর থেকে মনে হতেই পারে অজয় ঘোষালই তার জন্মদাতা পিতা।

বটুক সামন্তর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কয়েক বছর পরে সুমনা ঘোষাল দু-একটা হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয়ের বরাত পেয়ে কিছুদিনের জন্য মুম্বাই চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে উপলব্ধি করল বাংলা ছবিতে অভিনয় করার জন্য আর কেউ তাকে ডাকছে না। আসলে সে টের পায়নি ইতিমধ্যে একটু একটু করে বাংলা ছবিতে অভিনয়ের ধরনটাই পালটে গেছে। সে যেরকম চড়া দাগের অভিনয় ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছে, করে এসেছে, যেটা গ্রামের দিকের দর্শক এক সময় খুব পছন্দ করত, এখন বাংলা ছবিতে সেরকম অভিনয় আর চলে না। কিছুদিন সে যাত্রায় অভিনয়ের চেষ্টা করল। কিন্তু যাত্রায় অভিনয় করা মুখের কথা নয়। ভ্রাম্যমান জীবন, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক থাকে না, ঘুমেরও কোনও বাঁধাধরা সময় নেই। সুমনা ঘোষাল অসুস্থ হয়ে যাত্রার লাইনটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

হাতে কাজ নেই, ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা নেই, আত্মীয়স্বজন বা বংশ-পরিচয় নেই, এমনকি তার শরীর, যা দিয়ে সে এক সময় অনায়াসে পুরুষদের আকর্ষণ করত, সুমনা টের পেল, সেটাও শিথিল হয়ে আসছে। এই সময় তার সঙ্গে বটুক সামন্তর আবার দেখা হয়। সেটা বারো-তেরো বছর আগেকার কথা। বটুক সামন্তর ব্যক্তিগত জীবন তখন তলানিতে ঠেকেছে। তার বউ ছেলেকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। জনশ্রুতি, সেই চলে যাওয়ার পিছনে বটুক সামন্তের চরিত্রগত শৈথিল্যের ইন্ধন ছিল। সে যাই হোক, সেই সময়ে বটুক এবং সুমনা দু-জনেই আশ্রয় খুঁজছে, সঙ্গী খুঁজছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের ভেতর একটা মেলবন্ধন ঘটে যায়। বটুক সামন্তর ব্যবসা তখন রমরমিয়ে চলছে। সে সুমনার জন্য টালিগঞ্জ এলাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনে দেয়। সেই ফ্ল্যাটে সুমনার সঙ্গে সে নিজে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকত। কিন্তু ভবানীপুর অঞ্চলে তার যে পুরোনো বাড়িটা ছিল সেটা সে অ্যারেস্ট হওয়ার দিন অব্দি ছাড়েনি।

ফিল্ম প্রোডিউসার রোহিত ধামানি সম্বন্ধেও ইন্টারনেট থেকে কিছু তথ্য জানা গেল। ধামানির ফিল্ম কম্পানির নাম 'নিউ এজ মুভিজ'। এই ব্যানারে সে এখন অব্দি বাইশখানা সিনেমা প্রোডিউস করেছে। তার মধ্যে 'নাগিনী কন্যার অভিশাপ', 'শাঁখা সিঁদুর', 'রাঙাবউ' 'ঢপের চপ' ইত্যাদি কিছু ছবি গ্রামাঞ্চলে ভালই ব্যবসা করেছে। কিছু ছবি আবার সুপারফ্লপ। ধামানির নতুন ছবির নাম 'ফেরারি'। ছবির খানিকটা শুটিং ইয়োরোপে হয়েছে, বাকিটা হবে আলাস্কার টনগ্যাস ন্যাশানাল ফরেস্টে। এত বিগ বাজেট বাংলা ছবি নাকি সাম্প্রতিক কালে হয়নি। দু-একটা গসিপ ম্যাগাজিন বলছে, এই মুহূর্তে টাকার জন্য শুটিং আটকে আছে, টাকার জোগাড় হলেই আবার শুটিং শুরু হবে।

আদিত্য লেখা বন্ধ করে একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর টেবিলের ওপর থেকে মোবাইলটা তুলে তার পুলিশ বন্ধু গৌতম দাশগুপ্তর নম্বরটা লাগাল। গৌতম আবার রিং টোন বদলেছে। আগে গৌতমকে ফোন করলে কিশোরকুমার কিছুক্ষণ 'জীবন সে ভরি তেরি আঁখে' শোনাতেন। কয়েক সপ্তাহ হল তাঁর বদলে মহম্মদ রফি 'আভি না যায়ো ছোড় কর' শোনাচ্ছেন। দুটো গানই আদিত্যর খুব ভাল লাগে। গৌতমের কলার টিউনটা শুনতে শুনতে সে ভাবছিল আজ দুপুরে ইউ টিউবে পুরোনো হিন্দি গান শুনলে বেশ হয়।

'কী রে, দোল-টোল খেলছিস?' দু-রাউন্ড গান বাজার পর গৌতম ফোন ধরল।

'না, না। দোলের ভয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছি। অবশ্য এখানে আমাকে রঙ দেওয়ার মতো কেউ নেই। তুই দোল খেলেছিস?' আদিত্য কথা বলতে বলতে মুখে একটা সিগারেট লাগাল।

'আমারও এবার দোল খেলা হচ্ছে না। মালিনী বাচ্চা নিয়ে হোলি খেলতে দিল্লী গেছে। বাড়ি ফাঁকা। আমি হাতে একটু সময় পেয়ে বারান্দায় গাছগুলোর পরিচর্যা করছিলাম।'

আদিত্য আন্দাজ করতে পারল কেন গৌতমের ফোন ধরতে দেরি হচ্ছিল।

'আজ সন্ধেবেলা কী করছিস? আমার বাড়িতে চলে আয় না। একটা হুইস্কির বোতল অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। তুই এলে খুলব।' গৌতম ষড়যন্ত্র করার গলায় বলল।

'আজ হবে না রে। সন্ধেবেলা অমিতাভ আগেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে। মালিনীর মতো রত্নাও ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। একা একা খেতে ভাল লাগে না, তাই আমাকে ডেকেছে। বাইরে থেকে খাবার আনাবে। তুই একা আছিস জানলে তোকেও নিশ্চয় ডাকত। তুই বরং আমার সঙ্গে চল। না হলে একা বাড়িতে বসে বোর হবি। আমি অমিতাভকে ফোন করে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে তো আর কোনও ফর্মালিটি নেই।'

'ঠিক হ্যায়। তোর সঙ্গেই যাব। তুই অমিতাভকে ফোন করে বলে দে। আমিও রঘু ডাকাতের মতো ওকে ফোন করে বলছি সন্ধেবেলা ওর বাড়িতে চড়াও হব। তাহলে সন্ধেবেলা দেখা হচ্ছে। সাতটার মধ্যে আমি অমিতাভর বাড়িতে পৌঁছে যাব।' আদিত্যর মনে হল গৌতম ফোনটা কেটে দেওয়ার মতলব করছে।

'দাঁড়া, দাঁড়া। ফোনটা রাখিস না। তোর সঙ্গে কথা আছে।' আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল।

'বল।'

'কুমুদিনী বিত্ত নিগম বা তার মালিক সত্যজিৎ ওরফে বটুক সামন্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য দরকার ছিল, যে বটুক সামন্তকে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তুই কি জানিস ব্যাপারটা?'

'কুমুদিনী বিত্ত নিগম? তুই আবার এর মধ্যে ঢুকলি কী করে?' আদিত্যর শেষ প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে গৌতম পালটা প্রশ্ন করল। সে যেন একটু অবাক হয়েছে।

'আমার এক ক্লায়েন্ট কুমুদিনীকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। সে জানতে চায় টাকাটা কুমুদিনী অব্দি পৌঁছেছিল নাকি যার হাত দিয়ে টাকাটা পাঠানো হয়েছিল সে-ই মেরে দিয়েছে। টাকাটা অবশ্য, আমার ধারণা, খানিকটা কালো।'

'এটা তো একমাত্র বটুক সামন্তই বলতে পারে। আমি যতদূর জানি, গতকাল বিকেলে বটুক সামন্ত বেল-এ ছাড়া পেয়েছে। খবরটা এখনও মিডিয়ার কাছে পৌঁছয়নি। বটুক সামন্তই পুলিশ এবং কোর্টকে অনুরোধ করেছিল তার জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবরটা যেন এখনই প্রেসকে জানানো না হয়। খবরটা জানতে পারলে সাংবাদিকরা তাকে ছিঁড়ে খাবে। কোর্ট ঠিক করে দিয়েছে বটুক এখন তার ভবানীপুরের বাড়িতে থাকবে। ভবানীপুর থানায় নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে তাকে। তুই আগামীকাল একবার ভবানীপুর থানায় খোঁজ কর। আমি ওখানকার বড়বাবুকে বলে রাখব। উনি হয়ত বটুকবাবুর সঙ্গে তোর দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আর কিছু জানতে চাস?'

'মিডিয়া রিপোর্ট থেকে কেসটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পেরেছি। কিন্তু ডিটেলটা আর একটু জানতে পারলে ভাল হত। বিশেষ করে একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। এতদিন ধরে বটুক সামন্ত তো নির্বিঘ্নে ব্যবসা করছিল। হঠাৎ এখন পুলিশ তাকে ধরল কেন?'

'আমি কেসটার মধ্যে খুব বেশি ঢুকিনি। তুই যদি ঢুকতে চাস তাহলে সুদর্শন শিকদার বলে যে ছেলেটি কেসটা ইনভেস্টিগেট করছে তার সঙ্গে তোকে যোগাযোগ করিয়ে দেব। আর তুই যে প্রশ্নটা করলি তার একটা মোটামুটি উত্তর আমি দিতে পারি। দিল্লী থেকে একটা ইন্সট্রাকশান এসেছে ভুয়ো এবং বেআইনি ফিনান্স কম্পানিগুলোর ওপর ক্র্যাক-ডাউন করতে হবে। কুমুদিনী ছাড়াও আরও কয়েকটা কম্পানিকে সিল

করে দেওয়া হয়েছে। ডিটেলটা তোকে শিকদার বলতে পারবে। আমার কাছে শিকদারের নম্বরটা নেই। কাল অফিস গিয়ে আমি ওটা তোকে জানিয়ে দেব। আর কিছু?'

'আপাতত এইটুকুই থাকুক। সন্ধেবেলা দেখা হচ্ছে।' আদিত্য গৌতমের কানেকশানটা কেটে দিয়ে, অমিতাভর নম্বরটা লাগাল।

২

আদিত্যদের মেসে দোলের দিন দুপুরবেলায় নিরামিষ খিচুড়ি রান্না হয়। এটা ওখানকার পুরোনো প্রথা। বহুদিন আগে এই মেস ও হোটেলের মালিক ছিলেন গিরিধারী দাস। তিনি ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব। তাঁর আমলে দোল-পূর্ণিমার রাত্তিরে হোটেলের দোতলায় ঘটা করে রাধা-গোবিন্দকে ভোগ দেওয়া হতো। সেই থেকে দুপুরবেলায় খিচুড়ি রান্নার প্রথা চলে আসছে। গিরিধারী দাস অনেক দিন নেই, মেসও হাতবদল হয়ে গেছে। কিন্তু খিচুড়ি রান্নার প্রথাটা রয়ে গেছে। দু-একজন একালের বোর্ডার দাবি তুলেছিল, দোলের দিন দুপুরে মাংস-ভাত চাই। কিন্তু মেসের পাচক ভানু ঠাকুর, যে গিরিধারী দাসের আমল থেকে এখানে রয়েছে, সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। আসলে ভানু ঠাকুর নিজেও বৈষ্ণব। সে আদিত্যকে বলেছে, দোলের দিন খিচুড়ি রান্নার পর মনে মনে গোবিন্দকে 'উৎছুগগু' করে নিয়ে তারপর সে সবাইকে খেতে ডাকে। তাই দোলের দিন মাংস রান্নার প্রশ্নই ওঠে না। এই মেসে ভানু ঠাকুরের কথার ওপর কথা বলবে এমন লোক নেই। মেসের বর্তমান ম্যানেজার লোকটা কর্কশ মেজাজের, কিন্তু সে-ও ভানু ঠাকুরকে সমীহ করে চলে। কারণ সে জানে ভানু ঠাকুরের হাতের রান্নার কারণেই মেস ও হোটেলের এত চাহিদা। ভানু ঠাকুর না থাকলে দুদিনে সব উঠে যেত।

দোলের দুপুরে খিচুড়ি-বেগুনি খেতে আদিত্যর ভালই লাগে। সে ভাবছিল এবার চান করে খেতে যাবে, বলরাম এসে দরজায় উঁকি মারল।

'একবার বাইরে এস তো।' বলরাম গলা বাড়িয়ে বলল।

'কী ব্যাপার রে?'

'এস না একবার বাইরে।' বলরাম আবার বলল।

আদিত্য ব্যাপারটা বুঝেছে। বলরাম তাকে আবীর দেবে বলে বাইরে বারান্দায় ডাকছে। সে বাইরে আসতে বলরাম তার পায়ে একটু আবীর দিয়ে প্রণাম করল। গোলাপি আবীর খানিকটা মেঝেতে পড়েছে, খানিকটা আদিত্যর পায়ে। বলরাম বলল, 'মেঝেটা পরিষ্কার করে দিতে হবে। ম্যানেজার বলেছে তিনতলায় রঙ খেলা একদম চলবেনি। এখানে আবীর পড়ে আছে দেখলে খুব রাগ করবে। তুমি তো আর নিচে নামবেনি।'

বলরাম ঝ্যাঁটা আনতে গেল। আদিত্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল। খুব বেশি লোক রাস্তায় নেই। শুধু মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা বেহারিদের দল রঙ মেখে ঢোল বাজাতে বাজাতে চলেছে। একটা গানও গাইছে। দেহাতি হোলির গান। বলরাম ঝ্যাঁটা নিয়ে ফিরে এল। আদিত্য পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে বলরামের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ। বাচ্চাদের মিষ্টি কিনে দিস।'

'এটা আবার কেন?' বলরাম টাকাটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলতে হয় বলে বলল।

আদিত্য তার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাড়ির খবর কী? সব ঠিকঠাক চলছে তো?'

'এমনিতে তো ভালই চলছিল, কিছুদিন আগে এক ঝামেলা হয়েছে। আমাদের ওদিকে নবোদয় বলে একটা কম্পানি ছিল। তারা টাকা ধার দিত, আবার আমার মতো লোকেদের টাকা জমা নিয়ে ভাল সুদও দিত। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক যা করে এরাও তাই করত। শুধু ধারের ওপর সুদটা নিত বেশি। আবার টাকা জমা রাখলে ব্যাঙ্ক যা সুদ দেয় তার থেকে ঢের বেশি সুদও দিত।'

বলরাম একটু থামল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ওই নবোদয় কম্পানির কর্তাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেন? পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কেন?' আদিত্য ভুরু কোঁচকাল।

'বলছে, এসব নাকি বেআইনি ব্যবসা। এসব ব্যবসা করতে গেলে নাকি গরমেন্টের অনুমতি লাগে। সেসব নাকি এদের নেই। যত্ত বাজে কথা। পুলিশের টাকা খাওয়ার মতলব। এত বছর ধরে ব্যবসা চালাচ্ছে আগে তো কেউ এসব কথা বলেনি।'

'তা, তোর তাতে কী অসুবিধে হচ্ছে?'

'আমার অসুবিধে হবেনি? আমি আর আমার গিন্নি মিলে গতরে খেটে কিছু টাকা জমিয়েছিলুম। তার মধ্যে হাজার কুড়ি টাকা ওই নবোদয় কম্পানিতে রাখা ছিল। এখন শুনছি সেসব টাকা নাকি আর ফেরত পাওয়া যাবেনি।' বলরামের গলাটা ধরে এল। 'কুড়ি হাজার টাকা আমাদের কাছে অনেক টাকা গো!'

'আর যারা টাকা ধার নিয়েছিল? তাদের কী হবে?'

'তাদের তো ভারি মজা। সবাই বলছে, তাদের নাকি আর টাকা শোধ দিতে হবেনি। আমার বাবা তো ছোট থেকে আমাদের শেখাল যেটুকু পারো টাকা জমাও। কখনও কারো কাছে ধার কোরোনি। এখন তো দেখছি ধার করলেই ভাল ছিল।'

'কিন্তু বিপদে-আপদে ধারও তো আর পাওয়া যাবে না। তোদের গ্রামে ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক কিছু নেই?'

'আমাদের গ্রামে নেই। একটু দূরে আছে। কিন্তু থাকলে কী হবে, ব্যাঙ্ক তো আর আমাদের টাকা ধার দেবেনি। আমাদের মানে আমার মতো যাদের জমি-জমা নেই, বন্ধক রাখার কিছু নেই, ব্যাঙ্ক তাদের টাকা ধার দেবে কেন? ধার দিলে ওই নবোদয় কম্পানিই দিত। তারা তো অনেক দিন ওই অঞ্চলে ব্যবসা করছে। তাদের লোক আমাদের সকলকে চেনে।'

'তা তোরা পুলিশকে গিয়ে বলিসনি যে ওই কম্পানিতে তোদের টাকা জমা আছে?'

'পুলিশ নয়, পঞ্চায়েতকে বলেছি। পঞ্চায়েত থেকে নাকি সরকারের কাছে লিস্টি জমা দিয়েছে। নবোদয় কম্পানিতে কার কত টাকা জমা ছিল সেসব লেখা আছে ওই লিস্টিতে। সঙ্গে কম্পানি যে কাগজ দিয়েছিল তার ছবি জমা দিয়েছি। তবে পঞ্চায়েত কতটা কী করতে পারবে জানি না। তোমার তো পুলিশের উঁচু মহলে খুব চেনাশোনা আছে। একটু দ্যাখো না টাকাটা উদ্ধার করে দিতে পারো কি না।'

আদিত্যর খিদে পাচ্ছিল, সে বলল, 'পরে তোর সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলব। এখন খেয়ে আসি। দেরি করলে খিচুড়ি ফুরিয়ে যাবে।'

খাবার ঘরে ঢোকার আগে আদিত্য পিছন ফিরে দেখল বলরাম তখনও ঝ্যাঁটা হাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

খাবার পর ঘরে ফিরে এসে আদিত্য একটা সিগারেট ধরানোর মতলব করছিল, মোবাইলে পিঁক করে শব্দ হতে বুঝল হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এসেছে। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের বেশিরভাগ, বিশেষ করে ভিডিও-টিডিওগুলো, আদিত্য খোলে না। না খুলেই ডিলিট করে দেয়। অধিকাংশই অবশ্য খোলার যোগ্য নয়। কারো অভ্যাস রোজ সকালে গোলাপ ফুলের ছবি সমেত গুড মর্নিং পাঠানো। কারও নিরলস বদ-রসিকতা পাঠিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। কেউ নিয়ম করে সম্পূর্ণ ভুল খবর পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছে। কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক নেতাদের ছবি সহ বার্তা পাঠায়। এসবের কোনওটাই আদিত্যর কাজে লাগে না। তবে দু-চারজন বন্ধু আছে যাদের মেল না খুললেই নয়।

সম্প্রতি এই তালিকায় কেয়া বাগচির নামটা যুক্ত হয়েছে। কেয়ার সঙ্গে চন্দ্রলেখা অন্তর্ধানের সময় আলাপ, একটা বন্ধুতাও তখন তৈরি হয়েছিল, সেটা টিকে আছে এখনও। শুধু টিকে আছে বললে ভুল হবে, আদিত্যর অস্বস্তি সত্ত্বেও সম্পর্কটা ক্রমে আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

হোয়াটসঅ্যাপ খুলে আদিত্য দেখল, কেয়া মেসেজ করেছে, 'কেমন আছ? দোল খেলেছ?' সঙ্গে তার নিজের কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছে। হস্টেলের ছাদে কেয়া এবং অন্যান্য হস্টেলবাসিনীরা রঙ মেখে ভূত হয়ে দোল খেলছে। অন্যদের থেকে বেশ খানিকটা লম্বা বলে ছবিতে কেয়াকে আদিত্য আলাদা করতে চিনতে পারল।

'ভাল আছি। দোল খেলিনি।' আদিত্য এই সংক্ষিপ্ত উত্তর পাঠানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে 'টাইপিং' কথাটা ফুটে উঠল। অর্থাৎ কেয়া গল্প করার মুডে আছে। আদিত্য মোবাইল রেখে ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল। তারপর কেয়ার পাঠানো লম্বা মেসেজটা না পড়েই মোবাইলে কেয়ার নম্বরটা লাগাল। হোয়াটসঅ্যাপে লিখে লিখে গল্প করার অভ্যাসটা আদিত্য এখনও রপ্ত করতে পারেনি। তার থেকে সরাসরি কথা বলা ভাল।

'কী? উত্তর দিলে না যা জিজ্ঞেস করলাম?' ফোন ধরেই কেয়া বুলেটের মতো প্রশ্ন করল।

'কী জিজ্ঞেস করলে?' আদিত্য মৃদুস্বরে বলল।

'হায় কপাল! অত বড় একটা মেসেজ করলাম পড়েও দেখলে না?'

'পরে পড়ে নেব। এখন কী জিজ্ঞেস করছ, বল।'

'কিছু না। কিচ্ছু জিজ্ঞেস করিনি। ছাড়।'

আদিত্যর মনে হল কেয়া একটু চটেছে। সে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কথাটা অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে নরমভাবে বলল, 'দুপুরের খাওয়া হয়েছে?'

কেয়ার একটা গুণ আছে, বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারে না। সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একটু আগে খেয়ে ওপরে উঠেছি।' তারপর আর একটু থেমে বলল, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

'আমিও একটু আগে খেয়ে ঘরে এসেছি।'

'তার মানে নিশ্চয় এখন সিগারেট ধরিয়েছ। ঠিক বলছি কি না? কবে যে ওটা ছাড়বে জানি না।'

আদিত্য চুপ করে রইল। কোনও উত্তর তো তার কাছে নেই। সে নিজেও আজকাল বোঝে সিগারেটটা ছাড়া দরকার। কিন্তু কী করবে? কিছুক্ষণ সিগারেট না খেলেই অস্থির অস্থির লাগে! আর খাবার পরে একটা সিগারেট তো না খেলেই নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তোমাদের হস্টেলে আজ কী খাওয়াল?'

'দোলের দিন মাংস-ভাত ছাড়া আবার কী খাওয়াবে?'

'আমাদের তো নিরামিষ। খিচুড়ি-বেগুনি।'

'দোলের দিন নিরামিষ! কেন? কোন দুঃখে?'

'আমাদের আগের মালিক বোষ্টম ছিল। দোলের দিন রাধা-গোবিন্দের পুজো করত। খিচুড়ি ভোগ দিত। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।'

'আর রাত্তিরে কী ব্যবস্থা? বৈষ্ণব মালপোয়া? লুচি মোহনভোগ?'

'আরে না, না। লুচি কে খাওয়াবে? স্রেফ রুটি-তরকারি। নিরামিষ। তবে আজ রাত্তিরে আমি এখানে খাচ্ছি না। অমিতাভদের বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

'বাঃ। তাহলে তো তুমি সন্ধেবেলা বালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছ। স্ট্রেঞ্জ কোয়েনসিডেন্স, আমারও আজ রাত্তিরে গোলপার্কের কাছে এক কলিগের বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন। আমি সাতটা নাগাদ ওখানে পৌঁছব ভাবছি। একটা গাড়ি ভাড়া করেছি। রাত্তিরে ফিরতে হবে তো। যাওয়ার সময় তোমাকে কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে তুলে নিয়ে বালিগঞ্জে নামিয়ে দিতে পারি। ফেরার সময়ও আমার সঙ্গে ফিরতে পার। আজ ছুটির দিনে মেট্রো তো বেশিক্ষণ চলবে না। আর তুমি যা কিপটে, ট্যাক্সি করবে বলে মনে হয় না। সেই বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'তুমি তুলে নিলে তো খুবই ভাল হয়। একটু আগে আগে এস। কিছুক্ষণ একসঙ্গে বসে কোথাও কফি খাওয়া যাবে।' একসঙ্গে বসে কফি খাওয়ার প্রস্তাবটা অজান্তেই আদিত্যর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

'আদিত্য মজুমদার আমার সঙ্গে বসে কফি খেতে চাইছে! তাও নিজের থেকে! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!' আদিত্যর মনে হল, কেয়ার গলায় ওপর ওপর যতই ঠাট্টা থাকুক, ভেতরে ভেতরে সে বেশ খুশি হয়েছে।

৩

আদিত্য বহুদিন ধরে লক্ষ করছে দোলের সন্ধেবেলা বাঙালি মেয়েদের আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। যেন আকাশ থেকে নিয়ম জারি হয়েছে এক রহস্যময় অলৌকিক আভা ওই বিশেষ সন্ধেবেলা প্রত্যেকটি বাঙালি মেয়ের মুখের ওপর এসে পড়বে। আসল ব্যাপারটা বোধহয় নেহাতই জাগতিক। সারা সকাল দোল খেলার পর মেয়েরা নিশ্চয় শ্যাম্পু করে, ফলে তাদের চেহারায় একটা শুষ্ক, তাপসী ভাব ফুটে ওঠে। আদিত্যর ধারণা, সেই তাপসী শুষ্কতার সঙ্গে মুখমণ্ডলে রয়ে যাওয়া রঙের আভাকে মেশালেই এই অলৌকিক আভার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

তার পাশে বসে থাকা কেয়া বাগচির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আদিত্য এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল। কেয়ার বয়েস তার মতই হবে। অর্থাৎ বছর চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। এই বয়েসে অবিবাহিত মেয়েদের শরীর খানিকটা শুকিয়ে যায়। কেয়ারও গেছে। বিবাহিত মেয়েদের বেলায় ঠিক এর উল্টো। স্বাভাবিক দাম্পত্য এবং তার সঙ্গে দু-একটা সন্তান হওয়ার পর সাধারণত দেখা যায় বিবাহিত বাঙালি মেয়েরা একটু মুটিয়ে যাচ্ছে। হয়ত সবাই নয়, তবে অনেকেই।

তাদের গাড়িটা এখন এসপ্লানেড পেরোচ্ছে। দোলের সন্ধেবেলা সাহেব পাড়া ফাঁকা, শুধু লিন্ডসে স্ট্রিটে কিছু ভিড়। কেউ কেউ দোলের ছুটির সুযোগ নিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করতে এসেছে। কেয়াও আজ শ্যাম্পু করেছে। হাওয়ায় চুল উড়ছে। সামলাতে পারছে না। জানালার কাচটা তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে এসি চালাতে বলল। বদ্ধ গাড়ির মধ্যে কেয়ার চুলের গন্ধ আর তার মেয়েলি পারফিউমের সুবাস এই দুই মিলিয়ে আদিত্যকে খুব টানছে। আদিত্যর মনে হচ্ছিল, সারাদিন রোদ্দুরে শুকোনোর পর কাচা জামাকাপড় থেকে যেমন একটা টাটকা গন্ধ মেশানো চাপা উত্তাপ আসে, কেয়ার ঈষৎ শুকিয়ে আসা শরীর থেকে তেমন একটা উত্তাপ আসছে।

'পার্ক স্ট্রিট ধরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে যাব? নাকি একেবারে সোজা গিয়ে সাদার্ন এভিনিউ ধরব? গোলপার্ক যাবেন তো?' ড্রাইভার পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছনোর আগেই জিজ্ঞেস করল।

'তুমি এখন সোজা চল। রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে বাঁয়ে যাবে। তারপর আমি বলে দেব কোথায় যেতে হবে।'

কেয়া ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজকাল পূর্ণ দাস রোডে অনেকগুলো ক্যাফে হয়েছে। আমাদের নর্থ ক্যালকাটায় ওরকম নেই। সেদিন স্টারি নাইটস বলে একটাতে এসেছিলাম। বেশ ভাল কফি করে। ওখানেই যাই।'

'স্টারি নাইটস? জব্বর নাম দিয়েছে তো।'

'যতদূর মনে পড়ছে নামটা স্টারি নাইটস-ই ছিল। অন্য কিছুও হতে পারে। তবে নামটা ভুল করলেও জায়গাটা মনে আছে। উল্টো দিকে একটা ধাবা কাম রোলের দোকান। চিনে ঠিক চলে যেতে পারব।' কেয়া স্টারি নাইটস-এর অনুষঙ্গটা ধরতে পারেনি।

'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে। আমি এসব ক্যাফে-ট্যাফের খবর একেবারেই রাখি না।' আদিত্য আত্মসমর্পনের ভঙ্গীতে বলল।

'তোমাকে বলেছি? কাল আমরা এক সপ্তাহের জন্য ডুয়ার্সে বেড়াতে যাচ্ছি?' কেয়া হঠাৎ মনে পড়ে যাবার মতো করে বলল।

'বলেছিলে। কিন্তু কালকেই যাচ্ছ সেটা খেয়াল ছিল না। কে কে যাচ্ছ?'

'হস্টেল থেকে আমরা চারজন যাচ্ছি। তিনটে ফরেস্ট রিসর্ট বুক করেছি, প্রত্যেকটাতে দু-দিন করে থাকব। এখান থেকে বাগডোগরা প্লেনে। বাগডোগরা থেকে একটা ড্রাইভারসুদ্ধু ইনোভা ভাড়া করা হয়েছে। সে-ই আমাদের পুরোটা ঘোরাবে। তারপর ফেরার সময় এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেবে।'

'চমৎকার ব্যবস্থা। ভাল করে ঘুরে এস। শুনেছি ডুয়ার্স ভীষণ সুন্দর।'

'তুমি আমাকে ফোন করবে কিন্তু।' কেয়া আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল।

আদিত্য খানিকটা অসহায়ভাবে খেয়াল করল কেয়া এক সপ্তাহ থাকবে না শুনে তার ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

স্টারি নাইটস-এর বাইরে ফুটপাথের ওপর ছাতার তলায় চেয়ার-টেবিল পাতা। ভেতরেও বসার ব্যবস্থা আছে। দেয়ালে ভ্যান গগের স্টারি নাইটস। নকলটা মন্দ হয়নি। তবে আদিত্য কোথাও একটা পড়েছিল আসল ছবিটা খুব বড় নয়। নকল ছবিটা কিন্তু একটা দেয়াল জুড়ে ফ্রেসকোর মতো করে এঁকেছে। অন্য দেয়ালগুলোতে আরও কিছু বিখ্যাত ভ্যান গগ--স্টিল লাইফ, বাতাসকল, কৃষক দম্পতি হলুদ খড়ের পাশে শুয়ে বিশ্রাম করছে। ক্যাফের মালিক, নাকি যে ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার ক্যাফেটা সাজিয়েছে সে, কে ভ্যান গগের ভক্ত? আদিত্যর ভ্যান গগ দেখলে জীবনানন্দের কবিতা খুব মনে পড়ে। যেমন স্টারি নাইটস দেখলে তার মনে পড়ে যায় সেই আশ্চর্য লাইন 'হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে'।

ক্যাফেতে বেশ ভিড়। ভেতরে, বাইরে কোথাও বসার জায়গা নেই। আদিত্যদের ভাগ্য ভাল, মিনিট দুয়েক রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর বাইরে একটা টেবিল খালি হল। এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই কেয়া সেখানে একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল। অগত্যা আদিত্যও গিয়ে বসল তার উল্টো দিকে।

'তোমাকে দুপুরে যেটা জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর দিলে না তো?' কেয়া বলল।

ভাগ্যক্রমে কেয়ার শেষ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজটা আদিত্য পড়ে এসেছে। সে বলল, 'তুমি জিজ্ঞেস করেছ, দোল খেলি না কেন? দোলের দিন সকালে কীভাবে সময় কাটালাম? দোল খেলতে ভাল লাগে না, তাই খেলি না। খুব ছোটবেলায় মামারবাড়িতে গিয়ে দোল খেলতাম। তারপর মামাতো দিদিদের বিয়ে হয়ে গেল, মামাও মারা গেল, আর কার সঙ্গে দোল খেলব? মামা মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে আমার মাও চলে গেল। মামারবাড়িতে আর যাওয়াই হতো না। দোলের দিনটা বাবার সঙ্গে কাটাতাম। বাবা আর আমি একসঙ্গে বসে সারাদিন গান শুনতাম। ঠুংরি, হোরি, চৈতি, কাজরি। দোলের দিন শুনব বলে বাবা পুরোনো স্পুল থেকে গান বাছাই করে রাখত। সেই পুরোনো স্পুলগুলো সব হারিয়ে গেছে।' আদিত্যর গলাটা হঠাৎ খুব বিষণ্ণ শোনাল।

'বাব্বা, কী আঁতেল। আজ সকালে কী করলে?' কেয়া হালকা গলায় বলল।

'কিছুক্ষণ গান শুনলাম। তারপর একটা সিনেমা দেখার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ দেখে আর ভাল লাগল না।'

'কী সিনেমা?'

'একটা পুরোনো হলিউড। ক্যাথারিন ড্যানিউব, মার্সেলো মাস্ত্রাওনির ছবি। ইউটিউবে আছে। সিনেমার কথায় মনে পড়ল, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল।'

'সিনেমার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। সিনেমার ব্যাপারে। বাংলা সিনেমার অনেক খবর তো তুমি রাখ। সুমনা ঘোষাল বলে কারও কথা জান? বাংলা সিনেমায় মেনলি সাইড রোলে করত, এক সময় দু-একটা বি-গ্রেড ছবিতে নায়িকাও হয়েছিল। হিন্দি সিরিয়ালেও করেছে।'

'একটু একটু জানি, খুব বেশি জানি না।' কেয়া ভুরু কোঁচকাল।

'খুব বেশি জানার কথা নয়। যেটুকু জান একটু বলবে? এটা একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমার খুব দরকার।'

'সুমনা ঘোষাল, আমার যতদূর মনে পড়ছে, আশির দশকের গোড়ার দিকে প্রথম সিনেমায় এসেছিল। প্রথম ছবি 'দামাল মেয়ে', নায়িকার ছোট বয়েসের ভূমিকায়, তখন সিনেমায় তার নাম ছিল মীনা। ছোটদের ছবি। আমি তখন বহরমপুরে থাকি। বাবা-মার সঙ্গে দেখেছিলাম। তারপর বোধহয় দশ-বারো বছর তাকে সিনেমায় দেখিনি। সুমনা ঘোষাল হিসেবে নায়িকার ভূমিকায় বোধহয় প্রথম ছবি 'রঙিন স্বপ্ন'। এই সিনেমাটা আমি কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখেছিলাম। তার মানে সেটা মিড নাইন্টিস বা তার আর একটু পরে হবে। একেবারে বাজে ছবি। ওর সঙ্গে যে ছেলেটা হিরোর পার্ট করেছিল সেও বেশ রদ্দি। সুমনা তবু পরে আরও চান্স পেয়েছে, ওই ছেলেটা কিন্তু একেবারে হারিয়ে গেছে। তার নামটাও আমার মনে নেই। 'রঙিন স্বপ্ন' নামটা মনে আছে কারণ ওটার কিছু সিন আমাদের কলেজে শুটিং হয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট ওই কারণেই আমরা দল বেঁধে সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলাম। 'রঙিন স্বপ্ন'-র আগে হয়ত সুমনা ঘোষাল ছোট-খাট কিছু রোল করেছিল, আমি ঠিক বলতে পারব না। তুমি সুমনা ঘোষালের কোনও ছবি দেখনি?'

কথাটা বলেই কেয়া নিজেকে শুধরে নেওয়ার মতো করে বলল, 'না, না। তুমি কেমন করে দেখবে? তুমি তো আবার সাহেব, বাংলা সিনেমা দেখই না।' তার শেষের কথাগুলোতে কিছু ঠাট্টা ছিল।

'তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু মোটেই নয়। আমি কলেজে পড়ার সময় প্রচুর বাংলা সিনেমা দেখেছি। সুমনা ঘোষালের সিনেমাও দেখেছি। তবে সেটা সেই কলেজে পড়ার সময়। তারপর আর খুব একটা বাংলা কমার্শিয়াল ছবি দেখা হয়নি। আমার মনে হল তুমি সুমনা ঘোষালের সম্বন্ধে আমার থেকে বেশি জানবে।'

'যেটুকু মনে পড়ল বললাম তো।'

'আর কিছু মনে পড়ছে?'

বেয়ারা এতক্ষণে এঁটো কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে যেতে এসেছে। দুটো কফি দেওয়ার কথা বলতে সে না শুনে চলে গেল। বোধহয় অর্ডার নেওয়ার লোক আলাদা।

'সবাই বলে সুমনা ঘোষাল ডিরেক্টর অজয় ঘোষালের মেয়ে।' কেয়া একটু ভেবে নিয়ে আবার শুরু করল। 'এটা যারা সিনেমা পত্রিকা পড়ে সবাই জানে। সুমনার মাও অভিনেত্রী ছিলেন, তার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এটা মনে আছে যে একটা সময় সুমনা ঘোষাল প্রোডিউসার রোহিত ধামানির সঙ্গে থাকত। আরও কার কার সঙ্গে যেন থাকত। একেবারে গঙ্গাজলে ধোয়া চরিত্র। এইসব নিয়ে সিনেমা পত্রিকাগুলোতে প্রচুর কেচ্ছাও বেরোত। সুমনা ঘোষালের একটা ছেলে আছে। কেউ বলে সে রোহিত ধামানির ছেলে। আবার কেউ বলে অন্য কারও। ছেলেটার নামটা ভুলে যাচ্ছি। গসিপ ম্যাগাজিনগুলোতে ছেলেটার ছবি দেখেছি।'

'রোহিত ধামানির দ্বারা সুমনা ঘোষালের ছেলে?' এটা আদিত্যর কাছে নতুন খবর। 'কী রকম বয়েস হবে তার?'

'আমি কী করে বলব? মনে হয়, বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে। ঠিক বলতে পারব না। 'ফেরারি' বলে রোহিত ধামানি একটা নতুন ছবি প্রোডিউস করছে, তাতে নাকি সে প্রোডাকশানের চার্জে আছে। মানে প্রোডাকশান ম্যানেজার। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল। ছেলেটার নামটা মনে পড়ছে না। কিছু একটা ঘোষাল। মায়ের পদবীটা নিয়েছে। কিন্তু কিছু গসিপ কলাম লিখছে সে নাকি আসলে রোহিত ধামানিরই ছেলে।'

'আচ্ছা, সত্যজিৎ সামন্ত বলে কারও নাম জান? ডাকনাম বটুক সামন্ত।'

'না তো।'

'বটুক সামন্ত হল সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে সুমনা ঘোষাল বর্তমানে থাকে। নাম শোনোনি?'

'কোনও দিনও শুনিনি। আসলে সুমনা ঘোষাল নিয়ে গসিপ ম্যাগাজিনগুলোর আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই। এই লোকটাও কি সিনেমার প্রোডিউসার?'

'সরাসরি নয়। তবে পরোক্ষভাবে টাকা ঢালে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'খুলে বললেই বুঝতে পারবে।'

'তোমার ইনভলভমেন্টটা এখানে কোথায়?'

'সেটা জানতে গেলে তোমাকে পুরো গল্পটা শুনতে হবে। শোনো, সংক্ষেপে গল্পটা বলছি।'

কেয়া বাগচি আদিত্যকে যখন অমিতাভ-রত্নাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল তখন সোয়া সাতটা বেজে গেছে।

৪

'চিনে খাবি? না মোগলাই?' অমিতাভ জিজ্ঞেস করল। 'খাবারের অর্ডারটা এখনই দিয়ে রাখি। ওরা দিতে খুব সময় নেয়।'

ঘরে আদিত্য ছাড়া আরও দুজন অতিথি। গৌতম দাশগুপ্ত আদিত্যর আগেই একটা শিভাস রিগালের বোতল নিয়ে পৌঁছে গেছে। অন্য অতিথির নাম সুপর্ণ রায়, আদিত্যদের কলেজের বন্ধু, আদিত্য আসার মিনিট পাঁচেক পরে এসেছে। সুপর্ণ পেশায় অর্থনীতিবিদ, আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য একটা বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি নিয়েছে। সেই কাজের সুবাদে আজকাল তাকে মাঝে মাঝে ভারতে আসতে হয়।

সুপর্ণ আসবে আদিত্য জানত না। তার আসাটা নেহাতই আকস্মিক। সে বিকেলে কলকাতা পৌঁছে অমিতাভকে ফোন করে বলেছিল সন্ধেটা ফ্রি আছে। অমিতাভ তাকে নেমন্তন্ন করে দিয়েছে। কলেজে আদিত্য আর সুপর্ণ খুব বন্ধু ছিল। এখন অবশ্য কালেভদ্রে দেখা হয়। বরং অমিতাভর সঙ্গে সুপর্ণর কিছু যোগাযোগ আছে।

'আমি চিনের ফরে। আজকাল মোগলাই খেয়ে হজম করতে পারি না।' গৌতম সবার আগে তার মত জানিয়ে দিল।

'চিনেটা ডেফিনিটিলি সেফ। তবে আমার চিংড়িতে অ্যালার্জি আছে। আদিত্য?' সুপর্ণ আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক আছে চিনেই হোক। তবে গৌতমের হুইস্কিটার সদ্ব্যবহার করতে গেলে কাবাব-টাবাব জাতীয় কিছু থাকলে ভাল হত।' আদিত্যর গলাটা একটু অনিশ্চিত শোনাচ্ছে।

'আমিও তো সেইজন্যেই মোগলাই-এর কথা ভাবছিলাম।' অমিতাভ এতক্ষণে মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

'তাহলে কি দুটোই খাওয়া হবে? প্রথমে কিছু কাবাব এবং পরে চিনে।' গৌতমের গলায় দ্বিধা।

'না, না। মোগলাই আর চিনে মেশালে আমার মনে হয় এসথেটিকসটা ঘেঁটে যাবে। মানে, কালিনারি এসথেটিকস। তার থেকে পুরো মোগলাই-ই ভাল। আদিত্য, কী বলিস?' সুপর্ণ সমর্থনের আশায় আদিত্যর দিকে তাকাল।

'আই অ্যাম অল ফর মোগলাই।' আদিত্য তার পছন্দটা ঠিক করে ফেলেছে।

'তাহলে মোগলাই বলে দিচ্ছি। গৌতম, ঠিক আছে তো?' অমিতাভ গৌতমের সম্মতির আশায় তার দিকে তাকাল।

একঘরে হয়ে গিয়ে গৌতম দমে গেছে। ম্রিয়মাণ গলায় বলল, 'ওক্কে।'

'মাস কয়েক হল লেকের কাছে 'লখনৌ নগরী' বলে একটা রেস্টোরেন্ট হয়েছে। কয়েকটা রিভিউ পড়লাম, সব কটা রিভিউই বলছে এদের রান্না অসাধারণ। আমি ওখানেই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। ওদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে।' অমিতাভ ল্যাপটপে 'লখনৌ নগরী'র ফোন নম্বরটা খুঁজতে খুঁজতে বলল।

একটু পরে সকলে যখন হুইস্কির গ্লাস হাতে থিতু হয়েছে, আদিত্য সুপর্ণকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই ভারতে কী কাজ নিয়ে এসেছিস?'

'আমরা এখানে একটা বড় প্রজেক্ট করছি। শুধু ভারতে নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাতেও। প্রজেক্টটা ইনফরমাল ক্রেডিট মার্কেটের ওপর। বছর তিনেক আগে প্রজেক্টটা আরম্ভ হয়েছে। মনে হয় আরও দু-তিন বছর চলবে। আমরা ভারতীয় ইনফরমাল ক্রেডিট মার্কেট নিয়ে একটা সার্ভে কমপ্লিট করে ফেলেছি। তারপর ওই একই সেট অফ রিসার্চ কোয়েশ্চেনস মাথায় নিয়ে এখন বাংলাদেশ-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার ইনফরমাল ক্রেডিট মার্কেটগুলো খুঁটিয়ে দেখব।'

'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবি?' অমিতাভ বেশ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল। লেখাপড়ার ব্যাপারে অমিতাভর সর্বদাই একটা অকৃত্রিম উৎসাহ আদিত্য লক্ষ করেছে।

'বলছি।' সুপর্ণ একটু ভেবে নিয়ে আবার শুরু করল। 'আমাদের দেশে অসংখ্য ছোট-ছোট ব্যবসায়ী আছে, কল-কারখানার মালিক আছে, চাষি আছে যারা নানা কারণে ব্যাঙ্ক থেকে ধার পায় না। লোকাল মহাজন বা লেন্ডিং এজেন্সিরা এদের ধার দেয়। এই লেন্ডিং এজেন্সিগুলো যে ধারটা দিচ্ছে তাকে ইনফরমাল ক্রেডিট বলা হচ্ছে। ইনফরমাল, কারণ এইসব এজেন্সিগুলো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে নয়। এরা এদের ইচ্ছে মতো সুদ নেয়, সাধারণত বেশ বেশি হারে সুদ নেয়, আবার সুদ আদায়ের জন্য নানারকম আনস্ক্রুপুলাস মিনস নিতেও এদের বাধে না। বাংলা গল্প-উপন্যাস-সিনেমায় এইসব সুদখোর মহাজনদের ইনভেরিএবলি ভিলেন হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু উল্টোদিকে এটাও ঠিক যে, যতই কোয়ারসিভ হোক, এক্সপ্লয়টেটিভ হোক, যেহেতু বেসিক ব্যাঙ্কিং সার্ভিস এখনও আমাদের দেশের সব জায়গায়, বিশেষ করে রিমোট গ্রামগুলোতে, পৌঁছতে পারেনি, এই ইনফরমাল লেন্ডাররা সাধারণ মানুষদের লাইভলিহুড সাপোর্ট করার ব্যাপারে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এদের নিয়েই কাজ করছি।'

'তোরা কীভাবে রিসার্চ কোয়েশ্চেনগুলো ঠিক করিস? আগে থেকেই ভাবা থাকে?' অমিতাভ জিজ্ঞেস করল।

'কিছু প্রশ্ন ভাবা থাকে। কিছু কাজ করতে করতে মাথায় আসে। প্রথমে একটা পাইলট সার্ভে করা হয়। তার বেসিসে রিসার্চ কোয়েশ্চেনগুলো ফরমুলেট করে কোয়েশ্চেনেয়ার তৈরি করা হয়। তারপর মেন সার্ভে। এটাই সাধারণ প্রসিডিওর। তবে একটা প্রশ্ন প্রথম থেকেই মাথায় ছিল। বোঝার চেষ্টা করেছি, ভারতে বা অন্য দেশগুলোতে ইনফরমাল লেন্ডিং আর ফরমাল লেন্ডিং, মানে ব্যাঙ্ক ইত্যাদিরা যেসব ধারগুলো দিচ্ছে, এই দুই-এর প্রপোরশানটা রাফলি কত। এর থেকে ইনফরমাল লেন্ডিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝা যায়।'

'আচ্ছা, একটা জিনিস বল। এই ইনফরমাল লেন্ডাররা যে টাকাটা ধার দেয় সেটা কোথা থেকে আসে?' এবার আদিত্যর প্রশ্ন।

'নানা জায়গা থেকে আসতে পারে। পরিবারের টাকা পুরুষানুক্রমে খাটছে এরকম যেমন আছে, তেমনি ইনফরমাল লেন্ডার চড়া সুদে বাজার থেকে টাকা তুলে আরও চড়া সুদে ধার দিচ্ছে এরকম এক্সাম্পেলও আমি অনেক পেয়েছি। তবে বাজার থেকে টাকা তুলতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স লাগে, সেটা এদের কারোরই নেই।'

'এইভাবে লাইসেন্স ছাড়া যারা বাজার থেকে টাকা তোলে তাদের ওপর কিছুদিন ধরে সারাদেশ জুড়ে পুলিশ ক্র্যাক-ডাউন করছে, এটা তুই জানিস তো?' এবার গৌতমও সুপর্ণর গবেষণায় উৎসাহ পেয়েছে।

'জানি তো। ইন্ডিয়াতে এরকম কিছু হতে পারে আগেই খানিকটা খবর পেয়েছিলাম। আর সেইজন্য ইন্ডিয়ার সার্ভেটা আগে আগে করে ফেললাম। এখনকার মতো অবস্থা হলে সার্ভেটাই বন্ধ হয়ে যেত। বেশিরভাগ কম্পানিই তো এখন তালা মারা। আসলে, ভারত সরকারের কোনও দোষ নেই। ইদানীং সারাদেশ ভুয়ো কম্পানিতে ছেয়ে গিয়েছিল, যারা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষদের বুজরুকি দিয়ে কোটি

কোটি টাকা তুলছিল। টাকা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছে তাদের ছিল না, কেবল কম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে প্রথম দিকে কিছু লোককে কিছু কিছু সুদ দেওয়া হয়েছে যেটা নতুন আসা ডিপোজিট থেকেই দেওয়া হয়েছে। শুধু অশিক্ষিত মানুষ কেন, বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষও এদের ফাঁদে পা দিয়েছে।' সুপর্ণ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলল।

'পনজি স্কিম।' গৌতম বলল।

'ঠিক বলেছিস। পনজি স্কিম।' সুপর্ণকে উৎসাহিত শোনাল। 'চার্লস পনজি, বস্টনের কুখ্যাত ফ্রডস্টার, গত শতাব্দীর বিশের দশকে এই কায়দায় বহু ডিপোজিটারের টাকা আত্মসাৎ করেছিল। কায়দাটা খুব সহজ। প্রথমে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে স্কিমের খবরটা ছড়িয়ে দেওয়া হতো। বলা হতো, এখানে টাকা রাখলে বাজারের তুলনায় অনেক বেশি সুদ পাওয়া যাবে। ক্রেডিবিলিটি তৈরি করার জন্য প্রথম প্রথম কিছু ডিপজিটারকে সেই চড়া সুদ দেওয়াও হতো। সুদ দেওয়া হতো টাকাটা কোথাও খাটিয়ে নয়, নতুন যে ডিপজিট আসছে তার থেকে। আর ডিপোজিটের বাকি অংশটা, বলা যায় বেশির-ভাগটা, চার্লস পনজির পকেটে চলে যেত। যতদিন নতুন নতুন ডিপজিট আসছে ততদিন চলত এই জোচ্চুরির ব্যবসা। তারপর নতুন ডিপজিট আসা বন্ধ হয়ে গেলে, বুদ্বুদ ফেটে যেত, স্কিম উঠে যেত।'

'দুর্ভাগ্যবশত, প্রায় একশ বছর পরেও আমাদের দেশে এই কায়দায় লোক ঠকানো চলছে। সেন্ট্রাল গভরমেন্ট যে অ্যাডভাইসারিটা স্টেটগুলোকে পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ভুয়ো কম্পানিগুলো সারা দেশের পাবলিকের কাছ থেকে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, এবং এর ফলে প্রতারিত হয়েছে প্রায় সাত কোটি মানুষ। তাই সেন্ট্রাল গভরমেন্ট নির্দেশ দিয়েছে, যেসব কম্পানি লাইসেন্স ছাড়া পাবলিকের কাছ থেকে টাকা তুলছে তাদের মালিকদের অ্যারেস্ট করতে হবে আর সেই কম্পানিগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে।' গৌতম কথা বলতে বলতে একটু থামল। তারপর বলল, 'যত বেশি দিন ধরে একটা পনজি স্কিম চলবে তত বেশি লোক এর আওতায় আসবে। ফলে বাবল্ বার্স্ট করলে তত বেশি ক্ষতি। তাই সরকার আর দেরি করতে চায়নি।'

'তোর রিসার্চের মধ্যে কি পনজি কম্পানিগুলো আছে?' অমিতাভ সুপর্ণকে জিজ্ঞেস করল।

'না। আমাদের রিসার্চ, পনজি নয় এমন কম্পানি বা লেন্ডিং এজেন্সিগুলোকে নিয়ে। এটা ঠিক যে বাজার থেকে টাকা তোলার লাইসেন্স এদের নেই। কিন্তু এটাও ঠিক যে এরা লোক ঠকাবে বলে বাজারে আসেনি। এদের উদ্দেশ্য, ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া। এমন কম্পানি অনেক আছে যারা গত কুড়ি-তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে লাইসেন্স ছাড়াই টাকা তুলছে, সেই টাকা খাটাচ্ছে, ডিপজিটারদের নিয়মিত সুদ দিচ্ছে, টাকা ফেরত দিচ্ছে। এদের সুদের হার বেশি কারণ টাকা খাটানোর ব্যাপারে এরা বেশ ঝুঁকি নেয়। এরাই সেই ইনফরমাল লেন্ডার যাদের আমরা স্টাডি করছি। বললাম না, ইকনমিতে এদের একটা বড় ভূমিকা আছে। সমস্যা হল, সেন্ট্রাল গভরমেন্টের ডিরেক্টিভের ফলে এই কম্পানিগুলোকেও পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। ভাগ্যিস সার্ভেটা হয়ে গিয়েছিল। এতে কিন্তু সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে সেই মানুষগুলোর ক্ষতি হচ্ছে যাদের কাছে আধুনিক ব্যাঙ্কিং এখনও পৌঁছতে পারেনি। এই ইনফরমাল, কোট-আনকোট অনেস্টলেন্ডারদের ব্যাপারে সরকারের কী পলিসি হওয়া উচিত সেটা হোপফুলি আমাদের রিসার্চ থেকে উঠে আসবে।'

'তোরা এই সার্ভেগুলো কাদের দিয়ে করাস? কোনও এজেন্সিকে দিয়ে দিস নাকি নিজেরাই লোক দিয়ে করাস?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'দুরকমই হয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ফিল্ড ইনভেস্টিগেটাররাই সার্ভেটা করেছে। এরা গ্রাউন্ড লেভেল রিয়ালিটিটা খুব ভাল বোঝে। সেইভাবেই এদের সিলেক্ট করা হয়েছিল। ইন্ডিয়াকে চারটে জোনে ভাগ করে চারটে আলাদা টিম তৈরি হয়েছে। চারটে টিমের কাজ কোয়র্ডিনেট করার জন্য একজন আছে সে আমাকে রিপোর্ট করে। অবশ্য আমি নিজেও মাঝে মাঝে ফিল্ড-এ গেছি।'

'আচ্ছা, এই পশ্চিমবঙ্গে যারা সার্ভেটা করেছে তাদের কারও সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে পারি?' আদিত্য ব্যগ্রভাবে বলল।

'নিশ্চয় পারিস। আমিই ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু এসব ব্যাপারে তোর হঠাৎ এত উৎসাহ হল কেন?' সুপর্ণ রীতিমত অবাক হয়েছে।

'অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট নয়, পেট চালানোর জন্য যে কাজটা আমাকে করতে হয় সেটার জন্য এই ব্যাপারটা আমার একটু জানা দরকার।'

'কিচ্ছু বুঝলাম না।' সুপর্ণর মুখটা হতভম্ভ দেখাল।

'খুলে বললেই বুঝতে পারবি। খুলে বলছি। গৌতম খানিকটা জানে। আজ সকালেই ওর সঙ্গে এটা নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু তার আগে বল, কার সঙ্গে কথা বলব?'

'তুই ঠিক কী জানতে চাস?'

'আমি একটা বিশেষ কম্পানি সম্বন্ধে জানতে চাই। কম্পানিটার নাম কুমুদিনী বিত্ত নিগম। মালিকের নাম সত্যজিৎ সামন্ত। সম্প্রতি পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে।'

'আমি তোকে একজনের ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটির নাম সোমনাথ, সোমনাথ গুঁই। ও আমাদের একজন সুপারভাইজার, মানে ওর কাজ ইনভেস্টিগেটারদের সুপারভাইজ করা। পশ্চিমবঙ্গের ইনফরমাল লেণ্ডারদের সম্বন্ধে ওর থেকে ভাল আর কেউ জানে না। একটা বিশেষ কম্পানির ব্যাপারে স্পেসিফিক ইনফরমেশন ওই দিতে পারবে। অবশ্য এই কম্পানিটা যদি আমাদের স্যাম্পেলে না উঠে থাকে তাহলে সোমনাথ কিছু বলতে পারবে না। এই কম্পানিটা কত বড়?'

'পুলিশের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী এদের একশো কোটি টাকার বেশি বাজারে খাটছে।'

'ওরে ব্বাবা। তাহলে তো বেশ বড় কম্পানি। তার মানে আমাদের স্যাম্পেলে নিশ্চয় আছে। বড় কম্পানির সবকটাকে আমরা স্যাম্পেলে নিয়েছি।' সোমনাথ গুঁই-এর নম্বরটা খোঁজার জন্য সুপর্ণ পকেট থেকে তার মোবাইলটা বার করল।

দশটা নাগাদ খাওয়া শেষ করে আদিত্য বারান্দায় গিয়ে সবে সিগারেট ধরিয়েছে, এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠল। কেয়া ফোন করছে।

'তুমি আমার সঙ্গে ফিরবে? তুমি যদি আমার সঙ্গে না ফেরো তাহলে আমি এখনই এখান থেকে উঠব ভাবছিলাম। তুমি যদি আমার সঙ্গে ফেরো তাহলে আরও কিছুক্ষণ বসতে পারি।'

'ঠিক আছে। কটা নাগাদ ফিরতে চাও?'

'এগারোটায় উঠছি? খুব রাত্তির হয়ে যাবে?'

'আমার আবার কীসের রাত্তির? তবে তোমার পক্ষে একটু রাত্তির। বাগবাজারে তোমার হস্টেলে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা পৌনে বারোটা বেজে যাবে। ঠিক আছে। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে তোমাকেও গাড়িটা বাড়ি পৌঁছে দেবে। মহাত্মা গান্ধী রোডে গাড়ির গ্যারেজ। তোমার মেসের খুব কাছে।'

'ওক্কে। তুমি তাহলে বেরোনোর ঠিক আগে আমাকে একটা ফোন কোরো। আমি নিচে নেমে ওয়েট করব।'

আদিত্য টের পেল কেয়ার সঙ্গে আরও খানিকটা সময় কাটাতে পারবে ভেবে তার খুব ভাল লাগছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য আদিত্য মেট্রো ধরেছিল। যতীন দাস পার্কে নেমে বাঁ দিকে গেলেই আশুতোষ কলেজ, আর কলেজ পেরিয়ে দু-পা হাঁটলে একেবারে বড় রাস্তার ওপরেই ভবানীপুর পুলিশ স্টেশন। কলেজে পড়ার সময় সে এদিকে মাঝে মাঝে আসত। তার এক সহপাঠী, দীপঙ্কর সেন, তখন থাকত ভারতী সিনেমা হলের পেছন দিকে, রূপচাঁদ মুখার্জী লেনে। সে আর দীপঙ্কর বিএসসি পরীক্ষার আগে অনেকটা সময় একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। পড়াশোনা ছাড়াও দু-জনে এই ভবানীপুরের সিনেমা পাড়ায় সিনেমা দেখেছে অনেক। দীপঙ্করের পাল্লায় পড়ে আদিত্যর বাংলা সিনেমা দেখার শুরু, নাহলে সে বাংলা সিনেমার ভক্ত কোনও কালেও ছিল না। তারপর এমন একটা সময় এল যখন দেখা গেল দীপঙ্করের থেকে তারই বাংলা সিনেমা দেখায় উৎসাহ বেশি। সেই উৎসাহটা অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তবে এখনও তার কলেজ জীবনের দু-একটা বাংলা ছবি টেলিভিশনে দেখালে আদিত্য স্মৃতিমেদুর হয়ে দেখতে বসে যায়।

দীপঙ্করের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই। আমেরিকায় থাকে, দেশে প্রায় আসেই না। এলেও আদিত্যর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ওঠে না।

আদিত্য যখন কলেজ জীবনে এ পাড়ায় আসত তখন ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের বাইরেটা লাল রঙের ছিল। এখন সেটা নীল-সাদা হয়েছে। কিন্তু থানার গায়ে সেই অদ্ভুত লেখাটা এখনও রয়েছে। বিশ বছর আগে দীপঙ্করের বাড়ি যাওয়ার পথে আদিত্য রোজ দেখত ভবানীপুর থানার গায়ে মোটা-মোটা ইংরেজি অক্ষরে লেখা আছে 'পোলিস সেকশন হভস'। থানার সদর দরজার ওপরে এত বছর বাদেও লেখাটা জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেখানে আগে ছিল। কিন্তু কথাটার মানে কী? 'পোলিস সেকশন'-এর মানে না হয় করা গেল পুলিশের একটা অংশ। কিন্তু হভস? এর মানে কি হাউস? মানে পুলিশ কোয়ার্টার? থানার ওপরে অবশ্য পুলিশদের বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। ওপরের বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ খেয়েছে শুকোতে দেওয়া শাড়ি। ওখানেই হয়ত বড়বাবু থাকেন।

বড়বাবুর কথায় আদিত্যর মনে পড়ে গেল আসার সময় বড়বাবুকে ফোনে পাওয়া যায়নি। ফোনটা সুইচড অফ ছিল। কাল রাত্তিরে অবশ্য গৌতম বড়বাবুকে ফোন করে দিয়েছিল। অর্থাৎ আদিত্য যে আজ সকালে থানায় আসবে সেটা বড়বাবু জানেন, কিন্তু কখন আসবে সেটা জানেন না। মানে, আদিত্য ফোন করে জানাতে পারেনি।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আদিত্য খেয়াল করেনি কখন থানার ভেতরে ঢুকে গেছে।

'বলুন কী ব্যাপার?' ঢুকেই সামনের টেবিলে একজন প্লেন ড্রেসের পুলিশ বসে আছে। সে বেশ ভদ্রভাবেই কথাটা জিজ্ঞেস করল। আদিত্য আন্দাজ করল এ কোনও এ এস আই হবে।

'বড়বাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।' আদিত্য খানিকটা ইতস্তত করে বলল।

'বড়বাবুর সঙ্গে কী দরকার?' এ এস আই-এর গলাটা এবার সন্দিগ্ধ শোনাল।

'দরকারটা, মানে একটু ব্যক্তিগত। কাল রাত্তিরে অ্যাডিশানাল কমিশনার গৌতম দাশগুপ্ত বড়বাবুকে আমার নাম করে ফোন করে দিয়েছেন। আমি আসব বড়বাবু জানেন।' আদিত্য যথাসম্ভব বিনীতভাবে বলল।

'ঠিক আছে, আপনি বসুন। বড়বাবু কাজে বাইরে গেছেন। মনে হয়, ফিরতে দেরি হবে। আপনি ওই বেঞ্চিটায় বসুন।' গৌতম দাশগুপ্ত-র নাম শুনে এ এস আই-এর গলাটা একটু নরম শোনাল।

'আমি তাহলে একটু চা খেয়ে আসি?'

'আসুন। বড়বাবু আধঘন্টার আগে ফিরবেন বলে মনে হয় না। আচ্ছা, আপনার নামটা বলে যান। ইতিমধ্যে বড়বাবু ফিরে এলে বলে রাখব।'

আদিত্য নিজের নামটা একটা চিরকুটে লিখে এ এস আই-এর টেবিলে রাখল। 'যদি বড়বাবু চলে আসেন বলবেন আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।'

'আপনি ধীরে-সুস্থে চা খেয়ে আসুন। বললাম তো, বড়বাবু আধঘন্টার আগে ফিরবেন না'। এ এস আই একটা মোটা খাতা খুলে কীসব লিখতে শুরু করল।

আদিত্যর খিদে পেয়েছে। সকালে তাড়াহুড়ো করে বেরতে গিয়ে কিছু খাওয়া হয়নি। সে থানা থেকে বেরিয়ে পূর্ণ সিনেমা অব্দি হেঁটে গেল। জায়গাটা ভীষণ বদলে গেছে। পূর্ণ, ভারতী দুটো সিনেমা হলই বন্ধ। বিজলি আর উল্টো ফুটপাথের ইন্দিরা সিনেমা কোনও রকমে চলছে। বনফুল রেস্টোরেন্টটা সবে খুলেছে। ওখানে চা পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে কিছু খাওয়া দরকার। বনফুল-এ টোস্ট-অমলেট পাওয়া যেতে পারে। অন্য বিকল্প, রাস্তা পেরিয়ে ওপারে শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে কচুরি-জিলিপি খাওয়া। বহুদিনের দোকান। আশ্চর্য ব্যাপার, এই বদলে যাওয়া ভবানীপুরে এখনও এই মিষ্টির দোকানটা টিকে রয়েছে। খানিকটা স্মৃতিতাড়িত হয়ে আদিত্য রাস্তা পার হল। শ্রীহরি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপরে সেই পুরোনো চায়ের দোকানটাও আছে। কচুরি-জিলিপি খাবার পর ওখানেই চা-টা খেয়ে নেওয়া যাবে।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে একটা খবর কাগজ কিনে আদিত্য আবার থানায় ঢুকে দেখল এ এস আই ছেলেটি একাই তার টেবিলে বসে আছে। 'বড়বাবু এখনও আসেননি।' সে অল্প হেসে বলল। তার হাসিটা খানিক বিষণ্ণ ধরনের।

আদিত্য তার পূর্বনির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে খবর কাগজটা মিনিট দুয়েক পড়েছে, দু-জন মহিলা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে থানার ভেতরে ঢুকলেন। দেখে মনে হয় মা আর মেয়ে। আদিত্য খবর কাগজে মুখ ঢেকে এ এস আই-এর সঙ্গে তাদের কথোপকথন শুনছিল।

'বলুন।' এ এস আই-এর গলা।

'আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে। সবাই বলল থানায় ডায়েরি করতে হবে।' আদিত্য খবর কাগজের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল মা চুপ করে আছে, মেয়ে কথা বলছে।

'ডায়েরি নয়, ডুপ্লিকেটে একটা দরখাস্ত দিন। দরখাস্তর ডুপ্লিকেট কপিটা রিসিভ করিয়ে নিয়ে যান। নতুন সিমের জন্য লাগবে। দরখাস্তে আপনি যেন অফিসার ইন চার্জকে জানাচ্ছেন যে এই অঞ্চলে কোথাও আপনার মোবাইলটা হারিয়ে গেছে। চুরি গেছে লিখবেন না। দরখাস্ততে মোবাইলের নম্বর আর হারিয়ে যাওয়ার তারিখটা দেবেন। আর আপনার ঠিকানাটা। আপনি এই অঞ্চলে থাকেন তো?'

'আমরা বেলতলা রোডে থাকি। কিন্তু চুরি গেছে লিখব না কেন? মোবাইলটা তো যতীন দাস পার্ক স্টেশনে চুরিই হয়েছে। আমি জানি ওখানেই চুরি হয়েছে।'

'ম্যাডাম, আপনি যদি লেখেন চুরি হয়েছে তাহলে আমাদের ফর্মালি ডায়েরি নিতে হবে, তদন্ত করতে হবে। আমাদের অত ম্যান-পাওয়ার নেই। তাই বলছি, আপাতত হারিয়ে গেছে বলে আমাদের ইনফরমেশন দিন। তাতে আপনার এখনকার মতো কাজ চলে যাবে। আর মোবাইলটা যদি উদ্ধার করতে চান তাহলে বাড়ি গিয়ে দেখুন মোবাইলের বাক্সটা আছে কিনা। থাকলে দেখবেন ওটার গায়ে মোবাইল সেটটার একটা নম্বর লেখা আছে। এটা কিন্তু ফোন নম্বর নয়, মোবাইল সেটটার নম্বর। নম্বরটা আমাদের দিলে আমরা হয়ত সেটটা উদ্ধার করে দিতে পারব। মানে সেটটা যদি পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে কেউ ইউজ করে তাহলে ওটাকে আমরা ট্রেস করতে পারব। রাজ্যের বাইরে পাচার হয়ে গেলে কিছু করতে পারব না। ঠিক আছে?'

আদিত্য মনে মনে এ এস আই-এর ঠাণ্ডা মেজাজের প্রশংসা না করে পারল না।

ইতিমধ্যে আর একজন থানায় ঢুকেছে। আদিত্য খবর কাগজের আড়াল থেকে উঁকি মারল। নাঃ, বড়বাবু নয়। সাদা প্যান্ট কালো কোট পরা এক ছোকরা উকিল।

'এই যে কোকিল সাহেব, খবর কী?' এ এস আই উকিলকে লক্ষ করে বলল।

'আমাদের আর কী খবর হবে? খবর তো সব তোমাদের। বড়বাবু এসেছে? কাল তো বিহারি ডাক্তার রোডের ওই ডাকাতির কেসটা কোর্টে ওঠার কথা। তার আগে একবার বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল।' উকিলবাবু বললেন।

'বড়বাবু নয়, মেজোবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেসটা এখন মেজোবাবুই দেখছে। বড়বাবু তোমাকে বলতে বলেছে। তুমি ভেতরে গিয়ে মেজোবাবুর সঙ্গে কথা বল।'

'আগে একবার বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলে নিলে ভাল হতো। বড়বাবু ভেতরে আছে তো?'

'কোথায় আছে? সেই সকালবেলা একটা ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়ে এখনও ফেরেনি। যাওয়ার সময় মেজবাবুকে কেসটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তুমি মেজোবাবুর সঙ্গে কথা বল। নাকি তোমার বড়বাবুর সঙ্গে কথা না বললে মন উঠবে না? আপনাদের দরখাস্ত লেখা হল?' শেষের বাক্যটা অবশ্য মোবাইল-হারা মা-মেয়ের উদ্দেশে।

উকিলবাবু ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। এ এস আই বলল, 'একটা সিগারেটও দিয়ে যাবে না?'

'সে কী? তোমরা থানার ভেতরে সিগারেট খাও?' উকিলবাবু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলল।

'থানার ভেতরে খাই না। বড়বাবু সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে খুব কড়াকড়ি করছে। থানার ভেতরে সিগারেট খাওয়া একেবারে বন্ধ। বাইরে যখন চা খেতে যাব তখন খাব।'

সিগারেটের কথা শুনে আদিত্যর ধূমপানের ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে এ এস আই-কে বলল, 'আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।'

বাইরে বেশ রোদ্দুর। আদিত্য ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। একটা চা-ওলা দেখতে পেলে একটু চা খাওয়া যেত। আশুতোষ কলেজ অব্দি হাঁটতে পারলে হয়ত চা-ওলার দেখা মিলবে, কিন্তু এই রোদ্দুরে ওইটুকুও হাঁটতে ইচ্ছে করে না। আদিত্য দেখল ঘড়িতে এগারোটা। আপিসযাত্রীরা এখনও রাস্তায়। বাসে, মিনিবাসে ভিড়। বিজলি সিনেমায় দু-একজন টিকিট কাটতে ঢুকছে। দেখে আদিত্যর ভালই লাগল। কোনও পুরোনো জিনিসকে টিকে থাকতে দেখলে আদিত্যর ভাল লাগে। লাইটহাউস সিনেমায় হালে গজিয়ে-ওঠা জামাকাপড়ের দোকানটা আদিত্যর চোখকে রীতিমত পীড়া দেয়। কলকাতার সুন্দর জিনিসগুলো কি আর কিছুই থাকবে না?

হঠাৎ আদিত্য ডান চোখের কোনা দিয়ে দেখল কালো লম্বা-চওড়া চেহারার এক ভদ্রলোক একটা গাড়ি থেকে নেমে থানায় ঢুকে গেলেন। এক ঝলক দেখে ভদ্রলোককে চেনা-চেনা লাগল আর তার পর মুহূর্তেই আদিত্য উপলব্ধি করল ইনিই সেই বটুক সামন্ত যার সঙ্গে কথা বলার জন্য সারা সকাল সে হাপিত্যেস করে বসে আছে। চট করে সে তার আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে, নিভিয়ে, অর্ধেক জোরে হেঁটে অর্ধেক দৌড়ে গিয়ে ভদ্রলোকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থানার ভেতরে ঢুকল। ঢুকে শুনতে পেল সেই এ এস আই ছেলেটি বলছে, 'আজ একটু বসতে হবে বটুকবাবু। বড়বাবু বাইরে গেছেন। অনেকক্ষণ গেছেন। এবার এসে পড়বেন।'

'আপনার কাছে হাজিরাটা দিয়ে গেলে হবে না?' বটুকবাবুর গলাটা গমগমে, সাহেবরা যাকে বলে ডিপ ব্যারিটোন।

'না। ওটা বড়বাবুকেই দিতে হবে। একটু বসুন না।'

বটুকবাবু বেঞ্চির ওপর বসলেন। আদিত্য একটু দূরত্ব রেখে তার পাশে বসল। বসে খবর কাগজটা খুলে পড়তে লাগল। আদিত্যর ভাগ্য ভাল একটু পরেই এ এস আই ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীর পায়ে দরজা দিয়ে থানার বাইরে বেরল। বোধহয় উকিলবাবুর কাছ থেকে পাওয়া সিগারেটটার সদ্ব্যবহার করার জন্যে।

আদিত্য বটুকবাবুর দিকে আর একটু সরে এসে চাপা গলায় বলল, 'আপনি কি সত্যজিৎ সামন্ত?'

বটুকবাবু গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন। সম্ভবত আদিত্য যে পাশে বসে আছে সেটাই তিনি খেয়াল করেননি। আদিত্যর কথায় চোখ তুলে তাকালেন। 'হ্যাঁ আমিই সত্যজিৎ সামন্ত। আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?' বটুকবাবু গমগমে গলায় বললেন।

'আমাকে আপনি চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব বলে সেই সকাল থেকে এখানে বসে আছি।'

'আমার সঙ্গে কথা বলবেন বলে সকাল থেকে বসে আছেন? শুনুন, আপনি যদি মিডিয়ার লোক হন তাহলে কেটে পড়ুন। মিডিয়াকে আমার কিচ্ছু বলার নেই।' বটুকবাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বললেন। 'পুলিশই বা কেমন? কোর্ট থেকে তো অর্ডার দিয়ে দিয়েছে, মিডিয়াকে আমার কথা কিছু জানানো হবে না। তবু আপনারা জেনে গেছেন? পুলিশকে কত টাকা খাইয়েছেন?' বটুকবাবুর গলাটা তিক্ত শোনাল।

'বটুকবাবু, আমি মিডিয়ার লোক নই। আমাকে জাহাঙ্গির খান আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছে।' আদিত্য মৃদুভাবে বলল।

'জাহাঙ্গির খান?' বটুকবাবুর কপালে তিন থাক ভাঁজ পড়েছে।

'আজ্ঞে, জাহাঙ্গির খান। হালিশহরের জাহাঙ্গির খান। তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পাঠিয়েছেন।'

'কী বলছে জাহাঙ্গির খান?'

আদিত্য উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেল এ এস আই দরজা দিয়ে ঢুকছে। সে গলাটা খুব নামিয়ে বলল, 'এখানে বলা যাবে না। আপনার বাড়িতে দেখা করা যাবে?'

এ এস আই ছেলেটি ইতিমধ্যে আদিত্যদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বটুকবাবুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এই মাত্র বড়বাবু ফোন করেছিলেন। একটা জরুরি তদন্তের কাজে আটকে গেছেন। কখন থানায় ফিরবেন উনি নিজেও জানেন না। ঘণ্টা দুয়েকও লাগতে পারে আবার ফিরতে ফিরতে বিকেলও হয়ে যেতে পারে। আমাকে বললেন আপনাকে দিয়ে হাজিরা খাতায় সই করিয়ে নিতে। মানে, এটা শুধু আজকের জন্যে। আপনি আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন।' তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলেন তো আজ বড়বাবুর ফেরার কোনও ঠিক নেই। আপনি বরং আরেক দিন আসুন।'

বটুকবাবুকে নিয়ে এ এস আই ছেলেটি ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর আদিত্য উঠে পড়ল। উঠে এ এস আই-এর টেবিলের সামনে এসে দেখল তার নাম লেখা চিরকুটটা একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখা রয়েছে। সে চিরকুটটা পকেটস্থ করল। ওটার আর প্রয়োজন নেই। বটুক সামন্তর সঙ্গে দেখা তো হয়েই গেল। তবে কথা এখনও শেষ হয়নি। আদিত্য ধীর পায়ে থানার বাইরে এসে ছায়ায় দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরাল। এখন কিছুক্ষণ বটুকবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বটুকবাবুর গাড়িটা থানার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। হন্ডা অ্যাকর্ড, ওপর দিকের মডেল।

মিনিট পাঁচেক পরে বটুকবাবু থানা থেকে বেরলেন। তিনি গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় আদিত্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'ও আপনি! জাহাঙ্গিরের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, ফোনটা পুলিশ ট্যাপ করে রেখেছে। আপনার সঙ্গেই কথা বলে নেব। আপনি জাহাঙ্গিরকে জানিয়ে দেবেন। জাহাঙ্গির কোনও চিঠি-টিঠি দিয়েছে?'

আদিত্য বটুকবাবুকে লেখা জাহাঙ্গির খানের চিঠিটা টি-শার্টের পকেট থেকে বার করে বটুকবাবুর হাতে দিল। খাম ছিঁড়ে তাতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি সেটাকে পকেটে পুরলেন। তারপর বললেন, '২৩৪ প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে আমি থাকি। নীল রঙের দোতলা বাড়ি। আজ বিকেল পাঁচটায় আসবেন।'

গৌতম একটা মেসেজ করেছে। তাতে লেখা, সুদর্শন শিকদার, তারপর একটা দশ ডিজিটের সংখ্যা। সংখ্যাটা, বোঝাই যাচ্ছে, একটা মোবাইল নম্বর। সন্দেহ নেই, সুদর্শন শিকদার নামক ভদ্রলোকের নম্বর। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আদিত্য মনে করতেই পারছিল না সুদর্শন শিকদার লোকটা কে? তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সুদর্শন শিকদার বটুক সামন্তর কেসটা ইনভেস্টিগেট করছে। গৌতম বলেছিল তার নম্বরটা পাঠাবে। আদিত্য নিজেকে ধিক্কার দিল, এই স্মৃতিশক্তি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করলে তার কপালে দুঃখ আছে।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। আদিত্য বনফুল রেস্টোরেন্টে ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে মোবাইলে শিকদারের নম্বরটা লাগাল।

'হ্যালো' বলে ওপার থেকে যে শব্দটা এল সেটা আসলে একটা প্রশ্ন। অর্থাৎ ওপার থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে 'আপনি কে?'।

'আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমার কথা সম্ভবত অ্যাডিশানাল কমিশানার গৌতম দাশগুপ্ত আপনাকে বলেছেন। আপনার সঙ্গে ওই বটুক সামন্তর কেসটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।' আদিত্য বিনীতভাবে বলল।

'বুঝতে পেরেছি। স্যার আপনাকে হেল্প করতে বলেছেন। অবশ্য বলার দরকার ছিল না। আপনার কথা লালবাজারে সবাই জানে। আপনি বলুন কখন আসবেন।'

'কখন এলে আপনার সুবিধে হবে আপনিই বলুন।'

ওপারে কিছুক্ষণ নীরবতা। মনে হল, শিকদার ভাবছে। আধ মিনিট ভেবে নিয়ে সে বলল, 'আপনি এখন কোথায় আছেন?'

'ভবানীপুরে।'

'আপনি আধঘন্টার মধ্যে লালবাজারে চলে আসতে পারবেন? তিনতলায় ইকনমিক অফেন্স-এর নতুন ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, আমি সেখানে বসি।'

'আমি চলে আসছি। তবে আধঘন্টার জায়গায় হয়ত চল্লিশ মিনিট হয়ে যেতে পারে।'

'অসুবিধে নেই। তবে আমাকে একটা নাগাদ একটু বেরতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমি চলে আসছি।'

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। তাড়াহুড়ো করে জিভ পোড়ানোর কোনও মানে হয় না। আদিত্য চায়ে একটা চুমুক দিয়ে ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরাল। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করতে হবে। বটুকবাবুকে এক ঝলক দেখে ঠিক বোঝা গেল না লোকটা কেমন। কুমুদিনীর ব্যবসাটা সম্বন্ধেও আর একটু জানা দরকার। ফোন বাজছে। সাড়া দিতে একটি মেয়ে জানতে চাইল আদিত্য রান্নাঘরের চিমনি কিনতে উৎসাহী কিনা। তাকে নিরস্ত করে, চা ও সিগারেটের সদ্ব্যবহার করে, চায়ের দাম মিটিয়ে আদিত্য যখন রেস্টোরেন্ট থেকে বেরল তখন প্রায় পৌনে বারোটা।

'আমার একটু দেরি হয়ে গেল। মেট্রো পাচ্ছিলাম না।'

'কোনও অসুবিধে নেই। একটার সময় আমাকে বেরতে হচ্ছে না। ভাবছিলাম আপনাকে ফোন করে বলব ধীরেসুস্থে আসুন, তা কিছুতেই কানেকশান পেলাম না।'

'আমি বোধহয় তখন মেট্রোতে ছিলাম।'

'তাই হবে। এবার বলুন কী জানতে চান।'

সুদর্শন শিকদারের বয়েস যতটা কম হবে আদিত্য ভেবেছিল, ততটা কম নয়। ঈষৎ স্থূলকায়, রগের চুলে পাক ধরেছে। আত্মবিশ্বাসী।

আদিত্য বলল, 'সম্প্রতি কুমুদিনী বিত্ত নিগমের যে কেসটা আপনি দেখছেন সেটার সম্বন্ধে একটু জানতে চাইছিলাম। কেন জানতে চাইছি বা ঠিক কী জানতে চাইছি সেটা পরিষ্কার করে বললে মনে হয় আপনার বুঝতে সুবিধে হবে।'

শিকদার উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে রইল। আদিত্য বলতে লাগল, 'আপনি তো জানেন আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। আমার একজন ক্লায়েন্ট, নাম জাহাঙ্গির খান, ব্যবসায়ী, হালিশহরে বিড়ির বড় ফ্যাক্টরি আছে, কুমুদিনীতে বেশ কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছিল। কুড়ি কোটির মতো। টাকাটা সম্ভবত বটুকবাবুর কাছে পৌঁছোয়নি। অন্তত জাহাঙ্গির খানের তাই ধারণা। বটুকবাবুর সঙ্গে অবশ্য আমার ক্লায়েন্টের সরাসরি কথা হয়নি। একটা সম্ভাবনা, টাকাটা যার হাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, যে কুমুদিনীর একজন বড় এজেন্ট, সে মেরে দিয়েছে।'

'এই এজেন্টের নাম কী?' আদিত্যকে থামিয়ে শিকদার প্রশ্ন করল।

'ফিরদৌস রহমান। সে আবার আমার ক্লায়েন্টের আত্মীয় হয়। তাই আমার ক্লায়েন্ট বিশ্বাস করে তার হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়েছিল।'

'ফিরদৌস রহমান নামটা আমাদের পরিচিত। কুমুদিনীর তিনজন এজেন্ট, এদের সকলেরই কাজ কুমুদিনীর জন্য টাকা তোলা। গোবিন্দ রায়, ইনি কুমুদিনীর সব থেকে পুরোনো এজেন্ট। ফিরদৌস রহমানের কথা আপনি জানেন। আর শিবেন মাইতি, ইনিও পুরোনো। গোবিন্দ আর শিবেন প্রায় গোড়া থেকেই কুমুদিনীর সঙ্গে আছে। ফিরদৌস অনেক পরে এসেছে, তার বয়েসও অন্য দু-জনের তুলনায় কম।'

'এদের কোনও সাব-এজেন্ট নেই?'

'না। এরাই শুধু কুমুদিনীর জন্য টাকা তোলে। আর কেউ নয়। আসলে কুমুদিনীর বিজনেস মডেলটা বেশ আলাদা। এরা আমজনতার কাছ থেকে টাকা তোলে না। টাকা তোলে দু-চারজন বড়লোক পার্টির কাছ থেকে। অল্প টাকা নয়, অনেক টাকা। যে টাকাটা এরা তোলে তার বেশিরভাগটাই কালো টাকা, মানে তার ওপর ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া নেই।'

'টাকাটা নিয়ে এরা কী করে?'

'বলছি। প্রথমে এরা এক-একটা প্রস্পেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট আইডেন্টিফাই করে। সাধারণত এদের চেনা কারও প্রজেক্ট। কখনও কখনও নতুন কারও প্রজেক্টও হতে পারে। কেউ হয়ত নতুন কোনও সিনেমায় টাকা ঢালতে চাইছে, কেউ নতুন একটা বার বা নাইট ক্লাব খুলতে চাইছে, কেউ হয়ত একেবারে আনকোরা নতুন ধরনের কোনও ব্যবসা শুরু করতে চাইছে। এই প্রজেক্টগুলো কোনওটাই বেআইনি নয়। তবে প্রত্যেকটাতে ঝুঁকি প্রচুর। প্রজেক্ট আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেলে কুমুদিনীর এজেন্টরা ফাইন্যান্সার খুঁজতে শুরু করে। এই ফাইন্যান্সাররা সকলেই কুমুদিনীর চেনা। তাদের কাছেই এজেন্টরা অ্যাপ্রোচ করে। প্রজেক্ট পছন্দ হলে ফাইন্যান্সার প্রজেক্টে টাকা ঢালে, যে টাকাটা, আগেই বলেছি, সাধারণত কালো টাকা হয়। প্রজেক্টে ধার দিয়ে যে সুদটা পাওয়া যায় সেটা সাধারণত কুমুদিনী এবং ফাইন্যান্সারের মধ্যে ফিফটি-ফিফটি ভাগ হয়। আর প্রজেক্ট ফেল করলে ফাইন্যান্সার তার প্রিন্সিপালের ফিফটি পার্সেন্ট ফেরত পেয়ে যায়। এটা একটা ইনশিয়োরেন্স। টাকাটা কুমুদিনীর পকেট থেকে যায়। তবে কুমুদিনীর সিলেক্ট করা প্রজেক্টগুলো খুব রেয়ারলি ফেল করে। এসব আমরা বটুক সামন্তকে জেরা করে জানতে পেরেছি।'

'এক সঙ্গে কটা প্রজেক্টে কুমুদিনী ধার দেয়?'

'খুব বেশি নয়। বড় বড় প্রজেক্ট তো। আমাদের ধারণা সাইমাল্টেনিয়াসলি চার পাঁচটার বেশি প্রজেক্টে কুমুদিনী ধার দেয় না। বটুকবাবু সরাসরি কিছু বলেননি, তবে ওর সঙ্গে কথা বলে আমাদের এইরকম মনে হয়েছে।'

'এই মুহূর্তে কুমুদিনী কাকে কাকে ধার দিয়েছে? ফাইন্যান্সিয়াররাই বা কারা? এসব জানতে পেরেছেন?'

'এই আসল ইনফর্মেশনগুলোই তো জানতে পারছি না। বটুকবাবু বলছেন এসব তিনি কিছু জানেন না। এটা পরিষ্কার যে তিনি তার ক্লায়েন্টদের প্রোটেক্ট করছেন। যারা টাকা ধার নিয়েছে তারা তো আগ বাড়িয়ে এসে বলবে না যে তারা এত টাকা ধার নিয়েছে। আর যারা ধার দিয়েছে তারাও কিছু বলছে না কারণ সম্ভবত যে টাকাটা তারা ধার দিয়েছে সেটা ইনকাম ট্যাক্সের খাতায় দেখানো নেই।'

'একজন ফাইন্যান্সারের নাম তো আমরা জানতে পারছি। জাহাঙ্গির খান। সে নিজেই আমাকে বলেছে অতীতে বেশ কয়েকবার সে কুমুদিনীকে টাকা দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেটা অবশ্য জানা গেল। কিন্তু শেষ যে কুড়ি কোটি সে দিয়েছে বলছে, সেটা কোথায় গেল জানা যাচ্ছে না।'

'জাহাঙ্গির খান বলছে টাকাটা রোহিত ধামানি বলে একজন ফিল্ম প্রোডিউসারকে দেওয়ার জন্য বটুকবাবু চেয়েছিলেন। রোহিত ধামানি নাকি নতুন কী ছবি করছে তার জন্য টাকাটা দরকার।'

'রোহিত ধামানির নামটা আমরাও কানাঘুষোয় শুনেছি। আপনার কাছ থেকে কনফার্মড হলাম।'

'আচ্ছা, বটুকবাবুর এজেন্টেদের কাছ থেকে কিছু বার করা যায়নি?'

'ও হো। আপনাকে তো বলতেই ভুলে গেছি। বটুকবাবু অ্যারেস্ট হওয়ার পর থেকে তিনজন এজেন্টই গা ঢাকা দিয়েছে। আমরা এখনও তাদের হদিশ করতে পারিনি।'

'হুঁ, বুঝলাম। তা কুমুদিনীর আপিসের কেউ কিছু বলতে পারল না?'

'এখন অব্দি কাউকে দিয়েই কিছু বলাতে পারিনি। চারজন অ্যারেস্টেড আছে, কিন্তু মুখ খুলছে না। আসলে এসব কেসে থার্ড ডিগ্রি করলে লাভ হয়। কিন্তু ইকনমিক ক্রাইমে থার্ড ডিগ্রি করার অসুবিধে আছে।'

'আচ্ছা, বটুকবাবুর একজন সেক্রেটারি ছিল না? সে এখন কোথায়?'

'সে তো ওই চারজন অ্যারেস্ট-হওয়াদের একজন। আপাতত আমাদের জিম্মাতেই আছে। কিন্তু কিছু বলছে না। মুখ টিপে আছে।'

'সাধারণত বরোয়ার-লেণ্ডারদের নামের লিস্ট, কত টাকা তারা নিয়েছে বা দিয়েছে, কত টাকা বাকি আছে এইসব তথ্য কোনও কম্পিউটারে থাকে। আজকাল ইনটারেস্ট ক্যালকুলেট করার জন্যে অনেক সফটওয়ারও হয়েছে। তা, কুমুদিনীর অফিস থেকে সেরকম কোনও কম্পিউটার পাওয়া যায়নি?'

শিকদার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'অফিসে দশ-বারোটা ডেস্কটপ কম্পিউটার ছিল। কোনওটাতেই কাজের কিছু পাওয়া যায়নি। একটাতে স্টাফদের মাইনে, ছুটির হিসেব এইসব আছে। অন্য একটাতে চিঠিপত্র লেখা হয়, পুরোনো চিঠিগুলো সেভড আছে। ওপর ওপর কুমুদিনীর যেটা ব্যবসা, স্টক ব্রোকিং, সেই সংক্রান্ত সব চিঠি। আর বাকি কম্পিউটারগুলোয় স্টক কেনাবেচা হয়। কোনওটাই আমাদের জন্য দরকারি নয়।'

'ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এসব কিছু ছিল না?'

শিকদার আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল, 'খুঁজেছিলাম। আর কিছু পাইনি। আরো খুঁজে দেখতে হবে। অফিসটা তো সিল করাই আছে।'

আদিত্যর মনে হচ্ছিল শিকদার মিথ্যে কথা বলছে। কুমুদিনীর অফিস থেকে সে কিছু একটা পেয়েছে, কিন্তু বলছে না কী পেয়েছে। আদিত্য অন্য প্রসঙ্গে গেল।

'যে চারজন স্টাফকে আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন ওরা ছাড়া কুমুদিনীর আর কতজন স্টাফ আছে?'

'ওই চারজন ছাড়া আর যে কয়েকজন আছে তারা কেউ অ্যাসিস্টেন্ট কেউ সাব-স্টাফ মানে, কেউ কম্পিউটারে শেয়ার কেনাবেচা করে, চিঠিপত্র লেখে, হিসেবপত্র দ্যাখে, আবার কেউ কেউ বেয়ারা, ঝাড়ুদার, রেকর্ড সাপ্লায়ার। একজন ক্যান্টিনে চা বানায়। এদের সকলকেই আমরা ছেড়ে দিয়েছি। সত্যজিৎ সামন্ত ছাড়া তিনজন অফিসার আর সত্যজিৎ সামন্তর সেক্রেটারি এই চারজনকে আমরা কাস্টডিতে নিয়ে রেখেছি।'

'আর ওই তিনজন এজেন্ট? যাদের কথা বললেন?'

'আমরা যখন কুমুদিনী রেড করছিলাম, তারা কেউই অফিসে ছিল না। তাদের কথা পরে বটুকবাবুর কাছ থেকে জেনেছি। বটুকবাবু তাদের ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কাউকেই তাদের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি।'

'এরা জানল কী করে কুমুদিনী রেড হচ্ছে?'

'বোধহয় ওই অ্যাসিস্টেন্ট বা সাব-স্টাফেদের কেউ ওদের জানিয়ে দিয়েছিল। এটা আমরা পরে আন্দাজ করেছি। রেড করার সময় তো এজেন্টদের অস্তিত্বই জানা ছিল না।'

'আচ্ছা, ওই যাদের ছেড়ে দিয়েছেন তাদের ঠিকানাগুলো আছে তো? মানে দরকার হলে তাদের কন্ট্যাক্ট করা যাবে তো?'

'ঠিকানাগুলো আছে। তবে সেগুলো ঠিক না ভুল চেক করা হয়নি। আসলে কুমুদিনীর মতো আরও অনেকগুলো কম্পানি রেড করা হল, আরও কয়েকটা হবে, তাই ম্যানপাওয়ারের একটু শর্টেজ রয়েছে।'

আরও দু-একটা প্রশ্ন করে আদিত্য উঠে পড়ল। শিকদার তাকে যা তথ্য দিয়েছে তার তুলনায় সে-ই বোধহয় শিকদারকে খবর দিয়েছে বেশি। জাহাঙ্গির এবং রোহিত ধামানির খবর শিকদার মনে হয় কিছুটা জানত। তবু আদিত্যর কাছ থেকে যাচাই করে নিতে পেরে ওর বেশ সুবিধে হল। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। নিজের সংগ্রহ করা খবরগুলো চট করে কাউকে জানাতে চায় না। আদিত্য নিশ্চিত শিকদার আরও অনেক কিছু জানে।

৩

লাঞ্চ খেতে আদিত্যর একটু দেরি হয়ে গেল। লালবাজার থেকে তার আপিস খুব দূরে নয়, হেঁটে মিনিট ছ-সাত। সুদর্শন শিকদারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে সে দুটোর আগেই তার আপিসে পৌঁছে গিয়েছিল। এসে দেখে শ্যামল গেটে নেই। রোজ শ্যামল তার লাঞ্চ এনে দেয়, আজ তাহলে কে লাঞ্চ আনবে? সে শ্যামলের মোবাইলে একটা ফোন করল।

'একটু কাজে বাগরি মার্কেট এসেছি স্যার। আধঘন্টার মধ্যে ফিরে আসছি।' শ্যামল জানাল। 'আমি ভাবলাম আপনি আজ আর আসবেন না।'

'তুমি আসার সময় আমার জন্য খাবারটা নিয়ে এস। ওই একই খাবার। একটা প্লেন ধোসা আর একটা শসা।'

'এখন বোধহয় ধোসা আর পাওয়া যাবে না। অন্য কিছু আনব?'

'তাহলে টোস্ট আর ঘুগনি এনো। আর শসা।'

'একটা মামলেট ভাজিয়ে আনব?'

'ঠিক আছে নিয়ে এস। তবে তাড়াতাড়ি এস। তোমার সঙ্গে টাকা আছে তো?'

'যেটুকু আছে তাতে টোস্ট-ঘুগনি-মামলেট হয়ে যাবে স্যার।'

আদিত্য ফোনটা অফ করে কেটলিতে জল গরম করতে দিল। খাবার আসতে দেরি হবে। ততক্ষণে একটা কফি খাওয়া যেতে পারে। একটু গানও শোনা যেতে পারে। সকালে সে ল্যাপটপটা আপিসে রেখে গিয়েছিল। সেটা অন করে আলি আকবরের মধুমত সারং লাগাল। আদিত্যর মনে পড়ে গেল বাবা তাকে বলেছিল আলি আকবররা দুই নিষাদ লাগিয়ে যেটা মধুমত সারং বলে বাজান, অন্য বেশিরভাগ ঘরানায় তাকেই বলে বৃন্দাবনী সারং। আর বৃন্দাবনী সারং বলে যেটা বাজান তাতে শুধু শুদ্ধ নিষাদটাই লাগে। মধ্যলয় ত্রিতালে গত। স্বপন চৌধুরি অসাধারণ সঙ্গত করছেন। আদিত্য এত মগ্ন হয়ে বাজনা শুনছিল, খেয়াল করেনি কফির জলটা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। কফি নিয়ে বসতে না বসতেই খাঁ সাহেব দ্রুত একতালে অন্য গত ধরলেন।

বাজনাটা বেশি লম্বা নয়। উনিশ মিনিট। শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার ফোন।

'ঠিকমত পৌঁছলাম কি না জানার জন্যে একটা ফোন পর্যন্ত করলে না।' কেয়ার গলায় প্রবল অভিযোগ।

'বিশ্বাস কর, কাজের খুব চাপ ছিল। আমি সারা সকালটা ভবানীপুর থানা আর লালবাজারে কাটিয়েছি। এখনও লাঞ্চটাই খাওয়া হয়নি। এইমাত্র আপিসে এসে ভাবছিলাম তোমাকে ফোন করব।' আদিত্য কাতরভাবে বলল।

শেষের কথাটা অবশ্য একেবারে মিথ্যে নয়। মধুমত সারং-এর পর গৌড় সারং শোনার ইচ্ছে ছিল আদিত্যর। তবে তার আগে সে সত্যিই ভেবেছিল কেয়াকে একটা ফোন করে নেবে।

'লাঞ্চ খাওনি কেন?'

'যে ছেলেটা খাবার এনে দেয় সে একটু অন্য জায়গায় গেছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। তুমি এখন কোথায়?'

'বাগডোগরা থেকে গাড়িতে উঠে ডুয়ার্সের দিকে যাচ্ছি। এখনও জঙ্গলে ঢুকিনি। লোকবসতির মধ্যেই আছি। হয়ত এর পরে আর সিগনাল পাওয়া যাবে না, তাই ফোন করে নিলাম।'

'খুব ভাল করেছ। আমি রাত্তিরের দিকে ফোনের চেষ্টা করব। দেখি সিগনাল পাই কি না। ততক্ষণে পৌঁছে যাবে নিশ্চয়।'

'ঠিক আছে রাত্তিরে কথা হবে।'

ফোনটা রেখে কফির অবশিষ্টাংশ গলাধঃকরণ করল আদিত্য। তারপর আবার ফোনটা হাতে নিয়ে বিমলের নম্বরটা লাগাল। নম্বরটা বেজে যাচ্ছে। বিমল গেল কোথায়? তার তো নাইট ডিউটি। এই সময় তার বাড়িতে থাকার কথা। ফোনটা বেজে বেজে থেমে গেল। রেকর্ডেড মেসেজ মহিলার গলায় বলল, আপনি যাকে কল করছেন তিনি এখন আপনার কলটা নিতে পারছেন না। ফোনটা নামিয়ে রেখে আদিত্য মত পরিবর্তন করে গৌড় সারং-এর বদলে আলি আকবর খাঁ সাহেবের বিলাসখানী টোড়ি লাগাল। লাগাতে না লাগাতে ফোনটা বেজে উঠেছে। বিমল ফোন করছে। বাজনাটা পজে দিয়ে ফোনটা ধরল আদিত্য।

'জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম স্যার। আপনার ফোনটা শুনতেই পাইনি। গিন্নি ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলল, ফোন বাজছে।' বিমলের গলা থেকে এখনও ঘুমের রেশ কাটেনি।

'তোমার খবর কী? অনেকদিন আস না, ফোন-টোনও কর না।'

'গত এক মাস খুব ঝামেলায় ছিলাম স্যার। আপনি তো জানেন, ছেলেটা মানুষ হল না। লেখাপড়া শিখল না। কাজটাজও কিছু করে না। তো আমি এসব নিয়ে একদিন খুব বকাবকি করেছিলুম। পরদিন থেকে বাবু বাড়ি ছেড়ে বেপাত্তা। গিন্নি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিল। সারাদিন আমাকেই দুষছে। আমি ওরকম করে না বললে ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত না।'

'পুলিশে খবর দাওনি?'

'না স্যার। পুলিশ অব্দি যাইনি। আসলে আমার একটু রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল, খুঁজে কী হবে? দুদিন বাদে পেটে টান পড়লে নিজের থেকেই সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসবে। বলতে কি, আমার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। আমি তো ছেলেকে অন্যায্য কিছু বলিনি। গিন্নিই ওকে আদর দিয়ে নষ্ট করেছে। আমার জেদ, আমি কিছুতেই নিজের থেকে খোঁজ করব না। এইভাবে দিন কুড়ি কেটে গেল। গিন্নি না খেয়ে না ঘুমিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। মেয়েটাও দাদার জন্য কান্নাকাটি করে। আমি ভাবলাম, এইবার জেদ ছেড়ে ছেলেটার খোঁজ করা দরকার। ঠিক এই সময় আমার মেয়ের মোবাইলে ছেলের মেসেজ এল। সে দিল্লি গিয়ে রাজমিস্তিরির জোগাড়ের কাজ করছে। আমাদের বস্তি থেকে কিছু লোক কাজ নিয়ে দিল্লি গিয়েছিল। ও আমাদের কিছু না বলে তাদের ওখানে চলে গেছে। তাদের সঙ্গে থাকে, তারাই কাজ জোগাড় করে দিয়েছে। নয়ডায় একটা খুব উঁচু বাড়ি উঠছে। সেখানে কাজ পেয়েছে। আমার সঙ্গে ছেলের কথা হয়নি, তবে গিন্নির সঙ্গে হয়েছে, আমার মেয়ের সঙ্গে হয়েছে। ওরা খুব খুশি। আমিও খুশি কারণ এতদিনে ছেলেটা নিজে রোজকার করছে।'

বিমলের দীর্ঘ সংলাপের মাঝে আদিত্যর লাঞ্চ এসে গেছে। সে খেতে খেতে বিমলের কথা শুনছিল। অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিমলের পরিবারে কোনওরকম ঝামেলা হচ্ছে না এরকম আদিত্য আগে কোনও

দিন শোনেনি।

'তাহলে এখন তো তোমার আর কোনও সমস্যা নেই।' আদিত্য ওমলেটের একটা টুকরো মুখে দিয়ে ঈষৎ জড়ানো উচ্চারণে বলল।

'না স্যার। ঝামেলা আছে। এখন বউ বায়না ধরেছে ছেলেকে দেখতে সে দিল্লি যাবে। কিন্তু কার সঙ্গে যাবে? ও তো আর একা ট্রেনে করে যেতে পারবে না। আর আমার পক্ষে এখন ছুটি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কম্পানি আমাকে কিছুতেই ছুটি দেবে না।'

'হুঁ, বুঝলাম। একটু ভাল করে বুঝিয়ে বললে তোমার গিন্নিও বুঝতে পারবে। বিশেষ করে বোলো যে দিল্লিতে তোমাদের থাকার কোনও জায়গা নেই। তোমার ছেলে নিশ্চয় অনেকের সঙ্গে একটা ঘরে থাকে। সেখানে তার মা গিয়ে কোথায় থাকবে?'

'অবশ্যই বলব স্যার। এই পয়েন্টটা আমার মাথায় আসেনি। এবার আপনি বলুন স্যার। নিশ্চয় কোনও দরকারে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, একটা দরকার ছিল। সিনেমা পাড়ায়, মানে টালিগঞ্জে একটু খোঁজখবর করতে হবে। পারবে তো?'

'নিশ্চয় পারব স্যার। আমি যে বাড়িটাতে সিকিউরিটির কাজ করি সেটা সিনেমা পাড়া থেকে হেঁটে মিনিট দশেক। আমার কোনও অসুবিধে হবে না স্যার। আপনি বলুন কী জানতে হবে।'

'তাহলে শোনো। রোহিত ধামানি বলে টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায় একজন প্রোডিউসার আছে। তার সম্বন্ধে যা-কিছু জানা যায় জেনে এস। ধামানি এখন 'ফেরারি' বলে একটা হাই-বাজেট ছবি করছে। এত টাকার ছবি নাকি টালিগঞ্জে আগে হয়নি। কিছু শুটিং বিদেশে হয়েছে। আরও কিছু হবে। এই ছবিটার প্রোডিউসারের সম্বন্ধে আমার বিশেষ করে জানা দরকার। আর ছবিটার সম্বন্ধেও। ছবিটা কতটা বাকি, যদি ছবির কাজ এখন আটকে গিয়ে থাকে তাহলে কেন আটকে গেছে এইসব কিছু জানতে হবে। প্রোডিউসারের নাম রোহিত ধামানি আর ছবির নাম 'ফেরারি'। মনে থাকবে তো?'

'মনে থাকবে স্যার, অবশ্যই মনে থাকবে।'

'আর হ্যাঁ। 'ফেরারি'র ইনডোর শুটিং হচ্ছে টালিগঞ্জ পাড়ায় ছায়াছবি বলে একটা স্টুডিওতে। এটা আনকোরা নতুন একটা স্টুডিও, বছর খানেক হল তৈরি হয়েছে। এই স্টুডিওটা নাকি বোম্বাই বা সাউথ ইণ্ডিয়ার বেস্ট স্টুডিওগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সব আধুনিক ফেসিলিটি নাকি এদের আছে। তুমি ওখানে গিয়ে খোঁজ কোরো।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আশা করি তুমি দু-এক দিনের মধ্যে কিছু খবর পেয়ে যাবে। খবর পেলে চলে এস। আমিই তোমাকে ফোন করে বলে দেব কোথায় আসতে হবে, মেসে না আপিসে। আর যখন আসবে তখন তোমার পেমেন্টটা করে দেব।'

'আপনি পেমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত হবেন না স্যার। আগে খবরটা তো আনি।'

২৩৪ নম্বর বাড়িটা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের উত্তর প্রান্তে। ছিমছাম দোতলা বাড়ি, সদ্য রঙ করা হয়েছে। বাড়ির নাম 'কুমুদিনী'। অতএব এটা যে বটুকবাবুরই বাড়ি তা নিয়ে সন্দেহ নেই। রাস্তা থেকে দেখা যায় দোতলার বারান্দাটা গাছপালায় ভর্তি। ক্যাকটাস, অর্কিড, পাতাবাহার। দু-একটা ফুলগাছের টবও রয়েছে। একটা লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ড্রাইভওয়ে। সকালে দেখা হন্ডা অ্যাকর্ডটা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পাশাপাশি দুটো গ্যারেজ। একটা ফাঁকা, সম্ভবত সেটাই হন্ডা অ্যাকর্ড-এর বাসস্থান। অন্য গ্যারেজটাতে একটা বড় গাড়ি বিশ্রাম করছে। এক ঝলক দেখে আদিত্যর মনে হল বি এম ডাবলু।

ড্রাইভওয়ের একপাশে সদর দরজা। আদিত্য বেল বাজিয়ে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আছে। তার মানে সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে সে। উর্দিপরা বেয়ারা দরজা খুলে

দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। আদিত্য নিজের নাম বলতে সে ঘাড় নাড়ল। নিশ্চয় তাকে বটুকবাবু নামটা বলে রেখেছেন।

বটুকবাবুর বসার ঘরটা রীতিমত বড়। যেমন বড়লোকদের হয়। কিন্তু আদিত্যর মনে হল আসবাবগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। যেন কিছু দামি দামি আসবাব তাড়াহুড়ো করে পাশাপাশি রেখে ঘরটা ভরিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু একটার পাশে আর একটাকে মানায় কি না তা নিয়ে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করা হয়নি।

আদিত্যকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দোতলার সিঁড়ি দিয়ে বটুকবাবু নেমে এলেন। খোলা দরজা দিয়ে আদিত্য দেখতে পেল তিনি নেমে আসছেন। পরনে গেরুয়া সিল্কের লুঙ্গি, সাদা সিল্কের ফতুয়া।

'বলুন, জাহাঙ্গির কী বলে পাঠিয়েছে। ফিরদৌস কোথায় গেল? ফিরদৌস? আগে তো তাকে দিয়েই খবর পাঠাত জাহাঙ্গির। ফিরদৌস কি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে?' বটুকবাবু গমগমে গলায় বললেন।

'ফিরদৌসকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশও জানে না, জাহাঙ্গির সাহেবও জানেন না সে কোথায় আছে। তাই জাহাঙ্গির সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।' আদিত্য সহজ গলায় বলল।

'ফিরদৌসকে পাওয়া যাচ্ছে না?' বটুকবাবুর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। 'আমি তো ভাবছিলাম ওকেও পুলিশ ধরেছে।'

'তার থেকেও বড় একটা প্রশ্ন আছে। রোহিত ধামানির নতুন ছবিতে ইনভেস্ট করার জন্য কুড়ি কোটি টাকা জাহাঙ্গির খান ফিরদৌসের হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল। ফেব্রুয়ারির আট তারিখে। আপনি কি সেই টাকাটা পেয়েছেন?'

প্রশ্নটা শুনে বটুকবাবুর মুখে পরপর কয়েকটা অভিব্যক্তি খেলে গেল বিস্ময়, অবিশ্বাস, দুশ্চিন্তা, হতাশা। আদিত্যর মনে হল, অভিব্যক্তিগুলো যদি বানানো হয় তাহলে বটুকবাবু খুব উঁচু দরের অভিনেতা। সে বটুকবাবুকে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য খানিকটা সময় দিল। তারপর বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি টাকাটা পাননি। তাহলে ধরে নিতে হবে ফিরদৌসের কাছেই টাকাটা আছে।'

'শুনুন, কিছুদিন আগে এক কোটি টাকা ফিরদৌস আমাকে এনে দিয়েছিল। কুড়ি কোটি নয়, এক কোটি। কুড়ি হাজার পাঁচশ' টাকার নোট। তবে সেটা অন্য ইনভেস্টারের কাছ থেকে এসেছিল। কিন্তু কুড়ি কোটি টাকা তো ফিরদৌস আমাকে দেয়নি।'

'এই এক কোটি টাকা কবে নাগাদ ফিরদৌস আপনাকে এনে দিয়েছিল?'

'দিনটা আমার মনে আছে। যেদিন কুমুদিনী রেড হল তার ঠিক আগের দিন, মানে ওই ফেব্রুয়ারির আট তারিখেই।'

'জাহাঙ্গির খান বলছেন, আট তারিখে কুড়ি কোটি টাকা নিয়ে রওনা হওয়ার আগে জাহাঙ্গির খানের ফোন থেকে ফিরদৌস আপনার সেক্রেটারিকে ফোন করে বলেছিল সে টাকা নিয়ে আসছে এটা যেন আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। আপনার সেক্রেটারি আপনাকে কিছু জানায়নি?'

'জানিয়েছিল। আমার সেক্রেটারি আমাকে বলেছিল ফিরদৌস টাকা নিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়ে ছিলাম ওই এক কোটি টাকা নিয়ে ফিরদৌস আসছে। কারণ এটা নিয়ে ফিরদৌসের সঙ্গে তার আগের রাত্তিরে আমার কথা হয়েছিল।'

'তাহলে তো ধরে নিতে হবে কুড়ি কোটি টাকাটা ফিরদৌসের কাছেই আছে।' আদিত্য চিন্তান্বিত গলায় বলল।

'যদি ধরে নিই পুলিশের ঝামেলার ফলে সে টাকাটা আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে টাকাটা সে জাহাঙ্গিরকে ফেরত দিয়ে দিল না কেন?' বটুকবাবুর গমগমে গলাটা হঠাৎ খুব দুর্বল শোনাচ্ছে।

'এমন তো হতে পারে জাহাঙ্গির খান টাকাটা আদৌ ফিরদৌসকে দেয়নি। আমাদের বিপদ দেখে জাহাঙ্গির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে।'

কথাটা যিনি বললেন তিনি কখন পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন আদিত্য টের পায়নি। কথাটা বলে তিনি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। আদিত্য দেখল, যৌবন-উত্তীর্ণ এক মহিলা, ঈষৎ চাপা রঙ, ছোট কাটের ব্লাউজ, উদ্ধত নারীত্ব, চেহারায় এখনও কিছু চটক বাকি রয়ে গেছে। আদিত্য এর ছবি ইন্টারনেটে, খবর কাগজে দেখেছে। তার অনুমান করতে কষ্ট হল না ইনিই সুমনা ঘোষাল।

'তুমি আবার নিচে নেমে এলে কেন?' বটুক সামন্তকে বিচলিত দেখাল।

'তোমাদের কথা শুনে নিচে নেমে এলাম। ভাবলাম জাহাঙ্গির খান কাকে পাঠাল একবার দেখে আসি।'

'আমার মনে হয় তুমি মিথ্যে সন্দেহ করছ। ইনি জাহাঙ্গির খানের চিঠি নিয়ে এসেছেন। আর যদি বল জাহাঙ্গির আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে, আমি সে কথা মানব না। বহুদিন ব্যবসা করছি, আমি লোক চিনি।'

বটুকবাবুর কথাটা প্রায় অগ্রাহ্য করে সুমনা ঘোষাল আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি জাহাঙ্গির খানের কম্পানিতে কাজ করেন? আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমি জাহাঙ্গির খানের কম্পানিতে কাজ করি না। পেশায় আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। কুড়ি কোটি টাকা সন্ধান করার জন্য জাহাঙ্গির খান আমাকে নিয়োগ করেছেন।' আদিত্য সুমনা ঘোষালের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আপনি গোয়েন্দা?' বটুকবাবুর চোয়ালটা শক্ত হল।

'চিন্তা করবেন না বটুকবাবু। পুলিশের সঙ্গে আপনার যে সমস্যাটা চলছে সেখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই। আমার একটাই উদ্দেশ্য। আমার মক্কেল জাহাঙ্গির খানের কুড়ি কোটি টাকা কোথায় গেল সেটা সন্ধান করা।'

'টাকাটা কিন্তু ফিরদৌস আমাকে দেয়নি। ওই ধরনের জোচ্চুরির কারবার করলে আমি এতদিন ব্যবসা চালাতে পারতাম না।' বটুকবাবুর গলাটা প্রায় অসহায় শোনাল।

'আমি আপনার কথাটা জাহাঙ্গির খানকে জানিয়ে দেব। তবে আমার মনে হয় আর একটা খবর আপনার জানা দরকার। শুধু ফিরদৌস নয়, আপনার অন্য দু-জন এজেন্ট, গোবিন্দ রায় এবং শিবেন মাইতি, তারাও কিন্তু নিখোঁজ। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ এখনও তাদের সন্ধান করতে পারেনি।'

'আপনি এটা কী করে জানলেন?' সুমনা ঘোষাল উদ্ধতভাবে আদিত্যকে আক্রমণ করল।

'লালবাজারে আমার কিছু চেনাশোনা আছে। তাদের কাছ থেকে জেনেছি। অবাক হচ্ছি, খবরটা বটুকবাবুর কাছে এতদিনেও পৌঁছয়নি কেন?' আদিত্য সুমনার দিকে তাকিয়ে বলল।

'এ কিন্তু পুলিশের লোক। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। এর সঙ্গে খুব ভেবেচিন্তে কথা বল।' সুমনা বটুকবাবুর দিকে খানিকটা সরে গিয়ে বলল। যেন আদিত্যর কাছাকাছি থাকলে তার ক্ষতি হয়ে যাবে।

'মিতুল তুমি ওপরে যাও। আমি এই ব্যাপারটা দেখছি।' বটুকবাবুর গলায় সেই পুরোনো কর্তৃত্বটা ফিরে এসেছে। 'এর মধ্যে তোমার থাকার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

সুমনা ঘোষাল একটু একটু করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে গলা তুলে বলল, 'সাবধানে এই লোকটার সঙ্গে কথা বোলো। লোকটা খারাপ মতলবে এসেছে, আমি বলে দিচ্ছি।'

সুমনা চলে যাওয়ার পর বটুকবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনি তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনি নিশ্চয় টাকাটার সন্ধানে ফিরদৌসের খোঁজ করবেন। যদি ফিরদৌসের খোঁজ পেয়ে আমাকে জানাতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে আলাদা করে একটা পারিশ্রমিক দেব। জাহাঙ্গির যা দেবে তার ওপর। আর যদি গোবিন্দ বা শিবেনের সন্ধানও দিতে পারেন তাহলে আরও কিছু পারিশ্রমিক আপনার পাওনা হবে। কিন্তু

ফিরদৌস, গোবিন্দ বা শিবেনের সন্ধান পেলেও আপনি পুলিশকে জানাতে পারবেন না। আপনি কি আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন?'

আদিত্য খানিকটা চিন্তা করে বলল, 'আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি। তবে একটা শর্তে। আপনার ব্যবসা সংক্রান্ত কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে।'

'সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। আপনি প্রশ্ন করুন, উত্তর দেওয়ার হলে আমি দেব।'

'ঠিক আছে। আমার প্রথম প্রশ্ন, এই মুহূর্তে আপনার কোথায় কোথায় টাকা খাটছে? অর্থাৎ আপনার ব্যবসা হঠাৎ উঠে গেলে কোন কোন পার্টিকে আর টাকা ফেরত দিতে হবে না?'

'পুলিশ আমাকে এই প্রশ্নটা বারবার করেছিল। আমি উত্তর দিইনি কারণ ক্লায়েন্টদের প্রোটেক্ট করা আমার প্রধান দায়িত্ব। মাফ করবেন, আপনাকেও এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। আজ আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা। আমি জানি না আপনাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়। পরের প্রশ্ন?'

'আমি ধরে নিচ্ছি ওই একই কারণে এই মুহূর্তে আপনার ফাইন্যান্সার কারা সেটাও আপনি আমাকে বলবেন না।'

'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।'

'আমার পরের প্রশ্ন, যে এক কোটি টাকা ফিরদৌস আপনাকে আট তারিখে এনে দিয়েছিল, সেই টাকাটা এখন কোথায়?'

বটুকবাবুর চোয়াল শক্ত হল। তিনি বললেন, 'এই প্রশ্নটার উত্তরও আমি দিতে পারব না।'

'তাহলে আর একটা প্রশ্নই আপনাকে করব। জাহাঙ্গির খান যখন তার টাকার খোঁজ নিতে আপনার দেওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন করেছিল তখন একজন মহিলা ফোনটা ধরে বলেছিলেন আপনার কম্পানি জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে কুড়ি কোটি টাকা পায়নি। আপনি কি বলতে পারেন এই মহিলা কে হতে পারে?'

আদিত্য লক্ষ করল চকিতে বদলে যাচ্ছে বটুকবাবুর মুখের অভিব্যক্তি। একটা ভয়, একটা আশঙ্কার ছায়া যেন তার মুখে। মিনিট খানেকের মধ্যেই অবশ্য বটুকবাবু নিজেকে সামলে নিলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'না, কে ফোন ধরেছিল আমি ঠিক বলতে পারব না। এটা আমার সেক্রেটারির আরেকটা নম্বর। আমি এইটুকু জানি যে আমার সেক্রেটারি শৌভিক নন্দকে আমার সঙ্গেই পুলিশ ধরেছিল। সে এখনও পুলিশের কাস্টডিতেই আছে। কিন্তু তার মোবাইলটা সে কোথায় রেখে এসেছে আমি বলতে পারব না। অতএব সেই মোবাইলে কে ফোন ধরেছিল তাও আমার জানা নেই।'

আদিত্য চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, বটুকবাবু। আপনার প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। তবে যে কাজে আমি এসেছিলাম সেটা হয়ে গেছে। এইবার জাহাঙ্গির খানের কাছে আমার রিপোর্ট জমা দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ। আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। চললাম, নমস্কার।'

বাইরে এসে আদিত্য দেখল আকাশে মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা তার গায়ে এসে পড়ল। সঙ্গে ছাতা নেই। জোরে বৃষ্টি নামার আগে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছতে হবে। আদিত্যর ভাগ্যটা ভাল যাচ্ছে বলতে হবে। সে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছোনোর আগেই এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়া এসে মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর তারপর থেকে একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল আলোতে সারা আকাশটা ভরে গেছে। কনে দেখা আলো। ঘড়িতে ছটা বাজে।

৪

মেসে ফিরে আদিত্য কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাধারণত এরকম অসময় ঘুমোনো তার অভ্যেস নেই, কিন্তু আজ খুব ক্লান্ত লাগছে। বস্তুত আলোটা না নিভিয়েই সে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়েছিল। কখন আপনা

থেকেই চোখ দু-টো বন্ধ হয়ে এসেছে সে বুঝতেই পারেনি। বলরামের হাঁকাহাঁকিতে চোখ খুলতে হল।

'একজন লোক আপনার খোঁজ করছে। নিচে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলল তোমার বাবুকে একবার ডেকে দাও না।'

'কোন বাবুকে ডাকতে বলেছে? এখানে তো অনেক বাবু আছে। আমাকেই ডাকছে বুঝলি কী করে?'

'আমি তোমার নাম জানি না নাকি? হিন্দিতে আমাকে বলল আদিত্যবাবু এখানে থাকে? তাকে একবার ডেকে দাও না ভাই।'

আদিত্য একটু অবাক হয়েছে। এখানে সাধারণত কেউ তার খোঁজ করতে আসে না। এখানে কে এল? সে বাইরে যাবার জামা-প্যান্ট পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বলরামকে বলল, 'তুই নিচে গিয়ে লোকটাকে দাঁড়াতে বল। আমি এক্ষুনি আসছি।' পরে বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে, কাবলি জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে সে একতলায় নেমে দেখল রোগা বেঁটে মত একটা লোক সদর দরজার বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটাকে আদিত্য আগে কখনও দেখেনি।

'নমস্তে সাব। আপনিই তো আদিত্যবাবু আছেন?'

লোকটা অবাঙালি, বাংলায় পশ্চিমা টান।

'কী ব্যাপার?' আদিত্য প্রতি নমস্কার করে বলল।

'আপনি কি সাব আমার সঙ্গে একটু আসতে পারবেন? বেশি দূরে নয়। এই নাখোদা মসজিদের কাছে।'

'আমি হঠাৎ সেখানে যেতে যাব কেন?' আদিত্য সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল।

'সাব, ওখানে আপনার জন্যে ফিরদৌস রহমান ইন্তজার করছে। আপনার সোঙ্গে দোমিনিট কথা বোলতে চায়। ফিরদৌস বলছে এখানে আসা ওর জন্যে সেফ নয়। আপনাকে খুব রিকোয়েস্ট করেছে, কি আপনি যদি একবার আসেন। আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে লিয়ে যাবার জন্য।'

আদিত্য এক মুহূর্ত ভেবে ঠিক করে ফেলল সে যাবে। নাখোদা মসজিদের ওদিকটা খুব নিরাপদ পাড়া নয়। কিন্তু ওইটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। সে লোকটাকে বলল, 'আপনি আগে আগে চলুন। আমি আপনাকে ফলো করছি।'

আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে লোকটা মহাত্মা গান্ধী রোড ধরল। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে রাস্তা পার হয়ে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথে উঠে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরেই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর মোড়ের দিকে হাঁটা লাগাল। লোকটা যে গতিতে হাঁটছে আদিত্য অত তাড়াতাড়ি হাঁটে না। সে একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। সিগারেট খাবার পরিণতি। আর একটা সমস্যা হল হাঁটতে হাঁটতে লোকটা মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে দেখছিল আদিত্য ঠিকঠাক আসছে কিনা। কেউ যদি তাদের ফলো করে তাহলে সে সহজেই বুঝে যাবে আদিত্য কোথায় যাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী রোডে ভিড় আছে। মেহবুব ব্যান্ড এবং আরও ছোটখাট দু-একটা ব্যান্ডপার্টির দোকান পেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর মোড়ে পৌঁছল। চিত্তরঞ্জন এভিনিউটা পার হয়ে এইবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরেই বাঁদিকে বেঁকল লোকটা। আদিত্য আন্দাজ করল লোকটা মহম্মদ আলি পার্কের উল্টোদিকের রাস্তাটা ধরবে, যে রাস্তায় মুনলাইট বলে একটা সিনেমা হল আছে। আদিত্যর কলেজ জীবনে ওই রাস্তায় কৃষ্ণা বলে আর একটা সিনেমা হল ছিল। এখন বোধহয় সেটা আর নেই। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে দুটো হলেই সিনেমা দেখেছে। আদিত্য জানে ওই রাস্তাটা ধরে সোজা গেলেই নাখোদা মসজিদ।

এখন তারা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। লোকটা কিন্তু মুনলাইট সিনেমার রাস্তাটা না ধরে আরও এগিয়ে গেল। এগিয়ে পরের রাস্তায় ডানদিকে বেঁকল। এটা জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট, আদিত্যর চেনা রাস্তা। এখানে কয়েকটা দুর্দান্ত কাবাবের দোকান আছে। জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট ধরে সোজা গেলেই চিৎপুর পড়বে। তারপর ডানদিকে বাঁক নিলেই নাখোদা মসজিদ।

চিৎপুর পৌঁছনোর আগেই অবশ্য লোকটা থেমে গেল। রাস্তার বাঁদিকে, জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের ওপরেই একটা হোটেল। হোটেল সিতারা। লোকটা তার সামনে থেমে ইশারায় আদিত্যকে হোটেলের ভেতরে ঢুকতে বলল।

নিজেও ঢুকল। হোটেলটা মাঝারি মানের। ঢুকেই একটা রিসেপশানের মতো রয়েছে। রিসেপশানে বসে একটা ছোকরা মোবাইলে সিনেমা দেখছে। ছোকরাকে লোকটা বলল, 'তিন সো সাত কা চাবি'।

চাবি হাতে নিয়ে লোকটা আদিত্যর দিকে ফিরল। বলল, 'সাব, আপ তিন সো সাত নম্বর রুম মে থোড়া সা ওয়েট কিজিয়ে। ম্যায় ফিরদৌস সাহাব কো লে কর আ রহা হুঁ। হম পাঁচ মিনিট মে আ জায়েঙ্গে।'

হোটেলে লিফট আছে। সেটা রিসেপশানের তলাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা আদিত্যকে নিয়ে লিফটে উঠল। তিনতলায় উঠে একটা ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল লিফটা। তিনশ সাত নম্বর ঘর লিফট থেকে নেমে বাঁদিকে। দরজা খুলে যে ঘরটাতে আদিত্যকে লোকটা ঢোকাল সেটা বেশ বড়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একদিকে পরিপাটি বিছানা করা ডবল বেড, অন্যদিকে সোফা সেট। আদিত্য সোফায় বসল।

আদিত্যকে বসিয়ে লোকটা ঘর থেকে বেরনোর জন্য দরজার হাতলে হাত ছুঁইয়েছে, আদিত্য তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে?'

'আরামসে সিগ্রেট পিজিয়ে। কোই দিককত নহি।' লোকটা অভয় দিল। তারপর কী যেন মনে পড়েছে এমনভাবে বলল, 'চায় পিয়েঙ্গে সাব? ইধর বহুত বড়িয়াঁ চায় বনতি হ্যায়।'

এক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না। আদিত্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সে খেয়াল করল লোকটা তার নিজের জায়গায় এসে আর বাংলা বলছেই না।

এক কাপ চা এবং দুটি সিগারেট শেষ করার পর আদিত্যর ঘুম এসে গিয়েছিল। ঠিক ঘুম নয়, ঝিমুনি। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আদিত্যর চটকাটা ভেঙে গেল। লোকটা ফিরে এসেছে। সঙ্গে যাকে এনেছে, আদিত্য নিশ্চিত, তারই ছবি তারক দাস হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল। তবে ছবিতে ফিরদৌস রহমানকে দেখে যতটা লম্বা-চওড়া মনে হয়েছিল আসল মানুষটা মোটেই ততটা নয়।

ফিরদৌস ঘরে ঢুকে অন্য লোকটাকে ইশারায় চলে যেতে বলল। লোকটা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে আদিত্যর উল্টোদিকের সোফায় এসে বসল সে। বলল, 'আপনি যে এসেছেন এর জন্যে আমি কতটা কৃতজ্ঞ বলে বোঝাতে পারব না। আপনাকে এইভাবে কষ্ট দেবার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত। কিন্তু আমার আর কোনও উপায় ছিল না।'

ফিরদৌসের বাংলাটা শহুরে এবং পরিশীলিত, তবে তার পিসির মতো তাতে একটা হালকা পশ্চিমি টান আছে। মুখটা মেয়েলি সুন্দর। চোখের নিচে কালি এবং গালে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি জানান দিচ্ছে ইদানীং লোকটা খুব শান্তিতে নেই।

'আমি এখন তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। অথচ আমার কোনও দোষ নেই।' ফিরদৌস প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'আপনার কথা সাবিনা আমাকে বলেছে। আমার পিসিও বলেছে। পিসি বলল, আপনার দয়া-মায়া আছে, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আছে। আপনাকে আমার কথাটা বুঝিয়ে বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন।'

'কিছু না লুকিয়ে ব্যাপারটা যদি আমাকে প্রথম থেকে খুলে বলেন তাহলে আমার বুঝতে সুবিধে হবে।' আদিত্য ফিরদৌসকে থামিয়ে দিয়ে বলল।

'সেটাই বলছি। সেটা বলব বলেই তো আপনাকে আসতে বললাম। দেখুন গত মাসে, মানে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে, আমাকে ফুপাজি বললেন বটুকবাবুর কাছে একটা মোটা টাকা পৌঁছে দিতে হবে। ফুপাজির স্ট্রোকের পর থেকে এই কাজটা আমি কয়েকবার করেছি। তাই আমি খুব একটা অবাক হলাম না। ফেব্রুয়ারির আট তারিখে সকালবেলা ফুপাজি আমাকে ডেকে একটা ব্যাগ দিলেন। বললেন, দেখে নাও। এতে টাকাটা আছে। আমি ব্যাগ খুলে গুনে নিলাম। ফুপাজি বললেন টাকাটা বটুকবাবুকে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে দিতে হবে। সহদেব আর জামিলকে তোমার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। এতগুলো টাকা তো। সাবধানে যাবে। আমি সহদেব আর জামিলকে নিয়ে টাকার ব্যাগ সমেত রওয়ানা হয়ে গেলাম। রবি গাড়ি চালাচ্ছিল। সহদেব আর জামিল সামনে। আমি টাকার ব্যাগ নিয়ে পিছনে।'

'একটা জিনিস বলুন।' আদিত্য ফিরদৌসকে থামিয়ে দিয়ে বলল। 'রওয়ানা হবার আগে আপনি বটুকবাবুকে একটা ফোন করেছিলেন। কিন্তু তাকে ফোনে পাননি। তার সেক্রেটারিকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আপনারা আসছেন। আমার প্রশ্ন, গাড়িতে উঠে কি আপনি বটুকবাবুকে আর ফোন করেছিলেন?'

'না। আর বটুকবাবুকে ফোন করা হয়নি। আমার মনে হয়েছিল ওর সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিলেই উনি জানতে পেরে যাবেন যে আমরা আসছি।'

'গাড়িতে থাকার সময় আর কোনও ফোন কি আপনার এসেছিল?'

'আসতেও পারে। ঠিক মনে পড়ছে না। অনেকদিন হয়ে গেল তো।'

'ঠিক আছে। বুঝেছি। তারপর কী হল বলুন।'

'দুপুরের আগেই আমরা কুমুদিনীর অফিসে পৌঁছে গেলাম। অফিসে তখন চার-পাঁচজন কাজ করছিল। সকলেই ব্যাগ হাতে আমাকে ঢুকতে দেখেছে। বটুকবাবুর সেক্রেটারি শৌভিক নন্দ সাহেবের ঘরের বাইরে বসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম সাহেব ভেতরে আছে কি না। শৌভিক বলল, সাহেব আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি সহদেব আর জামিলকে বাইরে বসতে বললাম। কারণ আমি জানতাম সাহেব বাইরের লোকের সামনে টাকার লেনদেন করেন না। তাছাড়া টাকাটা রাখার জন্যে সাহেবকে সেফ খুলতে হবে। বাইরের লোকের সামনে সাহেব সেফ খোলেন না। আমাদের সামনেও নয়।'

'তারপর?'

'সাহেব দেখলাম আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে বললেন, টাকা এনেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। সাহেব ইন্টারকমে শৌভিককে বললেন, এখন যেন আমার ঘরে কেউ না ঢোকে। তারপর আমাকে বললেন, তুমি ব্যাগ থেকে নোটগুলো বার করে আমার টেবিলে রাখ। আমি গুনে গুনে নোট বার করে সাহেবের টেবিলে রাখলাম। সাহেব বললেন এইবার তুমি বাইরে অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে ডেকে নেব। আমি বাইরে এসে বসলাম। শৌভিক যেখানে বসে তার সামনে একটা চেয়ার আছে। সেখানে। আন্দাজ করলাম সাহেব এখন সেফ খুলে টাকাগুলো তুলে রাখবেন।'

'সেফটা কোথায় আছে?'

'সাহেবের ঘরেই কোথাও সেফটা আছে। ঠিক কোথায় আছে জানি না। শুনেছিলাম সেফটা কোনও ছবির পিছনে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো আছে। সেফের চাবি সাহেবের কাছে থাকে।'

'তাহলে হয়ত পুলিশ সেটা খুঁজে বার করেছে।' আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বলল।

তারপর যেন কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলল, 'আচ্ছা, একটা খুব দরকারি কথা জানার আছে। কুড়ি কোটি টাকা যদি পুরোটা দু-হাজার টাকার নোটেও হয় তাহলে একশটা করে নোটের এক হাজারটা বান্ডিল লাগে। এক হাজারটা বান্ডিল, মানে এক লক্ষটা নোট তো একটা ব্যাগে ধরবে না। তাছাড়া এক-একটা নোটের যদি এক গ্রাম করে ওজন হয়, তাহলে এক লক্ষ নোটের ওজন একশো কেজি। সেটা তো একজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কী করে আপনি অতগুলো টাকা নিয়ে গেলেন?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। ইন্ডিয়ান রুপিতে কুড়ি কোটি টাকা একার পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি ভাবলাম আপনাকে ফুপাজি বলেছেন। আমি টাকাটা ইউ এস ডলারে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'ইউ এস ডলার!' আদিত্য বিস্ময়টা চাপতে পারছে না।

'হ্যাঁ। একশ' ডলারের কুড়ি হাজার নোট, হাওয়ালা বাজারে এক ডলার একশ টাকা, মানে একটা একশ ডলারের দাম ইন্ডিয়ান রুপিতে দশ হাজার টাকা। তার মানে কুড়ি হাজারটা নোটের দাম কুড়ি কোটি ইন্ডিয়ান রুপি।'

সেদিন জাহাঙ্গির খানের বাড়ি থেকে ফেরার পথে আদিত্যর যে খটকাটা লেগেছিল সেটা আজ পরিষ্কার হল। সে মনে মনে হিসেব করল, এক একটা নোটের ওজন এক গ্রাম করে হলে কুড়ি হাজারটা নোটের

ওজন কুড়ি হাজার গ্রাম, মানে কুড়ি কেজি। এটা অনায়াসে একজন বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

'টাকাটা কী ধরনের ব্যাগে ছিল?' আদিত্য জজ্ঞেস করল।

'নীল রঙের বড় ট্র্যাভেল ব্যাগ।'

'হুঁ, তারপর কী হল?'

'খুব বেশি আর কিছু হল না। কিছুক্ষণ পরে সাহেব আমাকে ঘরে ডাকলেন। দেখলাম নোটগুলো আর টেবিলের ওপর নেই। ফাঁকা ব্যাগটা মাটিতে পড়ে আছে। তার মানে নোটগুলো সেফ-এ উঠে গেছে। সাহেব আমাকে বললেন, সব ঠিক আছে। আমি টাকা গুনে তুলে নিয়েছি। তুমি ব্যাগটা নিয়ে যাও। আর জাহাঙ্গির খানকে বোলো আমি রাত্তিরের দিকে ওকে ফোন করে নেব। আমি ফাঁকা ব্যাগটা নিয়ে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।'

'তার মানে আপনি টাকার ব্যাগ নিয়ে ঢুকেছেন এবং ফাঁকা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন এটা সেক্রেটারি শৌভিক নন্দ সমেত আরও চার-পাঁচজন দেখেছে, তাই তো?' আদিত্য যাচাই করে নেবার গলায় বলল।

'ঠিক তাই। যখন ব্যাগ নিয়ে ঢুকছি তখন ব্যাগের মুখটা বন্ধ ছিল। তবে ব্যাগে যে টাকা ঢোকানো হয়েছে সেটা তো জামিল আর সহদেব জানে। কারণ ওরা বলল ওরাই ডলারগুলো ব্যাগে ভরেছে। আর যখন বেরোচ্ছি তখন তো ব্যাগের চেন খোলা। সকলেই দেখেছে ব্যাগে কিছু নেই। তাহলে আমি কেমন করে চোর হলাম, আদিত্যবাবু?'

প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে আদিত্য বলল, 'টাকাটা পৌঁছে দেবার পর আপনি কী করলেন?'

'আমি ফাঁকা ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দিয়ে সহদেব আর জামিলকে হালিশহর পাঠিয়ে দিলাম। ওদের নিয়ে রবি চলে গেল। আমার ছোটবেলার এক বন্ধু খুব অসুস্থ হয়ে বাইপাসের ধারে একটা নার্সিং হোমে ভর্তি আছে। আমি তাকে দেখতে যাব বলে কলকাতায় থেকে গেলাম। পরের দিন কুমুদিনী রেড হল। অফিস সিলড হয়ে গেল। আমি খবর পেয়ে আর অফিসের দিকে যাইনি। গেলে আমিও অ্যারেস্টেড হয়ে যেতাম।'

'কুমুদিনী রেড হচ্ছে আপনি কী করে জানলেন?'

'পাশের অফিসের একজন খবর দিল। আমি তার নাম বলব না।'

'যেদিন আপনি টাকা জমা দিলেন সেই রাত্তিরটা আপনি কোথায় কাটালেন?'

'এক বন্ধুর বাড়িতে। এখনও সেখানেই আছি। জায়গাটা কোথায় আমি বলতে পারব না। আমার নিজের সেফটির জন্যেই বলতে পারব না।'

'টাকাটা এখন কোথায় আছে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমি শিয়োর টাকাটা বটুক সাহেবের কাছেই আছে। সাহেব মিথ্যে কথা বলছেন যে টাকাটা তিনি পাননি।'

'আপনি জানলেন কী করে যিনি টাকাটা ধার নেবেন বলেছিলেন তার কাছে টাকাটা চলে যায়নি?'

'সেটার সম্ভাবনা কম। এটা হতে হলে সেদিন কাউকে এসে টাকার ব্যাগটা নিয়ে যেতে হতো। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে যারা টাকাটা ধার চেয়েছিল তাদের কাছে টাকাটা এখনও পৌঁছয়নি। আমার মনে হয় টাকাটা বটুক সাহেবই সরিয়ে ফেলেছেন।'

'কিন্তু এতদিন ধরে উনি ব্যবসা করছেন। কখনও কাউকে ঠকাননি। এই বয়েসে এসে বটুকবাবু হঠাৎ লোক ঠকাবেন কেন?'

'আদিত্যবাবু, বোঝার চেষ্টা করুন, পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। সারাদেশে ইললিগাল ফিনান্স কম্পানিগুলোর ওপর পুলিশ ক্র্যাক-ডাউন করেছে। বটুক সাহেব বুঝতে পেরেছেন এই পরিস্থিতিতে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। অতএব এখন যেটুকু পারা যায় কম্পানির থেকে নিংড়ে নিয়ে কেটে পড়তে হবে। আগে বটুক সাহেব কখনও লোক ঠকাননি কেন? কারণ তিনি জানতেন একবার কাউকে ঠকালে এত দুর্নাম হবে যে আর ব্যবসা চালানো যাবে না। তার থেকে লোক না ঠকিয়ে সুনাম বজায় রেখে ব্যবসা চালিয়ে

যাওয়া ভাল। এটাই ছিল সাহেবের লং টার্ম ভিশন। ওই ইংরেজিতে বলে না অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি? তার মানে হল অনেকদিন ব্যবসা চালাতে গেলে সৎ থাকাটাই সব থেকে ভাল রাস্তা। কিন্তু এখন তো আর লং টার্ম ভিশনের কোনও মানেই হয় না। কম্পানির আর তো কোনও ফিউচার নেই। অতএব যেটুকু সম্ভব হাতিয়ে নিয়ে কম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। দুঃখের ব্যাপার, টাকা হাতালেন বটুক সাহেব আর দোষ পড়ল আমার ঘাড়ে।'

'আর একটা প্রশ্ন। ইউ এস ডলারে কেন টাকাটা দেওয়া হল?' আদিত্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরদৌসের দিকে তাকাল।

'কেন ঠিক বলতে পারব না। কোনও কারণ নিশ্চয় ছিল, কিন্তু আমি সেটা জানি না। হয়ত যারা টাকাটা ধার চেয়েছিল, তারা ডলারে চেয়েছিল। তবে বটুক সাহেব যদি টাকাটা সরিয়ে ফেলার প্ল্যান করে থাকেন তাহলে ইউ এস ডলারে হলেই তার পক্ষে টাকাটা একা ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেদিক থেকে দেখলে টাকাটা ডলারে চাওয়ার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।'

'আগে কি কখনও কুমুদিনীতে ডলারে ট্রানজ্ঞাকশন হয়েছে?'

ফিরদৌস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'হলেও আমার জানা নেই।'

'পরের প্রশ্ন। আপনি না হয় জাহাঙ্গির খানের ভয়ে লুকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু অন্য দুজন এজেন্ট, গোবিন্দ রায় এবং শিবেন মাইতি, তারা লুকিয়ে রয়েছেন কেন?'

'হয়ত অ্যারেস্ট হবার ভয়ে। তবে আমি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না। আমার সঙ্গে তো এদের কোনও কথা হয়নি। অফিস রেড হবার খবরটাও যে এরা কোথা থেকে পেল আমি জানি না।'

'এবার শেষ প্রশ্ন। বটুকবাবু বলছেন, কুমুদিনী রেড হবার আগের দিন আপনি এক কোটি টাকা বটুকবাবুকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কুড়ি কোটি নয়, এক কোটি। পাঁচশ' টাকার কুড়ি হাজারটা নোট। দুশটা বাণ্ডিল। এটা কি সত্যি?'

প্রশ্নটা শুনে ফিরদৌস যেন খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সে বলল, 'রেড হবার আগের দিন আমি ওই কুড়ি লক্ষ ইউ এস ডলারই শুধু বটুকবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। একদিনের পক্ষে ওটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'ঠিক আছে ফিরদৌস সাহেব। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি আমার রিপোর্টটা কাল-পরশুর মধ্যে জাহাঙ্গির খানের কাছে দিয়ে দেব। আমার মনে হয়, জাহাঙ্গির সাহেব বুদ্ধিমান লোক। তিনি সব বুঝতে পারবেন।'

আদিত্য যখন মেসে ফিরে এল তখন ন-টা বেজে গেছে। খাবার ঘরে নিরানন্দ রুটি-তরকারি দিয়ে ডিনার সমাধা করে সে ঘরে এসে সিগারেট ধরাল। আর তখনই বেজে উঠল মোবাইলটা। তারক দাস ফোন করছে।

'বস জানতে চাইছেন আপনার কাজ কতটা এগোল। আপনি কাল একবার হালিশহরে আসতে পারবেন? আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

'সকালের দিকে আমার একটু কাজ আছে। দুপুরের দিকে পাঠাতে পারবেন? এই ধরুন তিনটে নাগাদ?'

'কোনও অসুবিধে হবে না। কাল সারাদিন বস ফ্রি আছেন। তাহলে তিনটের সময় আপনার অফিসে গাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

পরের দিন সকালবেলা আসলে আদিত্যর কোনও কাজ ছিল না। কিন্তু একটা পুরো দিন ধকলের পর সে একটু বেলা অব্দি ঘুমোতে চেয়েছিল। তাই সে তারক দাসকে বলেছিল দুপুর তিনটে নাগাদ গাড়ি পাঠাতে। তাছাড়া খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে চিন্তা করার জন্যেও আদিত্যর কিছুটা সময়ের দরকার ছিল। এইসব কারণে সে যে-নিষ্পাপ মিথ্যেটা তারক দাসকে বলল তা নিয়ে আদিত্যর কোনও পাপবোধ নেই।

আদিত্যর ঘুম ভাঙল বেলা পৌনে দশটায়। যতই ক্লান্ত থাকুক এত বেলা করে সে সাধারণত ওঠে না। সকাল নটার রোদ্দুর জানালার কাঁচ দিয়ে ঘরে ঢুকলেই তার ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু আকাশটা আজ পুরোপুরি মেঘাবৃত, বেলা পৌনে দশটাতেও ঘর এত অন্ধকার যে আলো জ্বালাতে হয়। আদিত্য অবশ্য আলো জ্বালাল না। মুখ ধুয়ে, ইলেকট্রিক কেটলিতে কফির জল বসিয়ে ঘর অন্ধকার করে জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর কফি বানিয়ে কফি খেতে খেতে আরও অনেকক্ষণ তাকিয়েই রইল। ভাগ্যিস জানলাটা বন্ধ ছিল, না হলে বৃষ্টির ছাঁট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজিয়ে দিত। শীত শীত করছে। আদিত্য উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পিডটা কমিয়ে দিল।

আবার বৃষ্টি নেমেছে। জানলার কাঁচে বৃষ্টির শব্দ। অনেক বছর আগে পড়া কয়েকটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল আদিত্যর। 'দূরে এসে ভয় ভয় থাকি, সে হয়তো এসে বসে আছে / হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাঁচে/ বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।' কেয়াকে একটা ফোন করলে হতো। ডুয়ার্সেও কি বৃষ্টি পড়ছে? দক্ষিণ, উত্তর দুই বঙ্গেই বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। এটা বর্ষার বৃষ্টি নয়। এত তাড়াতাড়ি বর্ষা আসার প্রশ্নই ওঠে না। বঙ্গোপসাগরে নাকি নিম্নচাপ হয়েছে। তাই ঝড়-বাদল। নিচে মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে গাড়িগুলো খুব সাবধানে যাচ্ছে। চায়ের দোকানের ছাউনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে যাচ্ছে একটা গোরু। তার সাদা গা দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। একটাই ছাতা মাথায় দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে দুটো লোক রাস্তা পার হয়ে গেল।

আদিত্য সিগারেট ধরিয়েছে। একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে তার। বটুক সামন্তর ঘরে একটা সেফ আছে। পুলিশ কি তার সন্ধান পেয়েছে? যদি সেফটা খোলা হয়ে থাকে কী পাওয়া গেছে তার মধ্যে? আদিত্যর মন বলছে দরকারি কোনও তথ্য সেফ-এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সুদর্শন শিকদার আদৌ কোঅপরেটিভ নয়। সেফ-এর মধ্যে কিছু পাওয়া গেলেও সে আদিত্যকে বলবে না। গৌতমকে দিয়ে তাকে রিকোয়েস্ট করা যেতে পারে। গৌতম বললে অবশ্য সেটা রিকোয়েস্ট নয়, অর্ডার হয়ে যাবে। কিন্তু সে যাই হোক, সব ব্যাপারে গৌতমকে জড়াতে ভাল লাগে না। বিশেষ করে তার ক্লায়েন্ট জাহাঙ্গির খানেরও বেশ কিছু দু-নম্বরি ব্যাপার আছে। সেগুলো তো সে পুলিশকে বলতে পারবে না। বলাটা আনএথিকাল হবে। আবার না-বলাটাও আইনের দিক থেকে ভাবলে আনএথিকাল। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। কেসটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই ভাল ছিল।

ইউ এস ডলারের ব্যাপারটাও ভাবাচ্ছে। ফিরদৌসের কথা শুনে মনে হলো ডলারে লেনদেন কুমুদিনীতে খুব বেশি হয় না। হয়ত এই প্রথম হল। এইরকম অদ্ভুত একটা বিনিময় মাধ্যম নির্বাচন করার কারণ কী? জাহাঙ্গির খান ডলারের ব্যাপারটা স্রেফ চেপে গেছিল। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। ডলারটা যে বেআইনিভাবে জোগাড় করা তাতে সন্দেহ নেই।

আদিত্য ল্যাপটপ খুলে ইউ টিউবে নিখিল ব্যানার্জীর মেঘ লাগাল। কেটলিতে আর একটু জল ভরে সুইচটা অন করে দিল। এবার চা খেতে হবে। কেয়া কোথায় ঘুরছে? যেখানে ঘুরছে সেখানে কি বৃষ্টি পড়ছে? নিখিল মধ্যলয় ঝাঁপতালে গত ধরেছেন। সুর ঘুরতে ঘুরতে উঠছে আবার ঘুরতে ঘুরতে নামছে। যেমন বৃষ্টির দিনে হাওয়া ঘুরতে ঘুরতে ওঠানামা করে। নিখিল ব্যানার্জী প্রায় এক মিনিট ধরে তিন সপ্তকব্যাপী একটা গমক-তান করে আদিত্যকে কিছুক্ষণের জন্য অবশ করে দিলেন। হুঁশ ফিরে আসতে আদিত্য উঠে গিয়ে চা ভেজালো। আজকাল সে টি-ব্যাগের বদলে সাবেকি দার্জিলিং চা টিপটে ভিজিয়ে খাবার বিলাসিতা শুরু করেছে। চা-টাও বেশ দামী, অন্তত তার রোজগারের আন্দাজে। তার আপিসবাড়ির সিকিউরিটি শ্যামল ডালহৌসি পাড়ার অরফ্যান থেকে চা-টা এনে দেয়।

নিখিল ব্যানার্জীর মেঘ শেষ হয়ে গেছে। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে মোবাইলে কেয়ার নম্বরটা লাগাল আদিত্য। ভেবেছিল রেকর্ডেড মেসেজ শুনতে পাবে 'আপনি যাকে ফোন করেছেন তিনি নেটওয়ার্ক সীমার বাইরে আছেন'। তার বদলে, কী আশ্চর্য, একবারের চেষ্টাতেই ফোনটা বাজতে লাগল।

'কেমন আছ?' কেয়ার গলাটা খুব ঝলমলে শোনাচ্ছে।

'আজ কোথায় রয়েছ? বেড়াতে যাওনি?'

'জলদাপাড়ায় আছি। আজ জাঙ্গল সাফারি নেবার কথা ছিল। হাতির পিঠে চড়ে। কিন্তু এখানে প্রবল বৃষ্টি নেমেছে। বাইরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। জঙ্গলের ভেতরেই একটা রিসর্টে রয়েছি। চারজন মিলে গল্প করছি।'

'এখানেও খুব বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। দশটা অব্দি ঘুমিয়ে এইমাত্র উঠলাম। উঠে এখন চা খাচ্ছি। হোটেলে আটকে থাকতে তোমার খারাপ লাগছে নিশ্চয়।'

'সত্যি কথা বলব? একটুও খারাপ লাগছে না। হাতির পিঠে উঠতে হবে ভেবে বেশ নার্ভাস ছিলাম। মনে হচ্ছে আর উঠতে হবে না। কাল ভোরবেলা গোরুমারা চলে যাচ্ছি। ওখানে জিপে করে ঘুরব। সেটা অনেক ভাল।'

'কী কী জীবজন্তু দেখলে?'

'অনেক কিছু। হরিণ, বাইসন, গৌর, বিচিত্র সব পাখি। গণ্ডার এখনও দেখতে পাইনি। আজ দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সেটা তো আর হচ্ছে না। কাল গোরুমারা গিয়ে হয়ত দেখতে পাব।'

'জঙ্গলে বৃষ্টি কেমন লাগছে?'

'অপূর্ব। অপূর্ব। তুমি দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে। চারদিকের সবুজগুলো যেন আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে আদিম পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি।'

'বাঃ। চমৎকার।'

'এখন আমরা যে রিসর্টটাতে আছি তার সামনে একটা জলাশয় আছে। রাত্তিরে সেখানে জন্তুরা জল খেতে আসে। সন্ধেবেলা আলো নিভিয়ে বারান্দায় বসে থাকলে তাদের দেখা যায়।'

'খাবার-দাবার পাচ্ছ?'

'খুব ভালই পাচ্ছি। এই তো এখন কফির সঙ্গে পাকৌড়া দেবে। দুপুরে খিচুড়ি করতে বলেছি।'

'মনে হচ্ছে রাজার হালে আছ। রাজার নয়, থুড়ি, রানির হালে।'

'বলতে পার। এই তো কটা দিন একটু মজা করব। তারপর ফিরে গিয়ে আবার স্কুল, ছাত্রী ঠেঙানো।'

'ফিরে একটা ফোন কোরো।'

'ফিরে কেন? তার আগেই করব। তুমিও ফোন করবে কিন্তু।'

'করব। আজ তাহলে রাখি?'

'দাঁড়াও। তোমাকে কী একটা যেন বলার ছিল। ও হ্যাঁ। তোমার হয়ত কাজে লাগতে পারে।'

'কী?'

'সেদিন ওই ক্যাফেতে বসে সুমনা ঘোষালের ছেলের নামটা মনে করতে পারছিলাম না, মনে আছে?। পরে মনে পড়ল। ছেলেটার নাম রনি, রনি ঘোষাল। পুরো নামটা বোধহয় রণপ্রিয় ঘোষাল। রোহিত ধামানির প্রোডাকশান ম্যানেজার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ইনফরমেশনটা আমার কাজে লাগতে পারে। ভাল করে বেড়াও। এখন রাখছি।'

২

জাহাঙ্গির খানের বারান্দাটা আজ অন্য রকম দেখাচ্ছে। আসলে আগের দিন চারপাশটা খোলা ছিল। গঙ্গার আলো-হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আজ বৃষ্টির ছাঁট থেকে রেহাই পাবার জন্য চারদিকে ত্রিপল ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাইরের আলো ভেতরে আসে না। অবশ্য বাইরেও আজ সারাদিন মেঘের আঁধার। এখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে তবু বৃষ্টির বিরাম নেই। আকাশ মেঘহীন হলে হয়ত আকাশে কিছু আলো এখনও অবশিষ্ট থাকত। বারান্দার ভেতরে একটা বড় ঝাড় লন্ঠন জ্বলছে।

জাহাঙ্গির খান হুইল চেয়ারে বসে বিড়ি ধরিয়েছে। তার দেখাদেখি আদিত্যও সিগারেট ধরাল। 'এবার বলুন আদিত্যবাবু আপনি কী জানতে পারলেন?' জাহাঙ্গির খান আদিত্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আপনি আমাকে দুটো জিনিস জানতে বলেছিলেন। আমি যতটা জানতে পেরেছি আপনাকে জানাচ্ছি।'

'বটুকবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে। প্রথমে অল্প সময়ের জন্য দেখা হল, পরে অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছে। কাল সকালে ভবানীপুর থানায় যখন উনি হাজিরা দিতে এসেছিলেন তখন অল্প সময়ের জন্য দেখা হল। আপনার চিঠিটা দিতে উনি বিকেলে ওর বাড়িতে দেখা করতে বললেন। বিকেলে ওর বাড়িতে অনেকক্ষণ কথা হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার পাঠানো কুড়ি কোটি টাকা উনি পেয়েছেন কিনা। উনি পরিষ্কার বলে দিলেন টাকাটা উনি পাননি।'

'আমি ঠিক এইটাই সন্দেহ করেছিলাম।' জাহাঙ্গির খান বিড়বিড় করে বলল। তারপর গলার আওয়াজটা একটু তুলে বলল, 'আপনাদের যখন কথা হচ্ছিল তখন আর কেউ সেখানে ছিল?'

'সুমনা ঘোষাল বলে যে মহিলার সঙ্গে উনি থাকেন তিনি প্রথমে ছিলেন। কিন্তু একটু পরেই তাকে বটুকবাবু ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। তবে আড়াল থেকে তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন কি না বলতে পারব না।'

'ওই মেয়েছেলেটা খতরনাক আছে। বটুকবাবু কী করে ওকে এত বিশ্বাস করেন জানি না।'

'সুমনা ঘোষাল বলছিল এমন তো হতে পারে জাহাঙ্গির খানই আসলে টাকাটা পাঠায়নি।'

কথাটা শুনে জাহাঙ্গির খানের চোয়াল শক্ত হল। একটু থেমে থেমে বলল, 'ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে আমি পরে বোঝাপড়া করে নেব। বটুকবাবু আর কী বলল?'

'বটুকবাবু জানতেন না ফিরদৌসকে পাওয়া যাচ্ছে না। বটুকবাবু ভেবেছিলেন আপনি অন্তত জানেন ফিরদৌস কোথায় আছে।'

'আর কিছু?'

'বটুকবাবু এটাও জানতেন না ওর অন্য দুজন এজেন্ট, গোবিন্দ রায় এবং শিবেন মাইতি, দুজনের কাউকেই পুলিশ ধরতে পারেনি, দু'জনেই নিখোঁজ।'

'এটা তো আমিও জানতাম না।' জাহাঙ্গির খানের গলাটা সত্যিকারের অবাক শোনাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে ভাবছিল। তারপর আদিত্যকে বলল, 'এবার ফিরদৌস সম্বন্ধে কী জানতে পারলেন বলুন।'

'ফিরদৌসের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে।'

'ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা হয়েছে! ফিরদৌসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে!' জাহাঙ্গির খান যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'বলা উচিত, ফিরদৌসই আমার সঙ্গে দেখা করেছে।'

'ফিরদৌস নিজের থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করেছে!' জাহাঙ্গির খানের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

'হ্যাঁ। ফিরদৌসের লোক এসে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করল। বলল, নাখোদা মসজিদের কাছে একটা জায়গায় ফিরদৌস আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। জায়গাটা জ্যাকারিয়া স্ট্রিটের একটা হোটেল, হোটেল সিতারা। আমি লোকটার সঙ্গে গেলাম। লোকটা আমাকে সেই হোটেলের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর মিনিট পনেরর মধ্যে ফিরদৌসকে নিয়ে এল। এটার থেকে মনে হয় ফিরদৌস ওই হোটেলের কাছেই কোথাও ছিল। তবে এখন আর সেখানে আছে কি না জানি না।'

'কী বলল ফিরদৌস?'

'ফিরদৌস বলছে সে টাকাটা বটুকবাবুর হাতে জমা দিয়েছে। সহদেব এবং জামিল ছাড়াও তাকে ব্যাগ নিয়ে বটুকবাবুর আপিসে ঢুকতে কুমুদিনী অফিসের অনেকে দেখেছে। পরে খালি ব্যাগ নিয়ে বটুকবাবুর আপিস থেকে বেরিয়ে যেতেও তাকে অনেকে দেখেছে। ব্যাগের চেন খোলা ছিল তাই সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন ব্যাগটা যে ফাঁকা ছিল সেটা সকলের চোখে পড়ার কথা।'

'তাহলে টাকাটা গেল কোথায়?'

'ফিরদৌস খুব জোর দিয়ে বলছে টাকাটা বটুকবাবু মেরে দিয়েছেন। কুমুদিনীর অফিস পুলিশ রেড করে সিল করে দিয়েছে। সম্ভবত আর কখনও কুমুদিনী খুলবে না। এই অবস্থায় কম্পানি থেকে যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই বটুকবাবুর লাভ। ফিরদৌস বলছে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বটুকবাবু এতদিন সৎভাবে ব্যবসা করে এসেছেন। এখন তো আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তাই বটুকবাবুরও আর সৎ থাকার দরকার নেই।'

'হুঁ।' জাহাঙ্গির খান অন্যমনস্কভাবে বলল। সে গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে।

'আর একটা কথা। আপনি তো বলেননি আপনি কুড়ি কোটি টাকা ডলারে দিয়ে ছিলেন?' আদিত্য সতর্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'বলার দরকার মনে করিনি।' জাহাঙ্গির খান খানিকটা আক্রমণাত্মকভাবে বলল। কোণঠাসা বেড়াল যেমন হঠাৎ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

তার প্রতিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আদিত্য বলল, 'ফিরদৌস বলছে, টাকাটা ডলারে চাওয়া হয়েছিল যাতে ওটা বহন করে নিয়ে যেতে বটুকবাবুর সুবিধে হয়। ফিরদৌসের মতে, টাকাটা পাবার পর ওটা বহন করে বটুকবাবু অন্য জায়গায় নিয়ে গেছেন।'

জাহাঙ্গির খান অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। আদিত্য ধীরে ধীরে বলল, 'আমার আর কিছু রিপোর্ট করার নেই।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আমি আর আপনার কেসটার মধ্যে থাকতে চাই না। আপনি আমাকে রিলিজ করে দিন। যে টাকাটা আমি অ্যাডভান্স হিসেবে নিয়েছিলাম সেটার হিসেব নিয়ে এসেছি। যে টাকাটা বেঁচেছে সেটা আপনি ফেরত পাবেন।'

'আপনাকে কিছু ফেরত দিতে হবে না। কোনও হিসেব দেবারও দরকার নেই। ধরে নিন ওই টাকাটা পুরোটাই আপনার পারিশ্রমিক এবং খরচপাতি।' এতক্ষণে জাহাঙ্গির খানের গলার আওয়াজ শোনা গেল। 'আমারও মনে হয় আপনার আর এই কেসের মধ্যে থাকার দরকার নেই। আপনি যেটুকু জানালেন সেটুকু আমার খুব কাজে লাগবে। বাকিটা আমি নিজেই সামলে নেব।'

ফেরার পথে আবার তুমুল বৃষ্টি। একে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে আলো নেই, তার ওপর অবিশ্রাম বৃষ্টির ফলে হেডলাইটের আলোতেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার পুরোটাই আন্দাজে চালাচ্ছে। আদিত্যর খুব ভয় করছিল। একটাই সান্ত্বনা, রাস্তায় গাড়ি প্রায় নেই। বিরাটিতে পৌঁছে বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমল। গাড়ি যখন এয়ারপোর্টের কাছে পৌঁছেচে, আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। সুপর্ণ ফোন করেছে।

'কোথায় আছিস এখন?'

'এয়ারপোর্টের কাছাকাছি রয়েছি। বাড়ি ফিরছি।'

'শোন। তুই বলেছিলি না আমার ইনভেস্টিগেটারদের সুপারভাইজার সোমনাথ গুঁই-এর সঙ্গে কী একটা কম্পানি নিয়ে কথা বলতে চাস। সোমনাথ আমার বাড়িতে এসে আটকে পড়েছে। বৃষ্টির জন্যে ট্রেন বন্ধ তাই ফিরতে পারছে না। তুই কি আমার বাড়িতে আসতে পারবি? তাহলে সোমনাথের সঙ্গে কথা হতে পারে। দরকার হলে আমি গাড়িও পাঠাতে পারি। এলে রাত্তিরে খেয়ে যাবি। থেকেও যেতে পারিস। জানিস তো মা চলে যাবার পর থেকে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে আছে। আসলে তোর সঙ্গে একটু আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে। গৌতম বা অমিতাভ সংসারী লোক। ওদের তো এইভাবে বলা যায় না। তুই একমাত্র ঝাড়া হাত-পা। আসবি? চলে আয় না?'

আদিত্য ভাবছিল। যদিও কেসটা থেকে সে ফরমালি মুক্তি পেয়ে গেছে তবু কিছু কৌতূহল রয়ে গেল। তাছাড়া আদিত্যর মন বলছে, কুমুদিনী বিত্ত নিগমের রহস্য থেকে তার এখনই মুক্তি ঘটবে না। সে বলল, 'ঠিক আছে। আমি চলে আসছি। তোর বাড়ির ডিরেকশনটা একবার বল। অনেকদিন যাইনি তো। এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়িটা চিনতে ভুল হতে পারে।'

ঘন্টাখানেক পরে যখন আদিত্য সুপর্ণর দোতলার বসার ঘরে গুছিয়ে বসেছে তখন বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে।

'বৃষ্টির এই এক বিপদ। খিচুড়ি বসালেই বৃষ্টি থেমে যাবে। ঠাকুরকে এত করে বলে খিচুড়ি বসালাম। বৃষ্টি থেমে গেলে আর খিচুড়ি খেয়ে মজা কোথায়?' সুপর্ণ বলছিল।

'এখানে তুই ঠাকুর পাস কোথায়? তুই তো নমাসে-ছমাসে আসিস।' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের পুরোনো ঠাকুর এই পাড়াতেই থাকে। অন্য বাড়িতে রান্না করে। তবে আমরা এলে আমাদের রান্নাটাও করে দেয়। এখন যেমন চা করে দিতে বলেছি।'

'তোর বউ-বাচ্চারা দেশে আসে না?'

'কম আসে। আমারও খুব বেশি আসা হতো না, এই কাজটার জন্য এখন বছরে দুবার করে আসতে হয়।'

'তোর ছেলেরা বাঙলা বলতে পারে?'

'আগে পারত। আগে মানে যখন স্কুলে যেতে শুরু করেনি তখন। এখন আর বাঙলা বলতে চায় না। আমরা বাঙলা বললে ইংরিজিতে জবাব দেয়।'

'আচ্ছা, অ্যামেরিকানরা আমাদের, মানে ভারতীয়দের সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখে? ব্রিটিশরা অনেকে রাখে আমি জানি। অনেকদিন আমাদের শাসন করেছিল তো। কিন্তু অ্যামেরিকানরা?'

'আগে অ্যামেরিকানরা ভারতীয়দের সম্বন্ধে বেশ কম জানত। এ-ব্যাপারে আমার নিজেরই একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে। এটা অনেক বছর আগেকার কথা। আমি তখন সদ্য মার্কিন মুলুকে পি এইচ ডি করতে গেছি। যে বাড়িটায় থাকতাম সেটা ইউনিভার্সিটিরই বাড়ি, এক মাঝবয়েসি মহিলা সেটা দেখাশোনা করেন। একদিন আমাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভারতীয় তো বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি ভারতের কোন অঞ্চল থেকে আসছ? আমি বেঙ্গল থেকে আসছি শুনে ভদ্রমহিলা আঁতকে উঠে বললেন, কিন্তু বেঙ্গলিরা তো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এবার আমার আঁতকে ওঠার পালা। সবে মাস তিনেক হলো দেশ থেকে এসেছি। এর মধ্যে বাঙালি জাতটাই বিলুপ্ত হয়ে গেল? আমি সাধ্যমত প্রতিবাদ জানালাম, কিন্তু ভদ্রমহিলা শুনবেন কেন? তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোথাও পড়েছেন বেঙ্গলিরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর

রহস্যটা পরিষ্কার হল। ভদ্রমহিলা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে বাঙালিদের গুলিয়ে ফেলেছেন। আজকাল কিন্তু এরকম অজ্ঞানতা আর নেই।'

আদিত্য হোহো করে হাসছিল। হাসি থামিয়ে বলল, গল্পে গল্পে আসল কাজটাই ভুলে গেছি। তোর সেই ইনভেস্টিগেটরদের সুপারভাইজার ছেলেটি কোথায়? সোমনাথ না কী যেন নাম বলছিলি? তার সঙ্গে তো কথা বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সোমনাথ। ওকে নিচে একটা ঘর দিয়েছি। রাত্তিরে ওখানে থেকে যাবে। ও এখন সেখানে বসে ওর ল্যাপটপে ডেটা ট্যাবুলেট করছে। দাঁড়া ওকে ডাকছি।'

বসার ঘরের সংলগ্ন একটা ভেতরের বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে একতলার উঠোনটা দেখা যায়। উঠোনে কিছু অযত্নলালিত গাছ নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বেড়ে উঠেছে। দুএকজন দুচারটে ফুলও ফুটিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৃষ্ণকলি গাছের কেরামতি আলাদা করে চোখে পড়ে। একই শরীরে নানা রঙের ফুল ফুটিয়েছে সে। সুপর্ণ বারান্দায় বেরিয়ে গলা তুলে সোমনাথকে ডাকল। তার সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যও বেরিয়ে এসেছে। সাবেকি বাড়ির ভেতরটা দেখতে তার খুব ভাল লাগে। উঠোন, ছবি-আঁকা রঙিন কাঁচের জানলা, ঘুলঘুলি। এই বাড়িটা একেবারে বদলায়নি। তার কলেজ জীবনে যেমন ছিল প্রায় তেমনই রয়ে গেছে।

সোমনাথ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। 'ডাকছেন স্যার?' সে সুপর্ণকে বলল।

'হ্যাঁ, একটু এই ঘরে এস। আমার বন্ধু আদিত্য মজুমদার তোমাকে দু'একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবে।'

ঠাকুর চা দিয়ে গেছে। আদা দেওয়া দুধ-চিনি মেশানো কড়া চা। চুমুক দিয়ে আদিত্যর ভালই লাগল। চায়ে দ্বিতীয় চুমুকটা দিয়ে সে সোমনাথকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো এখানকার ইনফরমাল ফিনান্স কম্পানিগুলো সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন, তো একটা বিশেষ কম্পানি, নাম কুমুদিনী বিত্ত নিগম, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন?'

'কুমুদিনী? নামটা চেনা লাগছে। আমাদের সার্ভেতে এই কম্পানিটা ছিল। সার্ভেতে যা পাওয়া গিয়েছিল আমার ল্যাপটপে নোট করা আছে। আমি নিচ থেকে ল্যাপটপটা নিয়ে আসি?'

সোমনাথ নিচ থেকে ল্যাপটপ আনতে গেল। আদিত্য সুপর্ণকে বলল, 'এই কম্পানিগুলো তোদের ঠিকঠাক তথ্য দেয়? এদের তো অনেক দুনম্বরি ব্যাপার আছে।'

'সোজাসুজি দেয় না। সাধারণত কম্পানির কোনও কর্মচারীকে চুপিচুপি ধরতে হয়। কিছু টাকা কবুল করতে হয়। মুচলেখা দিতে হয় যে কর্মচারীটির নাম কখনই প্রকাশ করা হবে না। এত সব কাঠখড় পোড়ানোর পর কর্মচারীটি মুখ খোলে। কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর এরা দেয় না। নিজের কম্পানি সম্পর্কে যেটুকু জানে নিজের মতো করে বলে যায়। এইরকম কয়েকটা কম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার পর আমরা অর্থনৈতিক আবহাওয়াটা সম্বন্ধে একটা গল্প খাড়া করি। একে বলা হয় এথনোগ্রাফিক স্টাডি। এতে বিশেষ কোনও কম্পানির নামের বা কাজের উল্লেখ থাকে না।'

'কুমুদিনী বিত্ত নিগম সম্বন্ধে আপনি ঠিক কী জানতে চান?' সোমনাথ ল্যাপটপ নিয়ে ফিরে এসেছে।

'যেটুকু জানা যায় সবটাই জানতে চাই। এরা কোথায় টাকা ইনভেস্ট করে, কোথা থেকে টাকা তোলে, এদের ব্যবসার সাইজ কত, সবই জানতে পারলে ভাল হয়।'

সোমনাথ ল্যাপটপ খুলে কোনও একটা তথ্যের ফাইলে ঢুকে খুঁজতে শুরু করেছে। একটু পরে সে বলল, 'কুমুদিনী সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু আমাদের ফাইলে নেই। রেসপন্ডেন্ট, অর্থাৎ কুমুদিনীর যে কর্মচারীটির সঙ্গে আমাদের ইনভেস্টিগেটরের কথা হয়েছে, সে বলেছে খুব বেশি তথ্য কর্মচারীদের জানতে দেওয়া হতো না। সে যতদূর জানে, বর্তমানে তিনটে বড় কম্পানিকে কুমুদিনী টাকা ধার দিয়েছে। একটা সিনেমা কম্পানি, নাম 'নিউ এজ মুভিজ', একটা নাইট ক্লাব, নাম 'বুটলেগার', আর একটা আলুর কোল্ড স্টোরেজ, নাম 'মাতঙ্গিনী হিমঘর'। এই তিনটে জায়গায় এই মুহূর্তে কুমুদিনীর টাকা খাটছে। কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে রেসপন্ডেন্ট জানে না। কী সুদের হারে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটাও সে জানে না। আসলে ওপর ওপর

কুমুদিনীর ব্যবসা হল শেয়ার ব্রোকিং। আমাদের রেসপনডেন্ট সেই ব্যবসাটাই মূলত দেখাশোনা করে। যে নামগুলো সে বলেছে সেগুলো সে আপিসে কানাঘুষোয় শুনেছে। তাই নামগুলো সম্বন্ধে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কুমুদিনী এক সঙ্গে ম্যাক্সিমাম দু-তিনটে কম্পানিকে ধার দেয়। তার বেশি দেয় না।'

সোমনাথ থামল। সে ল্যাপটপে মুখ ডুবিয়ে আরও কীসব খুঁজছে। আদিত্য বলল, 'আচ্ছা, কুমুদিনী কোথা থেকে টাকা তোলে, মানে কুমুদিনীর ফাইন্যান্সার কারা, সেটা কি জানা গেছে?'

'সেটাই খুঁজছি। এই ডেটাটা অন্য জায়গায় স্টোর করা আছে।' সোমনাথ কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে বলল।

'তুই রাত্তিরে থেকে যাচ্ছিস তো?' সুপর্ণ আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, থেকেই যাব ভাবছি। তুই ড্রাইভারকে ছেড়ে দে।' আদিত্য একটু চিন্তা করে বলল। তারপর সামান্য থেমে বলল, 'তোর মনে আছে কলেজে পড়ার সময় একবার তোর বাড়িতে রাত্তিরে ছিলাম?'

'খুব মনে আছে। খুব মনে আছে। সেদিনও বৃষ্টি পড়ছিল। এইরকম নয়, এর থেকে আরও অনেক বেশি। জগুবাবুর বাজারে বুক সমান জল। বারবার মেসোমশাই ফোন করছিলেন। গাড়ি পাঠাতে চাইছিলেন। তুই বললি, জগুবাবুর বাজার পেরোতে গেলে গাড়ি ডুবে যাবে। শেষে মেসোমশাই তোকে এখানে থাকার পারমিশান দিলেন। ওফ! প্রচণ্ড মজা হয়েছিল।'

'টাইম ফ্লাইজ। কতদিন কেটে গেল!' আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বলল।

'সেই রাত্তিরে ডিনারে তোকে মা কী খাইয়েছিল সেটাও মনে আছে।'

'আমারও মনে আছে। চিকেন আর হাঁসের ডিমের ডালনা।' আদিত্য স্বপ্নালু গলায় বলল।

'অদ্ভুত কম্বিনেশান। আসলে বাড়িতে যা ছিল তাই দিয়ে ডিনার। বাজারেও তো যাওয়া যাচ্ছিল না।'

'তবে মাসিমার রান্নাটা সেদিন অমৃত লেগেছিল। মাসিমা সেদিন নিজের হাতে রান্না করেছিলেন।'

'মা রান্নাটা সত্যিই ভাল করত। তবে শেষের দিকে আর পারত না।'

'খুব বেশি পেলাম না স্যার।' সোমনাথ ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে বলল। 'এখানে দুটো কম্পানির নাম পাচ্ছি যারা বর্তমানে কুমুদিনীকে টাকা ধার দিয়েছে। প্রথমটা 'মুখার্জি বিল্ডার্স', এরা বিল্ডিং মেটিরিয়ালসের সাপ্লায়ার। দ্বিতীয়টা 'সুরজমল ট্রেডিং কম্পানি', এদের এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা। আরও নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমাদের রেসপনডেন্ট বলতে পারেনি। আসলে যারা ধার নিয়েছে তাদের ব্যবসাগুলো ততটা বেআইনি নয়, তাই তারা তাদের নাম লুকোবারও তেমন চেষ্টা করেনি। কিন্তু যারা কুমুদিনীকে টাকা ধার দিচ্ছে, তাদের সেই টাকার একটা বড় অংশ কালো টাকা। তাই তাদের নামগুলো সহজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবি সোমনাথকে?'

আদিত্য মাথা নেড়ে না বলল। 'তাহলে সোমনাথ তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। কাল তো তোমাকে খুব ভোরে উঠে ট্রেন ধরতে হবে। ঠাকুরকে বল তোমাকে খেতে দিয়ে দিতে।' সুপর্ণ সোমনাথকে তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিয়ে আবার পুরোনো দিনের আড্ডায় ফিরে আসতে চায়।

৪

কয়েকটা দিন শুয়ে-বসে কেটে গেল। কুমুদিনীর কেস থেকে অব্যাহতি মিলেছে, হাতে অন্য কোনও কাজও নেই, আদিত্য টুকটাক বই পড়ছে, গান শুনছে, ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে বউবাজারে তার আপিস ঘরেও গিয়ে বসছে। কোনও মক্কেল নেই। আলস্যের একটা তীব্র নেশা আছে। আস্তে আস্তে সেই নেশাটা আদিত্যকে গ্রাস করে ফেলছে। তবে মনের গভীরে একটা অসন্তোষ, একটা অপূর্ণতা তাকে মাঝেমাঝেই পীড়া দেয়। কুমুদিনীর রহস্যটা অজানা রয়ে গেল।

আর একটা অস্বস্তি অবশ্য আছে। আদিত্য তাকে জোর করে মনের এককোণে সরিয়ে রেখেছে। অস্বস্তিটা বাহ্যত জাগতিক, টাকা-পয়সার। এখন তার সেভিংস অ্যাকাউন্টে যা আছে তাই দিয়ে টেনেটুনে আর সাত-আট মাস চলবে। তারপর কী হবে? এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও আয় না হয়, তাহলে? আদিত্য ভেবে রেখেছে কী করবে। তার কয়েকটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে। তখন সেগুলো ভাঙতে হবে। ফিক্সড ডিপোজিটগুলো ভাঙলে আরও বছর দুয়েক চলে যাবে। অতএব চিন্তা কীসের? আর দু-বছর আট মাস পরে কী হবে এখন থেকে ভেবে লাভ নেই। আদিত্য অত দীর্ঘমেয়াদে প্ল্যান করতে পারে না। তবু একটা অস্বস্তি।

অস্বস্তির আসল কারণটা আদিত্য জানে। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেয়ার সঙ্গে সে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে। বস্তুত এ-ব্যাপারে আর তার নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কেয়ার দিক থেকেও একটা পাকাপাকি সম্পর্কের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। তাদের দুজনেরই বয়েস হয়েছে। এখন না হলে আর কবে? কিন্তু এই প্রবল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে আদিত্য কী করে একটা কমিটমেন্টে যাবে? কেয়ার অবশ্য খুব সিকিওর্ড একটা ইনকাম আছে। সে অনেকবার আদিত্যকে ইঙ্গিত দিয়েছে, সেই সিকিওর্ড ইনকামের ওপর ভরসা করে তারা অনায়াসে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু কেয়ার আয়ের ওপর নির্ভর করে তার দিন চলবে এটা ভাবলেই আদিত্যর জমিদারি পৌরুষ বিদ্রোহ করে ওঠে। তাছাড়া এটাও ঠিক যে এখনকার এই দায়িত্বহীন, বোহেমিয়ান, স্বাধীন জীবনটা আদিত্য বেশ উপভোগ করে।

দক্ষিণ বাংলায় এখনও দু-এক পশলা ঢাললেও, উত্তর বাংলায় আর বৃষ্টি নেই। কেয়ারা খুব বেড়াচ্ছে। রোজ ফোন করে। কত নতুন পাখি দেখল, পশু দেখল, ফুল দেখল, পাহাড়, জঙ্গল। কেয়ার মধ্যে একটা সরল ছেলেমানুষ আছে। জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে সেই ছেলেমানুষটা মুক্তি পেয়েছে। সব গল্প তার আদিত্যকে বলা চাই। কাল বিকেলের ফ্লাইটে কেয়ারা ফিরে আসছে।

বিকেলে হঠাৎ বিমল এসে হাজির। 'আপনার খবরটা জোগাড় করতে একটু দেরি হয়ে গেল স্যার। আপনিও তো আর ফোন করেননি, তাই ভাবছিলাম কী হলো?'

আদিত্য ভাবল, রোহিত ধামানি সম্পর্কিত তথ্য যে তার আর কাজে লাগবে না এই দুঃসংবাদটা পরে বিমলকে দেবে। সে মুখে বলল, ''তোমার বাড়ির খবর ঠিক আছে?'

'মোটামুটি ঠিক আছে স্যার।' বিমল একটু লাজুকভাবে হাসল।

'তোমার বউ আর এখন ছেলের কাছে দিল্লি যেতে চাইছে না?'

'না স্যার। এখন আর বায়না করছে না। আসলে কি হয়েছে স্যার, ছেলে নিজের রোজগারের টাকায় তার মাকে একটা মোবাইল কিনে পাঠিয়েছে। ওই অন লাইনে লোকে যেমন কিনে পাঠায়। তা আগে তো আমার বউ-এর নিজস্ব কোনও মোবাইল ছিল না, এখন নিজের একটা মোবাইল হতে মহাখুশি। তার ওপর আবার ছেলে তার রোজগারের টাকায় কিনে দিয়েছে। রোজ রাত্তিরে ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তাই এখন আর দিল্লি যাবার বায়না করছে না।'

'বাঃ, চমৎকার।' আদিত্য সত্যিই খুশি হয়েছে। সে একটু থেমে বলল, 'এবার বল, কী জানতে পারলে।'

'আপনি রোহিত ধামানির সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন স্যার। আমি যেটুকু জানতে পেরেছি আপনাকে বলছি। টালিগঞ্জ পাড়ায় চেনা কাউকে বার করতে গিয়েই দেরিটা হয়ে গেল।'

'সে কী! তোমার মতো নেটওয়ার্ক কলকাতায় কজনের আছে? তোমার দেরি হয়ে গেল?' আদিত্য মজা করে বলল।

'স্যার, আমার অনেক চেনাশোনা ঠিকই। তবে ফিলিমের লাইনে ঠিক চেনাশোনা নেই।'

'তাহলে কী করলে?'

'চেনাশোনা বার করে ফেললাম স্যার। ওটাই বার করতে গিয়ে দেরি হল।'

'বেশ, বেশ। আগে নিচে গিয়ে বলরামকে একটু চা আনতে বল। আর বিস্কুট। আজকাল আবার আমাদের এখানে তোমার ফেবারিট প্রজাপতি বিস্কুটটা পাওয়া যাচ্ছে না। তার বদলে একটা গোল বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে

নোনতা-মিষ্টি মেশানো। আমার তো ভালই লাগল। ওটাই চারটে আনতে বল।'

মিনিট কুড়ি বাদে চায়ের ভাঁড়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আদিত্য সিগারেট ধরাল। তারপর বিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার বল।'

'আমার ছোট শালা বলল তার এক বন্ধু আছে যে বন্ধুর এক কাকা টালিগঞ্জের সিনেমা স্টুডিয়োর বাইরে একটা চায়ের দোকান চালায়। রাস্তার দোকান হলে কী হবে, তাবড় তাবড় হিরো-হিরোইন নাকি ওই দোকানের চা খেয়ে বশ হয়ে আছে। সিনেমা পাড়ায় গিয়ে কালীশংকরের বা সেরেফ কালীদার চায়ের দোকান বললে যে-কেউ দেখিয়ে দেবে। শালার বন্ধু বলল, সিনেমা পাড়ার খবর কাকার মতো আর কেউ রাখে না। বড় বড় কাগজের রিপোর্টাররা কাকার কাছে কেচ্ছা খবরের খোঁজে আসে। তবে কাকা লোকটা যেমন হাড়-কেপ্পন তেমনি শয়তান। পয়সা ছাড়া কোনও খবর পেট থেকে বার করে না। শালার বন্ধু বলল, দ্যাখো, যদি বুড়োকে পটাতে পার। তবে কাজটা সহজ হয়।'

বিমল একটু থেমে বিস্কুটে কামড় বসাল। একঢোঁক চা খেল। তারপর ফের বলতে শুরু করল।

'ছায়াছবি স্টুডিও খুঁজে নিতে অসুবিধে হলো না। গিয়ে শুনলাম ওখানে কিছুদিন আগেও তিন-চারটে ছোট ছোট স্টুডিও ছিল আর অনেকখানি ফাঁকা জমি। সেই সব একসঙ্গে নিয়ে ছায়াছবি স্টুডিও তৈরি হয়েছে। বিরাট স্টুডিও। এখানে শুধু যে শুটিং হয় তাই নয়, সিনেমা তৈরির অন্য সমস্ত কাজও হয়। আমার ভাগ্য ভাল, কালীদার চায়ের দোকানটা ছায়াছবি স্টুডিও থেকে খুব দূরে নয়। লোকে বলল, কিছুদিন আগে, যখন ছায়াছবি স্টুডিও তৈরি হয়নি, ওই ছোট ছোট স্টুডিওগুলো ধুঁকছিল, তখন কালীদার চায়ের দোকানের অবস্থাও টাইট হয়ে গিয়েছিল। এখন ছায়াছবি স্টুডিও তৈরি হবার ফলে কালীদার ভাগ্য খুলে গেছে। অবশ্য কালীদার একার নয়। আশেপাশে যত দোকান ছিল, সকলের।'

বিমল এক চুমুকে ভাঁড়ের বাকি চা-টা শেষ করে আর একটা বিস্কুটে কামড় লাগাল। আদিত্য বলল, 'দ্যাখো তো, কেটলিতে বোধহয় আর একটু চা আছে। থাকলে আমাকেও একটু দাও, তুমিও নাও। কেটলির অবশিষ্ট চায়ে দুটো ভাঁড় পুরো হয়ে গেল। চা-টা অবশ্য একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আদিত্য চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'তারপর?'

'তারপর কালীশংকরবাবুর কাছে গিয়ে ছোট শালার বন্ধুর নাম করে বললাম, আমি সরিতের বন্ধু। কাজের খোঁজে এপাড়ায় এসেছি। যে কোনও কাজ। তা সরিৎ বলল আপনার সঙ্গে দেখা করলে কাজ একটা জুটে যাবে। বুড়ো মহা ঠ্যাঁটা। বলল, সরিৎ আবার কে? আমি কোনও সরিৎ-টরিতকে চিনি না। আমি বললাম, আপনার ভাইপো সরিৎ। ওই যে বেনেপুকুরে থাকে। ট্র্যাম কম্পানিতে চাকরি করে। তখন বুড়ো বলল, ও পল্টুর কথা বলছ? হ্যাঁ ওর বাবা আমার সেজদা হয়। বহুদিন তো ওরা আমার খোঁজখবর নেয় না। তা এতদিন পরে হঠাৎ তোমাকে এখানে কী মতলবে পাঠাল? বুড়োকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালাম যে আমি সত্যিই কোনও মতলবে আসিনি, শুধু কাজের খোঁজে এসেছি। শুনেছি এখানে বিরাট খরচ করে 'ফেরারি' ছবির শুটিং হচ্ছে। তাই মনে হল ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে ওদের নিশ্চয় লোকের দরকার হবে। সরিৎ মানে পল্টু বলল আপনি একটু বলে দিলেই ওখানে কাজ পেয়ে যাব। বুড়ো বলল, আগে দেখি তুমি কেমন কাজের লোক। আমার দোকানে দুদিন কাজ করে দেখাও তো। আমি কিন্তু টাকা-পয়সা দিতে পারব না। তবে দুপুরের খাওয়াটা পাবে। যদি ভাল করে কাজ কর, তাহলে 'ফেরারি' ছবির শুটিং-এর ফ্লোরে কাজ করার জন্য তোমার নামটা সুপারিশ করে দেব। আমি বললে নিশ্চয় তোমাকে ওরা নিয়ে নেবে।'

'লোকটা তোমাকে বিনি পয়সায় খাটিয়ে নিল?'

'কী করব স্যার, বুড়োটার পেট থেকে কথা বার করার জন্যে ওর কথায় রাজি হয়ে গেলাম। চায়ের দোকানে খুব খাটনি, রাত্তিরে আবার নাইট গার্ডের কাজ। ভাগ্যিস রাত্তিরটা খানিকটা ঘুমোতে পারি, না হলে দুটোকে একসঙ্গে সামলাতে পারতাম না। হেমন্ত বলে একটা ছেলে, সেও ওই চায়ের দোকানে কাজ করে, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। হেমন্ত বলল, তুমি তো আচ্ছা উজবুক। বুঝতে পারছ না তোমাকে বিনি

পয়সায় দুদিন খাটিয়ে নিয়ে তারপর তাড়িয়ে দেবে। আসলে এই দোকানে দামু বলে আর একজন কাজ করে। সে দেশে গেছে। তাই তার জায়গায় বুড়ো তোমাকে খাটিয়ে নিচ্ছে। আমি বললাম, সবই বুঝি ভাই। তবু আশায় আশায় খেটে যাচ্ছি। যদি একটা কাজ পাওয়া যায়।'

'এইভাবে কদিন কাজ করলে?'

'তিনদিন স্যার। চারদিনের দিন দামু ফিরে এল। বুড়ো আমাকে বলল, তোমাকে আর লাগবে না। তুমি অন্য জায়গায় কাজ দ্যাখো। আমার লোক ফিরে এসেছে। তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব কেন? আমি বললাম, সে কী! আপনি যে বললেন আপনি বলে দিলে 'ফেরারি' ছবির সেটে ফাই-ফরমাস খাটার জন্য কাজ পেয়ে পাব। তাই তো ঘাড়-মুখ গুঁজে কটা দিন আপনার দোকানে কাজ করলাম। আপনি আমার জন্যে একটু বলে দেবেন না? বুড়ো বলল, 'ফেরারি' ছবির কাজ এখন হচ্ছে নাকি? রোহিত ধামানির হিরের ব্যবসায় কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে। অনেক টাকা দরকার। তাই সে এখন সিনেমায় টাকা ঢালতে পারছে না। ফরেনে শুটিং বন্ধ। আমি বললাম, আমি তো ফরেনে যেতে চাইছি না। এখানে ছায়াছবি স্টুডিয়োতে ওদের যে শুটিংটা চলছে সেখানে কাজ পেলেই হবে। বুড়ো বলল, ছায়াছবিতে ওদের কচু শুটিং চলছে। ওদের প্রোডাকশান ম্যানেজার, বাচ্চা একটা ছেলে, নাম রনি ঘোষাল, বলা নেই কওয়া নেই পাঁচদিন ধরে বেপাত্তা। কেউ জানে না সে কোথায়। তাই শুটিং বন্ধ। ডিরেক্টারের মাথায় হাত। ওরা এখন তোমায় ঘন্টা কাজ দেবে। তুমি অন্য জায়গায় দ্যাখো। আমি গলাটাকে করুণ করে বললাম, 'ফেরারি' না হোক, ছায়াছবি স্টুডিওতে তো আরও কত শুটিং চলছে। কোথাও একটু বলে দিন না। আপনার তো কত চেনা। বুড়ো বলল, চেনা আছে বলেই তো জানি। এ-চত্বরে কোথাও কাজ খালি নেই। তুমি অন্য কোথাও দ্যাখো। কী আর করি? বুড়োকে বাছাবাছা দু-চারটে গালাগাল দিয়ে চলে এলাম। গালাগালগুলো বুড়ো গায়েও মাখল না। আসার সময় হেমন্ত বলল, বুড়ো আগে থেকেই জানত 'ফেরারি'র শুটিং এখন বন্ধ। ওখানে কাজ পাওয়া যাবে না। তোমাকে মিথ্যে আশা দিয়ে খাটিয়ে নিল। আমি কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলুম।'

বিমল থামল। ঠাণ্ডা চা-টা এক চুমুকে খেয়ে শার্টের আস্তিনে মুখ মুছল।

আদিত্য বলল, 'তোমার কথা থেকে তিনটে জিনিস জানতে পারলাম। এক, রোহিত ধামানির আসল ব্যবসাটা হিরের। দুই, সে ব্যবসাতে কোনও কারণে অনেক টাকার দরকার পড়েছে। আর তিন, 'ফেরারি'র প্রোডাকশান ম্যানেজার রনি ঘোষাল চার-পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। কিন্তু বিমল, আসল কথাটা হল, এই তথ্যগুলো আর আমার কোনও কাজে লাগবে না। যে কাজের জন্য এগুলো দরকার ছিল সেই কাজটা থেকে আমার মক্কেল আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। তুমি এই দু-হাজার টাকা ধর। এর বেশি দেবার সামর্থ্য এখন আমার নেই।'

৫

যেসব জিনিস আদিত্য পছন্দ করে না, ক্রম অনুযায়ী তার একটা তালিকা করলে ভোরে ঘুম থেকে ওঠাটা সেই তালিকার একেবারে ওপরের দিকে থাকবে। কোনও কাজ আছে বলে নিজের থেকে উঠে পড়াটা তবু সহনীয়, কিন্তু টেলিফোনের বেমক্কা শব্দে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো খারাপ জিনিস, আদিত্যর মতে, খুব কমই আছে। সেই কারণে আদিত্য কিছুদিন রাত্তিরে শোবার আগে ফোনটা সুইচ অফ করে রাখত। দুর্ভাগ্যবশত, ক্রমশ আদিত্য বুঝতে পারল এই অভ্যাস তার গোয়েন্দা জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। গোয়েন্দাদের যে অসুবিধাজনক সময়ে, বলতে গেলে যে কোনও সময়েই, ফোন আসতে পারে, এই সত্যটা আদিত্য এখন মেনে নিয়েছে। তাই আজকাল ফোনটা সে চব্বিশ ঘন্টা খোলা রাখে।

আজ ভোরবেলা ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল। আদিত্য উঠে ফোনটা ধরার আগেই সেটা থেমে গেল। আদিত্য দেখল গৌতম ফোন করেছে। ঘড়িতে পৌনে ছটা। গৌতমের ভোরে উঠে ব্যায়াম করার অভ্যাস

আছে, আদিত্য জানে। কিন্তু এটাও জানে যে নিজে ভোরে উঠে আদিত্যকে ঘুম থেকে তুলে দেবার মতো চ্যাংড়ামি করার বয়েস বা প্রবণতা গৌতমের আর নেই। তার মানে, কোনও বিশেষ দরকারে গৌতম ফোন করেছে। আদিত্য বাথরুম থেকে ঘুরে এসে গৌতমের নম্বরটা লাগাল।

'সরি, বিশেষ দরকারে তোকে এই সাতসকালে ফোন করতে বাধ্য হলাম।' গৌতম সামান্য হাঁপাচ্ছে। নিশ্চয় সিট-আপ করছিল।

'তুই খেজুর করার জন্যে ভোরবেলা ফোন করিসনি এটা বুঝতে পেরেছি। বল কী ব্যাপার।' আদিত্য ঈষৎ ঘুম-জড়ানো গলায় বলল।

'শোন। কয়েকদিন আগে তুই জ্যাকারিয়া স্ট্রিটের একটা হোটেলে ফিরদৌস রহমান বলে কারও সঙ্গে দেখা করেছিলি?'

'করেছিলাম তো। কেন? তার কী হয়েছে?'

'লোকটা কাল রাত্তিরে খুন হয়েছে। বলা যায়, নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। হি ওয়াজ ব্রুটালি টরচার্ড বিফোর হি ওয়াজ কিল্ড। দুটো হাতে গুলি লেগেছে। দুটো পায়েও গুলি লেগেছে। আর একটা গুলি ওর বুকের বাঁদিক দিয়ে হার্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। মনে হয় তাতেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। আমি অবশ্য ডেডবডি দেখিনি। যা রিপোর্ট শুনলাম তাই বলছি।'

আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এতটাই যে তার মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছিল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌতম বলল, 'আদিত্য, শুনতে পাচ্ছিস?'

'শুনতে পাচ্ছি। তারপর বল।' আদিত্য খুব ম্রিয়মাণ গলায় বলল।

'তোর গলাটা এরকম শোনাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

'আমি লোকটার স্ত্রীকে এবং পিসিকে একরকম কথা দিয়েছিলাম যে আমি ওকে রক্ষা করব। কী যে আফশোস হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না।' আদিত্যর গলাটা মানসিক অবসাদগ্রস্ত রুগির মতো শোনাল। 'তোরা জানলি কী করে আমি ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম?'

'সেলিম বলে লোকটার এক অনুচর আছে। পুলিশকে সে বলেছে কয়েকদিন আগে আদিত্য মজুমদার বলে একজন ভদ্রলোককে তার আমহার্স্ট স্ট্রিটের মেস থেকে এই সিতারা হোটেলে সে নিয়ে এসেছিল। ফিরদৌস আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। আদিত্য মজুমদারের যে ডেস্ক্রিপশন সেলিম দিয়েছে তার সঙ্গে তোর চেহারা মিলে যাচ্ছে। তোকে তো পুলিশের অনেকেই চেনে। বিশেষ করে সোমেন বলে যে ছেলেটি এই কেসটা ইনভেস্টিগেট করছে সে তোর বেজায় ভক্ত। সোমেন আমাকে ফোন করেছিল। বলল, স্যার এই কেসটাতে যদি আদিত্যবাবুর একটু হেল্প পাওয়া যায়, খুব ভাল হয়। উনি তো নিশ্চয় কেসটার সম্বন্ধে অলরেডি খানিকটা জানেন। তা তুই কি একটু এই কেসটাতে পুলিশকে সাহায্য করতে পারবি?'

'নিশ্চয়। কেসটা সলভ করার ব্যাপারে আমার তো একটা মরাল দায়িত্ব আছে। আমি কেন সিতারা হোটেলে ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বলছি। তার আগে একটা কথা বল, ফিরদৌস কি সিতারা হোটেলেই খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ। সিতারা হোটেলের চারতলার একটা ঘরে ফিরদৌস খুন হয়েছে। গত পাঁচ সপ্তাহ সে ওই ঘরেই বসবাস করছিল।'

'হুঁ। আমি ওই হোটেলেরই একটা ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমাকে ফিরদৌস বলেছিল সে একটু দূরে কোনও বন্ধুর বাড়িতে আছে। যেখান থেকে তাকে এসকর্ট করে আনতে ওর অনুচরের মিনিট পনের সময় লেগেছিল। আমি ধরে নিয়েছিলাম ফিরদৌস হোটেল থেকে সাত-আট মিনিটের দূরত্বে আছে। ফলে সেখানে গিয়ে ফিরদৌসকে নিয়ে আসতে ওই ছেলেটির পনের মিনিট লেগেছে। এখন বুঝতে পারছি ফিরদৌস হোটেলের ভেতরেই ছিল। শুধু আমাকে ভুল বোঝানোর জন্যে মিনিট পনের দেরিতে এসেছিল।' আদিত্য প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল।

'তুই পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবি?'

'বলছি, শোন। গল্পের গোড়াটা তোর জানা তাই বুঝতে সুবিধে হবে।'

আদিত্যর বলা হয়ে গেলে গৌতম বলল, 'আমি এবার বলি কেন এই সাতসকালে তোকে ফোন করলাম। ফিরদৌস রহমানের বডি এখনও সিতারা হোটেলেই রয়েছে। ইন্সপেক্টার সোমেন মুখুটি, মানে যার কথা তোকে একটু আগে বললাম, অলরেডি দলবল নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেছে। কেউ একজন পুলিশ অফিসার সাতটা নাগাদ তোকে তোর মেস থেকে তুলে নিয়ে সিতারা হোটেলে পৌঁছে দেবে। তুই তৈরি হয়ে নে। আমি বিকেলের দিকে তোকে ফোন করে জেনে নেব কী হল।'

ফোন রেখে দিয়ে আদিত্য দেখল ঘড়িতে সোয়া ছ'টা বেজে গেছে।

কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় একটা পুলিশের জিপ আদিত্যকে তুলে নিল। ড্রাইভারের পাশে বসা অল্পবয়সী উর্দিপরা অফিসারটি আদিত্যকে বলল, 'আমি সাব ইন্সপেক্টার চাকি। আপনাকে সিতারা হোটেলে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েছে। আপনার জন্য ইন্সপেক্টার মুখুটি সিতারা হোটেলে অপেক্ষা করছেন।'

পুলিশের গাড়িটা মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে পৌঁছে ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে গেল। এত ভোরে ট্র্যাফিক জ্যামের একটাই কারণ। পণ্যবাহী ট্রাকগুলো সার বেঁধে শহরে ঢুকছে। আটটার পরে তারা আর ঢুকতে পারবে না। তাই এত তাড়াহুড়ো। পেছনে পুলিশের আর একটা গাড়ি রয়েছে। পুলিশের গাড়ি দু'টো যতক্ষণে ট্রাকের ভিড় ঠেলে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে পৌঁছতে পারল ততক্ষণে কলকাতা শহর ঘুমের ক্লান্তি মুছে ফেলে আর একটা কর্মচঞ্চল দিনের জন্যে তৈরি হয়ে উঠেছে।

'আমি সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখুটি। নাথ এবং ইন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে ঔ-কার আর য-ফলাটাও বাদ দিয়ে আমাকে সবাই সোমেন মুখুটি বলে ডাকে। আপনিও তাই বলবেন। আমি আপনার একজন ভক্ত, আদিত্যবাবু। চন্দ্রলেখা সেনের কেসটার সময় আমি আলিপুরে পোস্টেড ছিলাম। তখন আপনাকে দেখেছি, কিন্তু আলাপ হয়নি।' সোমেন মুখুটি হাসল। আদিত্য আন্দাজ করল সোমেনের বয়েস চল্লিশের এদিক-ওদিক। মেদহীন বেতের মতো শরীর, তবে মাথার চুল অকালে পাতলা হয়ে গেছে। সে বড়রাস্তার ওপরেই আদিত্যর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'আমি আপনাকে সময় মতো এই কেসটার সঙ্গে আমার ইনভলভমেন্টের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলে দেব। ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে আপনার সুবিধে হবে।' আদিত্যও হাসল।

'আমি একবার ওপর ওপর খুনের জায়গাটা দেখে নিয়েছি। এবার আপনার সঙ্গে ভাল করে দেখব।' সোমেন মুখুটি আদিত্যর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

হোটেল সিতারার সামনে কয়েকজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। রিসেপশন ফাঁকা। আদিত্যর মনে পড়ল দু-দিন আগে সে যখন এখানে এসেছিল রিসেপশনে একটা ছেলে বসেছিল। রিসেপশনের ডানদিকে বেঁকে গেলে লিফট। সেদিন তিনতলায় উঠেছিল। আজ চারতলায় যেতে হবে। যে উর্দিপরা পুলিশ অফিসার আদিত্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে লিফটে চারতলার বোতামটা টিপতে টিপতে বলল, 'স্যার পুরো চারতলাটা সিল করে দিয়েছি। পাঁচজন বোর্ডার চারতলায় ছিল, তাদের তিনতলা আর দোতলায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কত নম্বরে ঘটনাটা ঘটেছে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'চারশো বারো নম্বর ঘরে স্যার। এটা একটা সুইট। হোটেলের বেস্ট দু-টো ঘরের একটা।'

চারশো বারো নম্বর ঘর লিফট থেকে নেমে বাঁ দিকে। ঘরের দরজা খোলা। দরজার সামনে দুজন উর্দিপরা বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তারা সোমেন মুখুটিকে দেখে স্যালুট করল।

'বডি কোথায়?' আদিত্য ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল।

'সোফার সামনে শোয়ানো আছে স্যার।'

সুইটটা মোটামুটি বড়। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা ছোট্ট প্যাসেজ, তার ডানদিকে বাথরুম, বাঁ দিকে ওয়ার্ডরোব। আরও ভেতরে ঢুকলে একদিকে শোবার জায়গা। ডবোল খাট, একটা রাইটিং টেবিল, ক্যাবিনেটের ওপর টেলিভিশন, ক্যাবিনেটের মধ্যে রাখা সেফ, একপ্রস্ত ড্রয়ার। অন্যদিকে বসার ব্যবস্থা। সোফাসেট, ঢাউস একটা টেলিভিশন, ল্যাম্পশেড। এক কোণে সাইড টেবিলের ওপর চা-কফি বানিয়ে নেবার সরঞ্জামও রয়েছে। বসার জায়গাটা শোবার জায়গাটার থেকে পর্দা টেনে আলাদা করে দেওয়া যায়।

ফিরদৌসের সাদা চাদর ঢাকা শরীরটা সোফার সামনে কার্পেটের ওপর শোয়ানো ছিল। দুটো পা, দুটো হাতের কব্জি এবং বুকের বাঁদিকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে সাদা চাদরটা লাল হয়ে গেছে। আদিত্য চাদরটা সরিয়ে মৃতদেহের মুখের দিকে তাকাল। সন্দেহ নেই, ফিরদৌস রহমান। কিন্তু তার মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, হাতের এবং পায়ের গুলিগুলো আগে লেগেছিল। হয়ত ফিরদৌসকে যন্ত্রণা দেবার জন্যেই গুলিগুলো করা হয়েছিল। হাতে বা পায়ে গুলি লাগলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে না। আদিত্য অনুমান করল, খুনি ফিরদৌসের কাছ থেকে কোনও গোপন কথা জানতে চেয়েছিল এবং সেটা জানার জন্য ফিরদৌসকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়েছিল। হয়ত গোপন কথাটা জানতে পারার পরে বুকে গুলি করে ফিরদৌসকে মেরে ফেলা হয়।

কার্পেটের ওপরেও অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের ছাপ। সোফা থেকে খানিকটা দূরে একটা জায়গায় অনেকটা রক্ত চাপ বেঁধে আছে। সম্ভবত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ফিরদৌসের শরীরে প্রথম গুলিটা লেগেছিল। আদিত্য আন্দাজ করল, প্রবল যন্ত্রণায় সে মাটিতে বসে পড়েছিল। সম্ভবত মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে খানিকটা এগোবার চেষ্টা করেছিল। এগোবার সময় তাকে আরও কয়েকবার গুলি করা হয়। কার্পেটের ওপর তার প্রমাণ রয়েছে।

চাদরটা পুরো সরিয়ে আদিত্য মৃতদেহটা পরীক্ষা করছিল। খানিকক্ষণ পর সে বলে উঠল, 'দেখুন সোমেনবাবু, খুনির নিশ্চয় ফিরদৌসকে প্রবল যন্ত্রণা দেবার উদ্দেশ্য ছিল। হয়ত কোনও কথা বার করার জন্যে খুনি ফিরদৌসকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। শুধু খুন করার ইচ্ছে থাকলে তো প্রথমেই বুকে গুলি করত।'

'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।' সোমেন নির্দ্বিধায় জানাল।

'তার সঙ্গে এটাও আমার মনে হয় যে খুনি একজন ওস্তাদ বন্দুকবাজ। প্রত্যেকটি গুলি একেবারে লক্ষ্যভেদ করেছে। অর্থাৎ খুনি ঠিক যেখানে গুলিটা লাগাতে চেয়েছিল ঠিক সেখানেই গুলিটা লাগিয়েছে। আচ্ছা, মৃতদেহটা ঠিক কোন পজিশনে ছিল?' আদিত্যর প্রশ্নটা ঘরে পাহারারত পুলিশ অফিসারের উদ্দেশে।

'মাথাটা ছিল বড় সোফাটার ওপর। শরীরটা ছিল চিৎ হয়ে কার্পেটের ওপর। আর ডান হাতটা সোফার পাশে যে সাইড-টেবিলটা আছে সেদিকে বাড়ানো ছিল। কেন বাড়ানো ছিল সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। সাইড টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে একটা রিভলভর ছিল। মনে হয়, চারটে গুলি লাগার পরেও কোনওরকমে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে এসে ফিরদৌস ড্রয়ার খুলে বন্দুকটা বার করার চেষ্টা করেছিল। ড্রয়ার খুলে সে অবশ্য বন্দুকটা বার করতে পারেনি। সম্ভবত তার আগেই শেষ গুলিটা তার বুকে লেগেছিল।' পুলিশ অফিসারটি থামলেন। একটু থেমে বললেন, 'এই ঘরে টিভিটা ফুল ভলুমে চলছিল। সম্ভবত, ফিরদৌসের আর্তনাদ ঢাকার জন্যে খুনি টিভিটা ফুল ভলুমে চালিয়ে দিয়েছিল। যদিও ঘরগুলো মোটামুটি সাউন্ড-প্রূফ তবু খুনি রিস্ক নেয়নি।'

'হাতে এবং পায়ে গুলি লাগার পর বেশ কিছুক্ষণ মনে হয় ফিরদৌস বেঁচে থেকে যন্ত্রণা পেয়েছিল। না হলে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথম চারটে গুলি লেগেছিল সেখানে এতটা রক্তপাত হতো না।' আদিত্য নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল।

'যে বন্দুকটা পাওয়া গেছে সেটা কি লাইসেন্সড?' সোমেন মুখুটি জিজ্ঞেস করল।

'আমরা ফিরদৌসের জিনিসপত্রের সঙ্গে কোনও রিভলভরের লাইসেন্স পাইনি স্যার। মনে হচ্ছে বন্দুকটা বেআইনি। তবে আরও ভাল করে ইনভেস্টিগেট করতে হবে।'

'লাইসেন্সড হোক বা আন-লাইসেন্সড, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ফিরদৌস রিভলভর ক্যারি করত কেন? সে কি ভয় পাচ্ছিল কেউ তার ক্ষতি করতে পারে? নাকি অন্য কোনও কারণে সঙ্গে বন্দুক রাখা তার দরকার হয়েছিল?' আদিত্য স্বগতোক্তি করল। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করল, 'রিভলভর ছাড়া ফিরদৌসের সঙ্গে আর কী কী জিনিস ছিল?'

'একটা কালো রঙের সুটকেস, একটা বড় নীল রঙের ব্যাগ। কয়েকটা প্যান্ট-শার্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, কিছু ওষুধ, অন্তর্বাস, একটা ল্যাপটপ, মানে একজন সাধারণ মানুষ যা যা ব্যবহার করে সেইসব জিনিস। আর দুটো মোবাইল। জিনিসগুলো সবই ওই সুটকেসে রাখা আছে।'

ব্যাগ আর সুটকেসটা কার্পেটের ওপর রয়েছে। আদিত্য সুটকেস খুলে জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর ব্যাগটা খুলে দেখল সেটা একেবারে ফাঁকা। 'আর কিছু নেই?' সে অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করল।

'না। যা ছিল ওই সুটকেসেই রাখা আছে।'

'আশ্চর্য! খুনি ফিরদৌসের মোবাইলগুলো রেখে গেল কেন? যা মনে হচ্ছে, খুনি ফিরদৌসের চেনা লোক। ফিরদৌস নিজেই তাকে দরজা খুলে ঘরে ঢুকিয়েছিল। তাই যদি হয়, তাহলে ফিরদৌসের মোবাইলে খুনির চিহ্ন থেকে যাবার কথা। সেক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে খুনি ফিরদৌসের মোবাইল দু'টো সঙ্গে নিয়ে যাবে। সেটা সে করল না কেন?' আদিত্য বিড়বিড় করে বলল।

'তাহলে কি ফিরদৌসের মোবাইলগুলো থেকে খুনির কোনও হদিশই পাওয়া যাবে না?' সোমেন মুখুটি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।'

'সেটা এখনই বলা শক্ত। খুনি ভুল করেও মোবাইল দু-টো ফেলে যেতে পারে। ফিরদৌসের মোবাইলগুলো থেকে ফোন নম্বরগুলো যদি উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে গত এক-দুই সপ্তাহে কার কার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছে সেটা বার করা শক্ত হবে না। মেসেজগুলোও দেখতে হবে।' আদিত্য ভাবতে ভাবতে বলল। 'কার কার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছিল যদি জানতে পারেন, আমাকে একটু জানাবেন? আর ল্যাপটপটা দেখবেন। যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'নিশ্চয় জানাব।'

নীল ব্যাগটা আদিত্যকে ভাবাচ্ছে। এইরকম একটা ব্যাগ সে আগে কোথাও দেখেছে।

'আচ্ছা, ফিরদৌসকে জীবিত অবস্থায় শেষ কে দেখেছে?' কিছুক্ষণ পরে সোমেন পুলিশ অফিসারটিকে প্রশ্ন করল।

'ফিরদৌস ডাইনিং হলে খেতে নামত না। রুম সারভিসে খাবার আনিয়ে খেত। গতকাল রাত্তিরেও সে রুটি-মাংস আনিয়েছিল। রাত্তির দশটা নাগাদ বেয়ারা এঁটো বাসনগুলো নিতে ঘরে ঢুকেছিল। সে বলেছে, ফিরদৌস তখন সোফার ওপর বসে টিভি দেখছিল। সে-ই মনে হয় ফিরদৌসকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে। মানে খুনি ছাড়া।'

'ফিরদৌসের মৃতদেহটা কে প্রথম দ্যাখে?'

'ফিরদৌস বলেছিল ওকে যেন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী রিসেপশন থেকে ওকে ফোন করা হয়েছিল। বারবার ফোন করা সত্ত্বেও কেউ ফোন ধরছে না দেখে দুজন বেয়ারা ফিরদৌসের ঘরে গিয়ে বেল বাজায়। তাতেও কোনও সাড়া না পেয়ে তাদের একজন, যে রাত্তিরে রিসেপশনে থাকে, ম্যানেজারকে ফোন করে। ম্যানেজার আসার পর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলা হয়। ঘরের ভেতরে ফিরদৌস মরে পড়েছিল।'

'রাত্তিরে রিসেপশনে কে থাকে?' আদিত্য প্রশ্ন করল।

'আমরা জিজ্ঞেস করেছি। রাত্তির দশটার সময় রিসেপশনের ছেলেটা বাড়ি চলে যায়। আবার সকাল আটটায় আসে। হোটেলের একজন বেয়ারা রিসেপশন ডেস্কের পেছনে মেঝেতে বিছানা করে ঘুমোয়। আর বাইরে একজন সিকিউরিটি সারা রাত্তির জেগে বসে থাকে। রাত্তিরে এসে কেউ হোটেলে চেক ইন করতে

চাইলে সে-ই রিসেপশনের বেয়ারাকে ডেকে তুলে দেয়। বেয়ারাই তখন রেজিস্টারে এন্ট্রির করিয়ে নেয়। তবে তেমন ঘটনা কালেভদ্রে ঘটে।'

'তার মানে, এই হোটেলে হাতে লেখা রেজিস্টারে বোর্ডারদের নাম ঠিকানা এন্ট্রির করা হয়?' সোমেন জিজ্ঞেস করল।

'এটা এখনও আমাদের চেক করা হয়নি স্যার। আমি বরং হোটেলের ম্যানেজারকে ডাকি।'

ডাক পড়তে পারে এই আশঙ্কায় ম্যানেজার বোধহয় কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল।

'আসতে পারি স্যার?' ম্যানেজারের গলার আওয়াজ ঈষৎ মেয়েলি। খর্বকায়, স্থূলতনু। কালো জামার ওপর একটা সাদা টাই পরেছে।

'আসুন। ভেতরে আসুন।' সোমেনের বলার ধরনে পুলিশি ধমক। 'আপনার নাম কী?'

'আমার নাম স্যার সফিকুল ইসলাম। আমি এই হোটেলের ম্যানেজার।'

'কতদিন এখানে চাকরি করছেন?'

'তিন বছরের বেশি হয়ে গেল স্যার। সামনের নভেম্বর মাসে চার বছর পুরো হবে।'

'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'দেশের বাড়ি স্যার বাগনানে। এখানে রয়েল হোটেলের কাছে একটা মেসে থাকি।'

'আপনার ডিউটিটা কটা থেকে কটা?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সকালে নটার মধ্যে চলে আসি। হোটেল থেকে বেরোতে বেরোতে রাত্তির আটটা বেজে যায়। আজ অবশ্য ফোন পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।'

'কার কাছ থেকে ফোন পেলেন?'

'রহমান বলে যে ছেলেটা রাত্তিরে রিসেপশনে থাকে সে ভোরবেলা ফোন করেছিল।'

'হোটেলের চেক ইন চেক আউটটা কি আপনারা হাতে লেখা রেজিস্টারে এন্ট্রির করেন?' সোমেন মুখুটির প্রশ্ন।

'না স্যার। ওটা কম্পিউটারে করা হয়। রিসেপশনে একটা ডেস্কটপ আছে। ওটাতে চেক ইন চেক আউট, বিলিং সব হয়। অ্যাকাউন্টস সেকশনেও দু-টো কম্পিউটার আছে। আর দু-টোর একটা আছে আমার ঘরে, অন্যটা মালিকের ঘরে। ল্যান দিয়ে একটা কম্পিউটার থেকে অন্যগুলোতে অ্যাক্সেস করা যায়।'

'আপনাদের মালিক কোথায় থাকে?'

'মালিক দুবাই-এ থাকে। দুবাই-এ মালিকের দু-টো হোটেল আছে। সেটাই মালিকের মেন ব্যবসা। এই হোটেলটা মালিকের বাবার। বাবা মারা যাবার পর মালিকের হয়েছে। এটাকে সেন্টিমেন্টাল কারণে মালিক রেখে দিয়েছে। তবে এখানে মালিক আসে খুব কম।'

'শুনলাম রাত্তিরে কেউ চেক ইন করলে রিসেপশনে যে বেয়ারা থাকে সে-ই এন্ট্রির করিয়ে নেয়। সে কি কম্পিউটার অপরেট করতে পারে?'

'না স্যার। রহমান কম্পিউটার খুলতে পারে না। রাত্তিরে কেউ এলে একটা খাতায় টেম্পোরারিলি তার নাম ঠিকানা এন্ট্রির করে নেওয়া হয়। পরদিন সকালে রঞ্জিত মানে আমাদের রিসেপশনে যে কাজ করে সেই ছেলেটা এলে নাম-টামগুলো কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। তবে এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে।'

'প্রশ্ন হল, কাল রাত্তিরে রঞ্জিত বাড়ি চলে যাবার পর কি কেউ হোটেলে চেক ইন করেছিল?'

'এটা আমাকে রেজিস্টার খাতাটা দেখে বলতে হবে। খাতাটা নিচে আছে। নিয়ে আসছি।' ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল।

'আমরা ওর সঙ্গে নিচে যাই না। তাহলে কম্পিউটারের এন্ট্রিরগুলোও দেখে নেওয়া যাবে।' আদিত্য সোমেন মুখুটির দিকে তাকিয়ে বলল।

'বেশ তো তাহলে নিচে যাওয়া যাক। মনে হচ্ছে এ-ঘরে আপাতত আর কিছু দেখার নেই।' সোমেন নিচে যাবার জন্য পা বাড়াল।

রহমান নিচেই ছিল। রঞ্জিত বলে ছেলেটাও ফোন পেয়ে চলে এসেছে। রহমানের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেল। কাল রাত্তির এগারোটা নাগাদ একজন গেস্ট চেক ইন করেছিল। হাতে লেখা রেজিস্টারে তার নাম রয়েছে দিলীপ সাক্সেনা। আসানসোলের একটা ঠিকানা থেকে সে আসছে। তাকে কেমন দেখতে রহমান খুব ভাল বলতে পারল না। রাত্তিরে রিসেপশনের অর্ধেক আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। জায়গাটা আলো-আঁধারি হয়ে থাকে। সেই কম আলোয় ভাল করে লোকটাকে দেখা যায়নি। তবে রহমানের মনে আছে যে লোকটার মুখে চাপদাড়ি ছিল।

চেক ইন করার সময় অবশ্য আই ডি দেখতে হয়। আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা প্যান কার্ড। আই ডি-র ফটো কপি করে রাখা নিয়ম। কিন্তু ফটোকপির মেশিনটা থাকে আপিস ঘরে। সেটা রাত্তিরে বন্ধ থাকে। রহমান ফটোকপির মেশিনটা চালাতেও পারে না। তাই দিলীপ সাক্সেনার আই ডি-র কপি নেওয়া হয়নি। রহমান তাকে বলেছিল সকালে কেউ এসে তার আই ডি-টা নিয়ে কপি করে ফেরত দিয়ে যাবে।

দিলীপ সাক্সেনাকে চারতলায় চারশ' তিন নম্বর ঘরটা দেওয়া হয়েছিল। পরে চারতলাটা সিল করে দেবার পর তাকে দোতলায় দু'শো এক নম্বর ঘরটা অ্যালট করা হয়। চারতলার অন্য গেস্টদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে সে রিসেপশন থেকে দু-শো এক নম্বর ঘরের চাবিটা নেয় এবং চাবি নিয়ে ওপরে চলে যায়। কিন্তু বেড টি দেবার জন্য বেয়ারা অনেকবার বেল বাজালেও সে দরজা খোলেনি।

সকলে মিলে দু-শো এক নম্বর ঘরে যাওয়া হল। চার-পাঁচবার বেল বাজানোর পরেও কেউ দরজা খুলছে না। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলা ছাড়া উপায় নেই। দরজা খুলে দেখা গেল ঘর ফাঁকা। বিছানাটাও ব্যবহার করা হয়নি। দিলীপ সাক্সেনা উধাও হয়ে গেছে।

'আপনাদের সিসি ক্যামেরা নেই?' আদিত্য ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল।

'আছে তো। সিসি ক্যামেরার ফুটেজগুলো পুলিশ নিয়ে যাবে বলেছে। সেই মতো ওগুলো আমরা তৈরি করে রেখেছি।'

'ফুটেজগুলো এখনও দেখা হয়নি, লালবাজারে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে হবে।' সোমেন মুখুটি জানাল।

'একবার কাল রাত্তিরের ফুটেজটা দেখতে পারলে হতো। চারতলায় কারা এসেছিল জানা যেত।' আদিত্য মুখুটির দিকে তাকিয়ে বলল।

রিসেপশনের পিছনে একটা ছোট্ট ঘরে মনিটার এবং সিসি ক্যামেরার যন্ত্রটা বসানো আছে। ক্যামেরায় চারতলার খানিকটা ধরা পড়ে, পুরো চারতলাটা ধরা পড়ে না। লিফট দিয়ে কেউ চারতলায় উঠলে তাকে লিফট থেকে নামতে দেখা যায়। যেমন দেখা গেল, রাত্তির এগারোটা চৌত্রিশে একটা দাড়িওলা লোক একটা ছোট ব্যাগ হাতে চারতলায় লিফট থেকে নামছে। মনে হয় ওই সময় দিলীপ সাক্সেনা বলে সেই ব্যক্তি রিসেপশনে চেক ইন করে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল। এ-থেকে অবশ্য আদৌ প্রমাণিত হয় না যে সে-ই ফিরদৌসকে খুন করেছে। চারশ' বারো বা চারশ' তিন নম্বর ঘরের প্রবেশদ্বারগুলো সিসি ক্যামেরার আওতায় আসে না।

'আচ্ছা, যদি কেউ সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠে আসে তা হলে কী সে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়বে?' আদিত্য ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল।

'সিঁড়ির এক্সিটটা লিফটের ঠিক উল্টোদিকে। কেউ লিফট দিয়ে উঠলে যেমন সিসি ক্যামেরায় দেখা যাবে তেমনি সিঁড়ি দিয়ে উঠলেও সে সিসি ক্যামেরার চোখ এড়াতে পারবে না।'

আদিত্যরা আবার নিচে রিসেপশনে ফিরে এসেছে। কম্পিউটার খুলে দেখা গেল, ফেব্রুয়ারি মাসের ন'তারিখ সকালে ফিরদৌস রহমান হোটেলে চেক ইন করেছিল। আদিত্যর মনে পড়ে গেল সেদিনই কুমুদিনীর অফিস রেড করা হয়। প্রথম থেকেই ফিরদৌস চারশো বারো নম্বর ঘরে ছিল। তাছাড়া তিনশো সাত নম্বর ঘরটাও সে কিছুদিন আগে নিয়ে রেখেছিল। এখানে কয়েকবার সে মিটিং করেছে।

'আমি নিজেই তো এই ঘরে দু-দিন আগে ফিরদৌসের সঙ্গে মিটিং করেছি।' তারপর কী একটা মনে পড়ে যাওয়ায় সে পাহারারত পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সেদিন যে লোকটি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, যার নাম শুনলাম সেলিম, তাকে আপনারা কোথায় পেলেন?'

'ভোরবেলা সে ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বোধহয় একসঙ্গে দুজনের কোথাও যাবার কথা ছিল। হয়তো সেইজন্যেই ফিরদৌস তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে চেয়েছিল। যাই হোক, আমরা তখনই লোকটাকে পাকড়াও করলাম। তার কাছেই তো জানতে পারলাম আপনি দু-দিন আগে এখানে ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।' পুলিশ অফিসারটি জানালেন।

'আর একটা কথা। ধরা যাক দিলীপ সাক্সেনা নামক ব্যক্তিই খুনটা করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, খুনটা করে সে যদি তখনই হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে কি তাকে কেউ দেখতে পাবে?' আদিত্য রঞ্জিতকে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ স্যার। আমাদের হোটেলের সিকিউরিটি সারারাত বাইরে জেগে থাকে। রহমান ঘুমিয়ে পড়লেও সে কিন্তু ঘুমোয় না। সারারাত জেগে থাকাটাই তার কাজ। কেউ রাত্তিরে হোটেল থেকে বেরোলে সিকিউরিটি নিশ্চয় তাকে দেখতে পাবে।' রঞ্জিত বলল।

সিকিউরিটিকে ডেকে জানা গেল, আগের রাত্তিরে কেউ হোটেল থেকে বাইরে বেরোয়নি। শুধু একজন সাহেব রাত্তির এগারোটা নাগাদ হোটেলে ঢুকে চেক ইন করেছিলেন।

সোমেন মুখুটি যখন আদিত্যকে তার মেসের সামনে নামিয়ে দিল তখন বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

'সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে কিছু পাওয়া গেলে আমাকে জানাবেন, প্লিজ।' আদিত্য গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল।

'নিশ্চয় জানাব। দেখা হবে।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

দুপুরে রত্না ফোন করেছিল। ফোনটা সাইলেন্ট করে আদিত্য তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অত ভোরে উঠে দুপুরবেলা ঘুম পেয়ে গিয়েছিল তার। ঘুম থেকে উঠে দ্যাখে তিন-তিনটে মিসড কল। তিনটেই রত্নার। এতদিনে রত্না নিশ্চয় ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু রত্নার আজ কলেজ নেই? ভাবতে ভাবতে আদিত্য রত্নার ফোনটা লাগাল।

'তোর ব্যাপারটা কী? ফোন ধরিস না, ফোন বেজে যায়। এদিকে আসিসও না। কী এমন রাজকার্য করিস?' রত্না ফোন তুলে একগাদা কথা শুনিয়ে দিল।

'আরে তোদের মতো দশটা-পাঁচটার চাকরি করব এমন সৌভাগ্য নিয়ে তো জন্মাইনি। একটা নতুন কেস এসেছে। সেটার জন্যে দৌড়োদৌড়ি করতে হচ্ছে। আজ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠেছি। বিশ্বাস না হলে গৌতমকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। তাই দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' আদিত্য সামান্য ঘুম-জড়ানো গলায় বলল।

'ছাড়, ছাড়। শুধু বাজে কথা। ভাল করে শোন। আজ সকালে গড়িয়াহাট থেকে অমিতাভ একটা আস্ত চিতল মাছ কিনে এনেছে। খুব বড় নয় আবার খুব ছোটও নয়। আমি সারাদুপুর লেবার দিয়ে চিতল মাছের মুইঠ্যা বানিয়েছি। আর আমার ইন্সট্রাকশানে সন্ধেবেলা রান্নার মাসি চিতল মাছের পেটি রাঁধবে। তুই সন্ধের মধ্যে চলে আসবি। কাজ আছে বললে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।'

'আমার তো ভুঁড়িই নেই, ফাঁসাবি কী করে?'

'আবার বাজে কথা। আসবি কি না বল।'

'আসতে তো হবেই। তবে যেতে যেতে সাতটা বেজে যাবে। একটা ছোট্ট কাজ সেরে যাব।'

'ছটা হলে ভাল হতো। ঠিক আছে সাতটাতেই আয়।'

'তোদের কলেজ কি আজকাল মুইঠ্যা রান্না করার ছুটি দিচ্ছে? আজ কলেজ যাসনি কেন?'

'মুইঠ্যা রান্নার ছুটি নয়। আজ আমাদের কলেজের ফাউণ্ডেশন ডে। তাই ছুটি। আমি তোর মতো ফাঁকিবাজ নই। আর তোর সঙ্গে বাজে কথা বলার সময়ও আমার নেই। রাখছি। অনেক কাজ বাকি আছে। তুই সাতটার মধ্যে চলে আসবি।'

রত্না ফোন রেখে দেবার পর আদিত্য ইলেকট্রিক কেটলিতে চায়ের জল গরম করতে দিল। চা ভিজতে না ভিজতেই আবার ফোন। এবার কেয়া।

'আর পনের মিনিটের মধ্যে বোর্ডিং শুরু হবে। ফ্লাইটটা টাইমেই আছে। তার মানে পাঁচটা নাগাদ দমদম পৌঁছব। নেমে ফোন করব। এখন রাখছি।'

এইজন্যেই আদিত্য খানিকটা সময় হাতে রেখেছিল। সে জানত কেয়া দমদমে নেমেই ফোন করবে। সেই সময়টা সে রাস্তায় কিংবা রত্নাদের বাড়িতে থাকতে চায়নি। আসলে কেয়ার সঙ্গে যে সে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে এটা আদিত্য অমিতাভ-রত্নাকেও বলেনি। বলার আগে অনেকবার ভেবে দেখতে হবে। আপাতত যেমন চলছে চলুক। আদিত্যর অব্যবহিত সমস্যাটা অন্য। কেউ তাকে নিয়োগ করুক বা না করুক ফিরদৌসের খুনিকে সে খুঁজে বার করবেই। এটা তার নিজের কাছে নিজের চ্যালেঞ্জ।

একটা প্রশ্ন তাকে গভীরভাবে ভাবাচ্ছে। ফিরদৌসের ঘরে দু-পিস লাগেজ পাওয়া গেছে। একটা কালো সুটকেস, একটা নীল ব্যাগ। কালো সুটকেসটাতে তো ফিরদৌসের সমস্ত জিনিসপত্র এঁটে যাচ্ছে। তাহলে নীল

ব্যাগটা কীসের জন্যে? এছাড়া আরও দু-একটা ছোটখাট ধাঁধা আছে। কিন্তু আদিত্যর মনে হচ্ছে সবার আগে ব্যাগ-রহস্যের কিনারা করা দরকার।

প্রায় পৌনে ছ'টার সময় কেয়া ফোন করল। তার আগে আদিত্য দু'বার ফোনে কেয়াকে ধরার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুবারই কেয়ার ফোনটা সুইচড অফ পেয়েছে। তার মানে কেয়ার উড়োজাহাজ তখনও মাঝ আকাশে।

'ফ্লাইটটা একটু লেট ছিল। তার ওপর কনভেয়ার বেল্টের সামনে পনের মিনিট হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে। এখন এয়ারপোর্টের বাইরে এসে গাড়ির জন্যে ওয়েট করছি।' কেয়ার গলাটা কিছু ক্লান্ত শোনাল।

'তাহলে আজ আর কথা বলব না। তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর।' আদিত্য সংক্ষেপে বলল। 'তোমার পৌঁছ-সংবাদটা পেয়ে গেলাম এটাই যথেষ্ট। কাল ভাল করে কথা বলা যাবে।'

'তোমার জন্যে একটা গিফট এনেছি। কাল দেখা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার এক পিসি মারা গেছেন। পিসতুতো দিদি ফোন করেছিল। আমরা তখন জঙ্গলে ঘুরছি। হঠাৎ ফোন এল। আগামীকাল কাজ। সারাদিন ওখানেই থাকতে হবে। পরশু সন্ধেবেলা দেখা করতে পারবে?'

'কোথায়? তোমার স্কুলের পাড়ায়? ওই যে আমাদের স্কুলের কাছে ক্যাফে অ্যান্ড সুগার বলে জায়গাটা আছে, ওখানে?'

'না, না। স্কুলের কাছে দেখা না করাই ভাল। ছাত্রীরা যদি দ্যাখে দিদিমনি ধেড়ে বয়েসে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে রেস্টোরেন্টে বসে কফি খাচ্ছে তাহলে চারদিকে টি-টি পড়ে যাবে।' কেয়ার গলাটা উদ্বিগ্ন শোনাল।

'তাহলে কি কফি হাউস?'

'না, না। কফি হাউসে ভীষণ গরম। ওখানে বসতে পারব না।'

'তাহলে এক কাজ করা যাক। পার্ক স্ট্রিটে দেখা করা যাক। রাত্তিরে ডিনার খেয়ে আমি তোমাকে হস্টেলে নামিয়ে দেব।'

প্রস্তাবটা মনে হল কেয়ার পছন্দ হয়েছে। একটু থেমে সে বলল, 'তিনটে অব্দি আমার স্কুল। চারটে থেকে টোলে পড়ানো আছে। চারটে থেকে পাঁচটা, পাঁচটা থেকে ছ'টা। পরপর দু'টো ব্যাচ। তারপর হস্টেলে ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে তোমাকে তুলে নেব। এই ধর সাড়ে সাতটায়?'

'একদিন না পড়ালে হয় না?' আদিত্য জানে কেয়ার রোরিং টিউশনির ব্যবসা। দু'তিনটে টিউটরিয়াল হোমের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে।

'না হয় না। ডুয়ার্স বেড়াতে গিয়ে একটা সপ্তাহ ক্লাশ মিস করেছি। আর করা যাবে না। সামনে হায়ার সেকেন্ডারি। আমাকে সিলেবাস শেষ করতে হবে। যা একখানা সিলেবাস বানিয়েছে, আইনস্টাইন এলেও দুবছরে পড়ে শেষ করতে পারত না।' কেয়া হঠাৎ থেমে গেল। তারপর বলল, 'এই, আমার গাড়ি এসে গেছে। তাহলে ওই কথাই রইল। পরশু সন্ধে সাড়ে সাতটায় পাতিরামের সামনে থেকে তোমাকে তুলে নেব। রাখছি।'

সাড়ে সাতটা নাগাদ রত্নাদের বাড়িতে পৌঁছল আদিত্য। ভেবেছিল, দেরি হয়েছে বলে রত্না বকাবকি করবে। কিন্তু কী অজ্ঞাত কারণে কে জানে, রত্না শান্তভাবেই বলল, 'আয়। মাত্র আধ ঘন্টা দেরি করেছিস। নট ব্যাড। আমরা বলাবলি করছিলাম তুই আটটা সাড়ে আটটার আগে কিছুতেই আসতে পারবি না।'

'তোর বর কোথায়?' আদিত্য জুতো খুলতে খুলতে বলল।

'পড়ার ঘরে। স্কাইপে নট ওনলি বাট অলসো করে সাহেব কো-অথরের সঙ্গে কথা বলছে।'

'ও বাবা। তাহলে তো অনেকক্ষণ লাগবে। টুবলু কোথায়?'

'নিজের ঘরে বসে পড়ছে। ওর তো সামনেই অ্যানুয়াল।'

'তাহলে একটু চা খাওয়া।'

'চা করছি। রান্নাটাও একটু দেখে আসি। অমিতাভ আর বেশিক্ষণ স্কাইপে থাকবে বলে মনে হয় না। সেই সাড়ে ছ'টা থেকে স্কাইপ শুরু করেছে। তুই একটু বোস। আমি বরং টিভিটা খুলে দিয়ে যাই। খবরটা দ্যাখ।'

টিভি খুলে দিয়ে রত্না রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বাংলা খবর হচ্ছে। পলিটিকাল খবর। নেতাদের পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খবর। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছে। যার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেও পালটা বিবৃতি দিয়েছে। তাই নিয়ে দুপক্ষের তরজা। আদিত্যর এ সবে কোনও ইনটারেস্ট নেই। সে অমিতাভর বুক-শেলফ থেকে একটা বই বেছে নেবে বলে উঠে দু'পা এগিয়েছে ঠিক তখনই শুনতে পেল টিভির অ্যাঙ্কর মেয়েটি অন্য কিছু বলছে।

অ্যাঙ্কর মেয়েটি বলছে, 'গতকাল জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের হোটেলে নৃশংস খুনের ঘটনার পর আজ আবার পুলিশ রাজারহাট নিউ টাউনে একটা চাঞ্চল্যকর খুনের হদিশ পেয়েছে। খুন হয়েছেন বছর পঁচিশেকের এক যুবতী। যে বাড়িতে তিনি খুন হয়েছেন সেটি চারতলা, এক তলায় গ্যারেজ, অন্য তিনটি তলায় একটি করে ফ্ল্যাট। বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে যুবতী একাই থাকতেন। তিনি এবং চারতলার ফ্ল্যাটের মালিক দুজনেই অনাবাসী। তাঁরা অ্যামেরিকায় থাকেন। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, ডাকাতির উদ্দেশ্য নিয়ে দুষ্কৃতিরা মহিলার বাড়িতে ঢুকেছিল। সম্ভবত তারা জানত বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। মহিলা বাড়িতে একা রয়েছেন। বাড়ির সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পাওয়া গেছে। দু'টো আলমারিই খোলা। অনুমান করা হচ্ছে, আলমারি থেকে অনেক দামী জিনিস নিয়ে দুষ্কৃতিরা চম্পট দিয়েছে। আলমারির চাবি আদায় করার জন্য খুনের আগে মহিলার ওপর মনে হয় শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার, মৃতদেহের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে এই খুন এবং ডাকাতির ঘটনাটা ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগে। সিকিউরিটি গার্ড ছুটি থেকে ফিরে এসে আজ সকালে প্রথম এটা আবিষ্কার করে।

আদিত্য মগ্ন হয়ে খবরটা শুনছিল, খেয়াল করেনি কখন অমিতাভ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'অত মন দিয়ে টিভিতে কী দেখছিস?' অমিতাভ আলগোছে জিজ্ঞেস করল। 'কতক্ষণ এসেছিস?'

'এই মিনিট পাঁচ-সাত।' টিভিতে চোখ রেখে আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বলল।

টিভিতে এখন চারজন বিশেষজ্ঞকে দেখা যাচ্ছে—একজন মনোবিজ্ঞানী, একজন সমাজবিজ্ঞানী, একজন প্রাক্তন পুলিশ-কর্তা আর একজন মহিলা কমিশনের সদস্য। এই বিশেষজ্ঞরা এখন এই খুনের ঘটনার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। আদিত্য তার জায়গায় ফিরে গিয়ে বসল। আলোচনা শোনার কোনও উৎসাহ তার নেই। অমিতাভও বসেছে।

'রত্নাকে চা দিতে বলেছিস?'

'বলেছি। ও চা করতে গেছে।' আদিত্য এখনও খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে।

আদিত্যর অন্যমনস্কতা অবশ্য অমিতাভ খেয়াল করেনি। সে বলল, 'পুরাতনী বাংলা গানের ওপর একটা বই লিখছি। একা নয়, আমার সঙ্গে টমাস সেসেমস্কা বলে একজন মিউসিকোলজিস্ট আছে। বাবা পোলিশ, মা আইরিশ, টমের জন্ম-কম্ম অ্যামেরিকায়। একেবারে পাগলাটে লোক। এক সময় রচেস্টার, নিউ ইয়র্কের ইস্টম্যান স্কুল অফ মিউজিকে অধ্যাপনা করত। সেটা ছেড়ে দিয়ে এখন এথনিক সঙ্গীতের খোঁজে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। নিজে চমৎকার চেলো বাজাতে পারে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, আর অতি সম্প্রতি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানে প্রবল উৎসাহ হয়েছে। বছর দুয়েক আগে শিকাগোয় একটা কনফারেন্সে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দাঁড়া, টিভিটা বন্ধ করে দিই। আরে, রিমোটটা গেল কোথায়?' অমিতাভ উঠে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে আবার ফিরে এল।

'আমাদের ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পাবলিশারের কাছে পাঠানোর আগে একটা লাস্ট রিভিশন করছিলাম। আমার কমেন্টগুলো দিয়ে টমের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সেগুলো পড়ে ও স্কাইপ করল। ওর সঙ্গেই এতক্ষণ স্কাইপে কথা বলছিলাম।'

'তোরা কি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানের একটা ইতিহাস লিখছিস?'

'ইতিহাস তো বটেই। কিন্তু শুধু ইতিহাস নয়। আমাদের একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন আছে। সেটা হল, বাংলা পুরাতনী গান, যে গানগুলো একশ বছর কী ধর আশি-নব্বই বছর আগেও বেশ পপুলার ছিল, রেগুলার আসরে গাওয়া হতো, সেগুলো হঠাৎ হারিয়ে গেল কেন? হিন্দুস্তানি মার্গসঙ্গীত তো হারিয়ে যায়নি। মারাঠি নাট্যসঙ্গীতও তো হারিয়ে যায়নি। তাহলে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, গোপাল উড়ে এমনকি রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তর গান এখন আর লোকে শোনে না কেন?'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। কিছু পুরোনো গান নিশ্চয় সংগ্রহ করেছিস?'

'প্রচুর সংগ্রহ করেছি। গ্র্যামাফোন রেকর্ডে যা বেরিয়েছিল তার সবই হার্ড ডিস্কে তোলা আছে। আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, কে মল্লিক। তাছাড়াও নানা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। আর গত মাসে দিল্লির ন্যাশানাল আর্কাইভ থেকে কালীপদ পাঠকের গাওয়া অনেকগুলো গান পেয়েছি। এগুলো একেবারে অথেন্টিক টপ্পা, রিয়াল জেমস। তুই শুনে দেখতে পারিস।'

'সেই গানটা আছে? শ্যাম নাগর হে আমার, আমি আর প্রেম করব না, ফিরে যাও? আমার বাবার খুব প্রিয় ছিল গানটা।'

'অবশ্যই আছে। দুতিনটে ভারশান আছে। এখন শুনবি?'

'নিশ্চয় শুনব। কিন্তু তার আগে একটা দরকারি কথা সেরে নিই।'

রত্না চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। সঙ্গে ছোট ছোট আলুর টিকিয়া। 'খুব বেশি দিলাম না। এখন টিকিয়া খেয়ে পেট ভরে গেলে রাত্তিরে খেতে পারবি না।' রত্না আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল। রত্নাও চা নিয়ে ওদের সঙ্গে বসেছে।

আদিত্য একটা টিকিয়ায় কামড় দিয়ে বলল, 'সুপার্ব হয়েছে। ধনে পাতা দিয়েছিস, না?'

'তোর ভাল লাগে বলে দিলাম। অমিতাভরও খুব ভাল লাগে। আমি ততটা ধনে পাতার ভক্ত নই।'

'আমি জানি। ধনে পাতার ব্যাপারটায় মাঝামাঝি কিছু হয় না। যার ভাল লাগে, তার খুব ভাল লাগে আর যার লাগে না, তার একেবারেই লাগে না।' আদিত্য কথাটা বলে অমিতাভর দিকে ফিরল।

'কাজের কথাটা বলে নিই। তুই এক সময় বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে পড়াতিস না? মানে তোর বিদেশ যাবার আগেকার কথা বলছি।'

'পড়াতামই তো। দুবছরের বেশি পড়িয়েছি। আমাদের বিয়ের সময় তো আমি বর্ধমানেই পড়াতাম।'

'বেশ। আমার মনে আছে তুই তখন কলকাতা থেকে বর্ধমান যাতায়াত করতিস। ঠিক বলছি তো?'

'বলে যা। এখন অব্দি একদম ঠিক বলেছিস।'

'সেই সময় বর্ধমান মেডিকেল কলেজের কিছু ডাক্তারও তোর সঙ্গে নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করতেন। তুই বলেছিলি, তাদের কারও কারও সঙ্গে তোর বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। এখন কি তাদের কেউ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আছেন?'

'এখন কি আর কেউ বর্ধমানে আছে? এতদিনে নিশ্চয় বদলি হয়ে গেছে। তোর ঠিক কী দরকার বলত?'

'বর্ধমান মেডিকেল কলেজে একজন ডাক্তার আছেন, ডাক্তার সামন্ত। বয়েস খুব বেশি নয়। পেডিএট্রিশিয়ান। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কেউ যদি ইনট্রোডিউস করে দিত খুব সুবিধে হত। তোর চেনা কেউ আছে যে আমাকে ডাক্তার সামন্তর সঙ্গে একটু ইনট্রোডিউস করে দিতে পারে?'

অমিতাভ অনেকক্ষণ ভেবে মাথা নাড়ল। 'না রে। কাউকে মনে পড়ছে না। আমি বর্ধমান মেডিকেল কলেজের যেসব ডাক্তারদের চিনতাম তাদের বেশিরভাগের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। আর দু-একজন যাদের সঙ্গে আছে তারা কেউই আর বর্ধমানে নেই। সরি।'

রত্না মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'নীলাদ্রি বলে তোমার যে ইস্কুলের বন্ধু পিজিতে বাচ্চাদের ডাক্তার ছিল, সে কিছুদিন আগে বদলি হয়ে বর্ধমান না কোথায় গেল না?'

'গেলে ভাল হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নীলাদ্রি বদলি হয়ে বর্ধমানে যায়নি। মেদিনীপুরে গেছে।'

'তোর বন্ধু কি বাচ্চাদের ডাক্তার? তাহলে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ না? হয়তো ডাক্তার সামন্তকে চিনতেও পারে।'

'ঠিক আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব। তবে মনে হয় চেনার চান্স কম।' অমিতাভ আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'কালী পাঠকের গানটা তাহলে লাগাই?'

২

সেই রাত্তিরটা আদিত্য অমিতাভদের বাড়িতে থেকে গেল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরবে বলে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরার মোড়ে যাবার অটোতে উঠেছে, গৌতমের ফোন এল।

অটোতে ড্রাইভারের পাশে বসলে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করাই শক্ত। অতি কষ্টে আদিত্য যদি বা মোবাইলটা বার করতে পারল, সেটা কানে লাগিয়ে শুনল গৌতমের কথাগুলো খুব কেটে কেটে আসছে।

'অটোতে আছি। তোর কথাগুলো খুব কেটেকেটে আসছে। শুনতেই পাচ্ছি না।' আদিত্য কোনও রকমে বলল। উত্তরে গৌতম কী বলল আদিত্য বুঝতে পারল না। সে হাজরার মোড়ে অটো থেকে নেমে গৌতমকে একটা মেসেজ করল, 'তুই কি আপিসে আছিস? তাহলে আমি মিনিট চল্লিশের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পরে আদিত্য যখন যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখল গৌতম মেসেজ করেছে, 'চলে আয়।'

গৌতমের অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে আদিত্যর প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। সেই পুরোনো সমস্যা। মেট্রোর গণ্ডগোল।

'সেই কখন থেকে তোর সঙ্গে চা খাব বলে বসে আছি। এত দেরি করলি কেন?' গৌতমের পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার অফিসের চায়ের মানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘণ্টা বাজিয়ে গৌতম বেয়ারাকে চা আনতে বলল।

'আরে মেট্রোর পুরোনো গল্প। কোথায় লাইনে গণ্ডগোল, তাই ট্রেন আসতে দেরি করল।'

'তোর স্ট্যাচারের একজন ডিটেকটিভের কিন্তু একটা নিজস্ব গাড়ি থাকাটা এসেনশিয়াল।' গৌতম মুচকি হাসল।

'গাড়ি! ভাত-ডাল জোটে না আবার গাড়ি! ভাল বলেছিস।'

বেয়ারা পটে করে চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ক্রিম ক্র্যাকার। 'রেখে যাও। একটু ভিজুক। আমি ঢেলে নেব।' গৌতম বেয়ারাকে বলল।

তারপর বেয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোকে কয়েকটা দরকারি জিনিস জানানোর ছিল। ফোনে অত কথা বলা শক্ত। তুই এসে খুব ভাল করলি।'

'আমারও তোর সঙ্গে দু-একটা জিনিস ডিসকাস করার ছিল। তবে তার আগে একটা কথা বলে নিই। সেদিন সকালে তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। জাহাঙ্গির খান আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন আর কারও হয়ে কাজ করছি না। তবে ফিরদৌসের খুনটা আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কেউ আমাকে এমপ্লয় করুক না করুক ওই রহস্যের কিনারা আমাকে করতেই হবে। শুধু তোদের একটু সাহায্য দরকার।'

'শোন। আমরাই তোর সাহায্য চাইছি। তুই অতীতে আমাদের কত ভাবে সাহায্য করেছিস সেটা তো আমরা জানি। এবং তুই যে আর জাহাঙ্গির খানের হয়ে কাজ করছিস না, এটা আমাদের পক্ষে খুব ভাল হল। তোর পক্ষেও। কেন ভাল হল একটু পরে বলছি।'

গৌতম দু-টো কাপে চা ঢালল। যেমন রঙ তেমনি গন্ধ। আদিত্য তার কাপটা তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা প্রলম্বিত তৃপ্তির শব্দ করল।

'প্রথম কথা হচ্ছে', গৌতম আবার বলতে শুরু করেছে, 'আমার মনে হয়, ফিরদৌসের খুনের পেছনে ওই উধাও হয়ে যাওয়া কুড়ি কোটি টাকার একটা বড় ভূমিকা আছে। ফিরদৌসের হাত দিয়ে পৌঁছে দেওয়া কুড়ি কোটি উধাও হয়ে গেল আর তারপর ফিরদৌস খুন হল এ দুটো ঘটনা জাস্ট কোয়েন্সিডেন্স হতে পারে না। আমি ভাবছি, এই দুটো ঘটনার মধ্যে যখন একটা সম্পর্কই আছে তখন একজন অফিসারই যদি দুটো ঘটনা ইনভেস্টিগেট করে তাহলে কেমন হয়? অবশ্য কুড়ি কোটি টাকা উধাও হয়ে গেছে বলে আমাদের কাছে কেউ কমপ্লেন করেনি। আমরা তোর কাছ থেকে ঘটনাটা জানতে পেরেছি। কিন্তু কুমুদিনী বিত্ত নিগম নিয়ে যে ইনভেস্টিগেশনটা চলছে তার সঙ্গে কুড়ি কোটির কেসটা অনায়াসে জুড়ে দেওয়া যায়। ইন ফ্যাক্ট, কুমুদিনীর ভেতরের ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে না পারলে ফিরদৌসের খুনের রহস্যটা সলভ করা যাবে না। সব মিলিয়ে আমি ভাবছি, শিকদারকে কুমুদিনীর কেসটা থেকে সরিয়ে সোমেন মুখুটিকে ফিরদৌসের মার্ডার এবং কুমুদিনী দু-টোরই দায়িত্ব দেব। তোর কী মনে হয়?' গৌতম কথা থামিয়ে চায়ে চুমুক দিল।

'আমার মনে হয় সেটা খুব ভাল একটা মুভ হবে। দুটো কেস যে রিলেটেড তাতে সন্দেহ নেই। শিকদার একটু সিক্রেটিভ টাইপ। ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে ও ইনভেস্টিগেশন করে যা পেয়েছে তার সবটা আমাকে বলছে না। আমি একদিন কুমুদিনীর অফিসটা দেখতে চেয়েছিলাম। শিকদার বলেছিল, কবে দেখতে যেতে পারি আমাকে জানাবে। কিন্তু এখনও তো জানাল না। অন দি আদার হ্যান্ড, সোমেন মুখুটি ছেলেটা চমৎকার। ব্রাইট, এলার্ট এবং কো-অপরেটিভ। সোমেন কুমুদিনী কেসটার চার্জ নিলে আমার অন্তত খুব সুবিধে হবে।'

'সোমেন মুখুটি ছেলেটাকে আমারও পছন্দ। বেশ প্রোঅ্যাকটিভ। ও নিজেই এসে আমাকে বলল, স্যার কুমুদিনীর কেসটাও যদি আমাকে দায়িত্ব দেন তাহলে এই মার্ডার কেসটার সঙ্গে ওটাও ইনভেস্টিগেট করতে পারি। দুটোর মধ্যে একটা পরিষ্কার লিঙ্ক আছে স্যার। একসঙ্গে ইনভেস্টিগেট করতে পারলে আমার খুব সুবিধে হবে। যদিও পদমর্যাদায় দুজনেই এক, শিকদার ওর থেকে বয়েসে সিনিয়ার। তাই শিকদারকে সরাসরি কিছু বলতে ওর বাঁধছিল।' আবার কথা থামিয়ে গৌতম চায়ে চুমুক দিল।

'তাহলে এটা তো ডিসাইডেডই হয়ে গেল যে সোমেন কুমুদিনীর ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করবে। আর কী বলবি বলছিলি?' আদিত্য চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিল।

'হ্যাঁ। আরও দুটো ব্যাপার তোকে জানানোর ছিল।' গৌতম একটু থামল। 'আমরা ঠিক করেছি জাহাঙ্গির খানকে ফিরদৌসের মার্ডার কেসে আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে রাখব। এটা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই। জাহাঙ্গির তো ইনভ্যালিড। সে নিজে খুন-টুন করতে পারবে না। কিন্তু কাউকে দিয়ে তো করাতেই পারে। অবশ্য আমি একবারও বলছি না জাহাঙ্গির খানই ফিরদৌসকে খুন করিয়েছে। কিন্তু তোর কাছ থেকে আমরা যা তথ্য পেয়েছি তাতে মনে হয় এই খুনটার সঙ্গে জাহাঙ্গির খানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কী ধরনের যোগাযোগ সেটা জানার জন্যে জাহাঙ্গির খানকে পুলিশ কাস্টডিতে রেখে ইন্টারোগেট করতে হবে। তাই বলছিলাম, তুই যে এখন আর জাহাঙ্গির খানের পে-রোলে নেই সেটা তোর পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে, সকলের পক্ষেই ভাল হয়েছে।'

'আমার মনেই হচ্ছিল জাহাঙ্গির খানকে তোরা অ্যারেস্ট করতে পারিস। আমি এতে একটুও অবাক হচ্ছি না। আমি তোদের সঙ্গে এ-ব্যাপারেও একমত যে, জাহাঙ্গিরই ফিরদৌসকে খুন করিয়েছে এটা এখনও বলার সময় আসেনি। তবে ফিরদৌস খুনের সঙ্গে ওর একটা ইনভলভমেন্ট থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে আমার মনে হয় এক্ষুনি ওকে অ্যারেস্ট না করে ওর ওপর নজর রাখলে বেটার হত। ও তো ইনভ্যালিড। চট করে পালাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। তাহলে ওকে ক'টা দিন বাইরে রেখে দেখা যায় কিনা ভেবে দেখব।'

'আর কিছু বলবি?' আদিত্য খানিকটা অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় কথাটা হল, বটুক সামন্ত যে টেম্পোরারি বেলটা পেয়েছিল সেটা হাইকোর্টে আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। হাইকোর্ট আমাদের অ্যাপিলটা খারিজ করে দিয়েছে। ফলে বটুক সামন্তকে পুলিশ কাস্টডিতে আর নেওয়া যাচ্ছে না। মনে হল, এটা তোকে জানিয়ে রাখি।'

তারপর গৌতম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুই কী বলবি বলছিলি?'

'সেদিন সকালে সিতারা হোটেলে গিয়ে কয়েকটা জিনিস স্ট্রাইক করল। সেগুলো তোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। ফিরদৌস ন-তারিখ, অর্থাৎ যেদিন তার কুড়ি কোটি টাকা কুমুদিনীতে জমা দেবার কথা তার একদিন পরে সিতারা হোটেলে চেক ইন করেছিল। যেদিন কুমুদিনী রেড হয়েছিল, ঠিক সেদিন। সিতারা হোটেল থেকে কুমুদিনীর আপিস খুব দূরে নয়। কুমুদিনী রেড হবার দিনই অফিসের অত কাছে একটা হোটেলে ফিরদৌস চেক ইন করতে গেল কেন?'

'হুঁ, তারপর?'

'দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়, ফিরদৌসের লাগেজ বলতে একটা সুটকেস আর একটা বড় নীল ব্যাগ। ফিরদৌসের সব জিনিসপত্র সুটকেসে এঁটে গেছে। ব্যাগটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তাহলে ব্যাগটা ফিরদৌসের কী কাজে লাগছিল বা লেগেছিল?'

'ইনটারেস্টিং অবজারভেশন। আর কিছু?'

'হ্যাঁ। যতদূর মনে হচ্ছে, খুনি দিলীপ সাক্সেনা নাম নিয়ে রাত্তিরবেলা হোটেল সিতারার চারতলার একটা ঘরে চেক ইন করেছিল। আর তাকে সে ঘরে দেখা যায়নি। মনে হয়, সে ফিরদৌসের পরিচিত ছিল। তাই বিনা বাধায় ফিরদৌস তাকে নিজের ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল। ফিরদৌসকে খুন করার পরে সম্ভবত সে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, সে যখন হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড তাকে দেখতে পেল না কেন?'

'হয়তো সিকিউরিটি গার্ড ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'অসম্ভব নয়। তবে সিকিউরিটি গার্ড হলফ করে বলছে সে সারা রাত্তির জেগে ছিল।'

'বেশ, বেশ। প্রচুর চিন্তার খোরাক দিয়ে গেলি। আমি নিশ্চয় ভেবে দেখব।'

'আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। ফিরদৌসের লাগেজের মধ্যে দুটো মোবাইল ফোন ছিল। একটা সুইচ অফ রেখেছিল, তাই জাহাঙ্গির ওকে ফোন করে পায়নি। অন্য মোবাইল দিয়ে ও ওর বউ-এর সঙ্গে কথা বলত। খুনি দুটো মোবাইলই রেখে গেছে। কেন? এর একটাই কারণ হতে পারে। মোবাইলগুলো থেকে খুনির হদিশ পাওয়া যাবে না। খুনি ফিরদৌসের চেনা লোক, সে খুনিকে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু ফিরদৌসের মোবাইল থেকে তার কোনও হদিশ পাওয়া যাবে না, এটা কী করে হয়? খুনির হদিশ না পাওয়া গেলেও দেখা দরকার সম্প্রতি ফিরদৌস কার কার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। একটু দেখবি?'

'নিশ্চয় দেখব। আর কিছু?'

'হ্যাঁ। সোমেন মুখুটি যেদিন কুমুদিনীর অফিসটা দেখতে যাবে আমাকে একটা খবর দিতে বলিস। আমিও সঙ্গে যাব।'

৩

শ্যামল মুড়ি মেখেছিল। বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি নেমেছে, প্রথমে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, তারপর অঝোর, অবিশ্রাম, অনর্গল। সন্ধের মুখে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল। বউবাজার স্ট্রিটের গাছগুলো মহা শঙ্কিত হয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। আদিত্য ভাবছিল সঙ্গে ছাতা নেই, বাড়ি ফিরবে কী করে? অবশ্য এই ঝড়ের মধ্যে ছাতা থাকলেও খুব একটা লাভ হত না। আদিত্যর যখন একটু একটু খিদে পাচ্ছে আর বৃষ্টিটা অঝোরে পড়ে

যাচ্ছে, হঠাৎ দেবদূতের মতো এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে শ্যামল এসে হাজির। আজকাল মাঝে মাঝে বৃষ্টি-বাদলার দিনে শ্যামল নিজের ঘরে বসে গামলায় মুড়ি মাখে। তারপর এই বিল্ডিং-এর আপিসে আপিসে বিক্রি করে। দামটা একটু বেশি নেয় বটে তবে স্বাদ তোলে চমৎকার। এক গাল খেয়ে আদিত্যর মনে হল লঙ্কার আচারের তেল দিয়ে মুড়িটা মেখেছে।

মুড়িটা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আদিত্যর কফি এবং সঙ্গীত পিপাসা এক সঙ্গে চাগাড় দিয়ে উঠল। সে ইলেকট্রিক কেটলিতে জল এবং ইউ টিউবে মইনুদ্দিন ও আমিনুদ্দিন ডাগরের একটা পুরোনো মিয়া মল্লার চাপিয়ে মৌজ করে বসে সিগারেট ধরাল। আর ঠিক তখনই দরজায় খট খট শব্দ, কেউ এসেছে। আদিত্য ভাবল শ্যামল বুঝি মুড়ির পয়সা নিতে এসেছে। দরজা খুলে দেখে ছাতা হাতে একজন অজ্ঞাত পরিচয় বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তার পাশে বোরখা পরা এক মহিলা।

'আপনি আদিত্য মজুমদার?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

আদিত্য ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে দরকার আছে। আমরা ভেতরে আসতে পারি?'

কয়েক মিনিট পরে দু'জনে যখন আদিত্যর উল্টোদিকে চেয়ারে বসেছেন এবং আদিত্য মিয়া মল্লারটা বন্ধ করে দিয়েছে, ভদ্রমহিলা তাঁর মুখের আবরণ উন্মোচন করলেন। মুখটা আদিত্যর চেনা। এই মহিলার সঙ্গে কিছুদিন আগেই তার কথা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী।

'আশা করি, আমাকে আপনার মনে আছে।' ভদ্রমহিলা আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন।

'নিশ্চয় মনে আছে। এই তো সেদিন আপনার সঙ্গে কথা হল।'

'ঠিক। কিছুদিন আগেই আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আপনি বলেছিলেন ফিরদৌস যদি নিরপরাধ হয়, আপনি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন।' ভদ্রমহিলার হয়তো আরও কিছু বলার ছিল। উ□□□ত কান্না চাপতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ফিরদৌসকে বাঁচাতে পারিনি এটা ঠিক। কিন্তু ফিরদৌস সম্পূর্ণ নিরপরাধ এটা আমার মনে হয় না। কোনও একটা বেআইনি ব্যাপারে ও জড়িয়ে ছিল। কীসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কিংবা কতটা জড়িয়ে ছিল আমি এখনই বলতে পারব না। কিন্তু নিশ্চয় জড়িয়ে ছিল। যে ওকে খুন করেছে সে কষ্ট দিয়ে ওর কাছ থেকে কোনও কথা বার করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ ফিরদৌস একটা কিছু জানত। হয়তো ওই কুড়ি কোটি টাকা কোথায় রয়েছে সেটা জানা ছিল ওর। তবে একটা ব্যাপার আপনার কাছে স্বীকার করি। আমি ভেবেছিলাম, আপনার স্বামী ফিরদৌসের কোনও বড় ক্ষতি করবেন না। ভেবেছিলাম বলেই আমি আপনার স্বামীকে ফিরদৌসের হদিশ দিয়েছিলাম। ফিরদৌসও ভেবেছিল ফুফাজি তার কথা বিশ্বাস করবেন। বস্তুত সেইজন্যেই সে আমাকে দিয়ে জাহাঙ্গির খানকে বার্তা পাঠাতে চেয়েছিল যে সে নির্দোষ। এখন, ফিরদৌস খুন হবার পর, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশও আপনার স্বামীকেই সন্দেহ করছে। কারণ তারা কুড়ি কোটি টাকা উধাও হয়ে যাবার খবরটা পেয়েছে। আমার কাছ থেকেই পেয়েছে। এত বড় একটা খবর তো আর আমি লুকিয়ে রাখতে পারি না।'

এইটুকু বলে আদিত্য থামল। বয়স্ক ভদ্রলোক এবার মুখ খুললেন।

'আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে নিই। আমি ইনামুর রহমান, নুসরতের মেজদা।' ভদ্রলোক তার পাশে উপবিষ্ট বোনের দিকে তাকালেন। আদিত্য এই প্রথম জানতে পারল জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর নাম নুসরত। 'নুসরত একা আসতে পারছিল না। তাই আমি সঙ্গে এলাম। একে এই ঝড়-বৃষ্টি, তার ওপর নুসরত একা খুব বেশি বাইরে বেরোয় না। তাছাড়া সাবিনাকে নুসরত ছাড়া আর কেউ সামলাতে পারছে না। সাবিনাকে হালিশহরে রেখে এখানে আসাটাও এক মুস্কিল।'

আদিত্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এদের এখানে আসার কারণটা সে এখনও বুঝতে পারছে না। কেটলির জলটা গরম হয়ে গেছে। মুখ থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আদিত্য ইনামুর রহমানের দিকে

তাকিয়ে বলল, 'আপনারা কফি খাবেন?' কথাটা বলেই আদিত্য বুঝল বিরাট ফোপা করে ফেলেছে। তার আপিসে কাপ আছে মাত্র দুটি। তার মধ্যে যেটিতে সে নিজে কফি খায় তার গায়ে গভীর দাগ জমেছে। বাইরের লোককে তাতে কফি দেওয়া যায় না। ফলে হাতে রইল একটাই ভদ্রস্থ কাপ। তাতে দুজন কফি খাবে কী করে? আদিত্য মনে মনে ঠিক করে নিল কালকেই সে গোটা ছয়েক কাপ কিনে আনবে।

আদিত্যর ভাগ্য ভাল নুসরত বললেন, 'আমি চা-কফি খাই না।'

ইনামুর রহমান বললেন, 'আমি একটু কফি খেতে পারি। দুধ-চিনি ছাড়া।'

আদিত্য কফি করতে উঠল। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব খানিকটা কমে গেছে। কিন্তু তার বদলে বেড়েছে বৃষ্টির বেগ। সে ইনামুরকে বলল, 'এই বৃষ্টিতে আপনারা এলেন কী করে?'

'আমরা যখন রওনা হয়েছিলাম তখনও বৃষ্টি নামেনি। তবে আকাশটা কালো করে এসেছিল।'

আদিত্য দু-কাপ কফি নিয়ে টেবিলে ফিরে এল। একটা কাপ ইনামুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার বলুন, আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

ইনামুর রহমান তার বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই বল।'

নুসরত আদিত্যর দিকে সোজাসুজি তাকালেন। কোনও রকম গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি বললেন, 'আমি চাই আপনি ফিরদৌসের খুনিকে খুঁজে বার করুন। এর জন্য আপনার যা ফি লাগে আমি দেব। আমি ফিরদৌসের খুনির শাস্তি চাই।' ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে আদিত্য একটা অদ্ভুত কাঠিন্য লক্ষ করল।

'ফিরদৌসের খুনিকে আমিও খুঁজে বার করতে চাই। ফিরদৌসের খুনের জন্য আমি নিজেকে খানিকটা দায়ী মনে করি। তাই ফিরদৌসের খুনিকে খুঁজে বার করার কাজটা আমাকে করতেই হবে। আর এটাও ঠিক যে কাজটা করার জন্য কেউ যদি আমাকে নিয়োগ করেন তাহলে আমার খুব সুবিধে হয়। কারণ এই এটাই আমার রুটি-রুজি। কিন্তু ম্যাডাম, আপনার কাছ থেকে এই কাজটা নিতে আমার দুটো অসুবিধে আছে।' এইটুকু বলে আদিত্য থামল। অন্য দু-জন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আমার প্রথম অসুবিধে' আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'যদি দেখা যায় ফিরদৌস হত্যার পেছনে আপনার স্বামীর কোনও হাত আছে তাহলে আমি আপনার স্বামীকেই পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব। এটা কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? আর দ্বিতীয় অসুবিধে, যেহেতু আপনার স্বামী জাহাঙ্গির খান সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, এবং দোষী প্রমাণিত হলে আমি তাকে ধরিয়ে দিতে বাধ্য হব, তাই তার কোনও টাকা আমি নিতে পারব না। আমি কি আমার সমস্যাগুলো ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারলাম?' আদিত্য কথা বলা থামিয়ে কফির কাপে চুমুক দিল।

'দু-টো অসুবিধের কোনওটাই আপনার হবে না।' নুসরত পরিষ্কার গলায় বললেন। 'যদি দেখা যায় আমার স্বামী দোষী তাহলে আপনি তাকে স্বচ্ছন্দে ধরিয়ে দিতে পারেন। দোষীর শাস্তি পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সে যেই হোক। আর আপনার কাজের জন্যে যে টাকাটা আমি আপনাকে দেব সেটা আমার স্বামীর টাকা নয়। সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের টাকা। আপনি হয়তো জানেন না আমার জন্য আমার আব্বা একটা মোটা টাকা রেখে গেছিলেন। সেটা আমি আমার ছোট ভাই-এর ব্যবসায় খাটিয়েছি। ছোট ভাই কাতারে যে ব্যবসা করে আমিও তার অংশীদার। ব্যবসাটা খুব ছোট নয় আর তাই আমার টাকারও কোনও অভাব নেই। অর্থাৎ আমার নিজের টাকায় আমি আপনাকে নিয়োগ করতে চাই। আপনি রাজি কিনা বলুন।'

'হ্যাঁ-না বলার আগে আমি আর একটা প্রশ্ন করব। বাজারে এত গোয়েন্দা থাকতে আমাকেই কেন নিয়োগ করতে চান?'

'আমি মোটামুটি লোক চিনি। আপনার সঙ্গে সেদিন কথা বলে মনে হয়েছিল আপনি লোভী লোক নন।' নুসরত বললেন।

'তাছাড়া আমরা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেছি। আপনি রিসেন্টলি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কেস সলভ করে পুলিশকে সাহায্য করেছেন। আপনার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্কও খুব ভাল। তাই আমরা জানি আপনি

বেআইনি কিছু করবেন না। আর আমরাও শুধু ন্যায়ের পথেই নয়, আইনের পথেও থাকতে চাই।' ইনামুর রহমান জানালেন।

'আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি।' এবার নুসরতের গলা। 'আমরা যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি সেটা আমার স্বামী জানেন না। আমরা যদি আপনাকে নিয়োগ করতে পারি তাহলেও আমার স্বামী জানতে পারবেন না। প্লিজ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। একা পুলিশের কাজ এটা নয়। তাছাড়া আমি জানি পুলিশের মধ্যেও অনেক ঘুণ আছে। আপনিই এই কাজটা পারবেন।'

'ঠিক আছে। আপনাদের প্রস্তাবে আমি রাজি।' আদিত্য খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল। 'আমাকে কিন্তু কোনও কথা লুকোনো চলবে না। কথা লুকোলে আমি সত্যিটাকে বার করতে পারব না। প্রথমে একটা প্রশ্ন। আপনারা কি জানতেন ফিরদৌস কোথায় ছিল?'

'আমি জানতাম না। সাবিনা হয়তো জানত। কিন্তু আমাকে বলেনি।'

'সাবিনার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে?'

নুসরত একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন। খানিক ইতস্তত করে বললেন, 'সাবিনা এখনও ঠিক কথা বলার অবস্থায় আসেনি। তাছাড়া আপনার সঙ্গে ওকে কথা বলাতে গেলে ওকেই কলকাতায় আনতে হবে। আপনি হালিশহরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললে আমার স্বামী জানতে পেরে যাবেন। কিন্তু আপাতত সাবিনাকে কলকাতায় আনা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে আমার মনে হয় সাবিনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে হবে।'

মিনিট পনেরো পরে বৃষ্টি মাথায় করেই ভাই-বোন রওনা হয়ে গেলেন। ওদের সঙ্গে অবশ্য গাড়ি ছিল। কিন্তু বৃষ্টি থামা অব্দি অপেক্ষা করা ছাড়া আদিত্যর উপায় নেই। একটা ট্যাক্সি পেলে সে বাড়ি চলে যেত। কিন্তু একে এইরকম ঝড়-বাদল তার ওপর এটা আপিস পাড়া। কাতারে কাতারে লোক বাড়ি ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ট্যাক্সি খুঁজছে। এই অবস্থায় এখান থেকে এখন ট্যাক্সি পাওয়া কার্যত অসম্ভব। সন্ধে সাড়ে সাতটা বেজে গেল, বৃষ্টি কমার লক্ষণ নেই। আটটা বেজে গেল। সাড়ে আটটা বেজে গেল। আদিত্য জানলা দিয়ে দেখল রাস্তার ধারে একটু একটু জল জমছে। বৃষ্টির বেগ কমেনি। মহা মুশকিল, আদিত্যর আবার খিদে পাচ্ছে। এক ঠোঙা মুড়ি হজম হতে আর কতক্ষণ লাগবে?

আপিস বাড়িটা কি ফাঁকা হয়ে এসেছে? একটু আগে শ্যামল মুড়ির পয়সা নিয়ে চলে গেছে। এতক্ষণে সে বোধহয় শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ডানকুনি লোকালে শ্যামল যাতায়াত করে। ডানকুনির ঠিক আগের স্টেশন রাজচন্দ্রপুরে তার বাড়ি। আদিত্যর আর গান শুনতে ইচ্ছে করছে না। মন বিক্ষিপ্ত থাকলে গান শোনা যায় না। খুব বেশি দেরি হলে মেসের খাবার ঘরটা বন্ধ হয়ে যাবে। সে আর এক ঝামেলা।

কেয়াকে ফোন করতে খুব ইচ্ছে করছিল। কেয়ার সঙ্গে কথা বললে সময়টা কেটে যেত। কিন্তু আদিত্য জানে, কেয়া এখন ছাত্র পড়াচ্ছে। ফোন ধরতে পারবে না। এই বিরক্তিকর অবস্থায় একটাই বড় সান্ত্বনা। নুসরত একটা মোটা টাকা অগ্রিম দিয়ে গেছেন। তার মানে, কাল কেয়াকে আদিত্য মন খুলে পার্ক স্ট্রিটে ট্রিট করতে পারবে। বারবার কেয়া খাওয়াবে এটা হতে দেওয়া যায় না। দরকারের সময় এই রকম অযাচিতভাবে টাকা এসে গেলে ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ টেবিলের ওপরে রাখা আদিত্যর মোবাইলটা বেজে উঠল। অচেনা নম্বর। আদিত্য ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে ঈষৎ পাতলা গলায় ভেসে এল, 'আমি কি আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, বলুন। আমিই আদিত্য মজুমদার।'

'আদিত্যবাবু আমার নাম গোবিন্দ রায়। আপনার ফোন নম্বরটা খুন হবার আগে ফিরদৌস আমাকে দিয়েছিল। আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার খুব দরকার।'

আদিত্যর নামটা মনে পড়ে গেল। গোবিন্দ রায়। কুমুদিনীর সব থেকে পুরোনো এজেন্ট। সে মুখে বলল, 'আপনি কি কুমুদিনী বিত্ত নিগমের এজেন্ট গোবিন্দ রায় বলছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিই কুমুদিনীর গোবিন্দ রায়। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার। সামনা-সামনি দেখা করে কিছু বলতে চাই।'

কথাগুলো খুব কেটে কেটে আসছে। মনে হয় যেখান থেকে গোবিন্দ রায় কথা বলছে সেখানে ভাল সিগনাল পাওয়া যায় না। হয়তো জায়গাটা কলকাতার বাইরে। কিংবা হয়তো ঝড়-বৃষ্টির জন্য এরকম হচ্ছে।

আদিত্য থেমে থেমে বলল, 'আপনি কবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

মনে হয় কথাগুলো গোবিন্দ রায় ভাল করে শুনতে পেল না। সে আবার বলল, 'আপনার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করে কথা বলা দরকার। টেলিফোনে কথাগুলো বলা যাবে না।'

'কবে দেখা করবেন?'

'পরশুদিন দেখা করা যাবে? আমি কাল রাত্তিরের আগে কলকাতা পৌঁছতে পারব না। পরশু সকালে দেখা করতে পারবেন?'

ভাগ্যক্রমে সিগনালটা একটু ভাল হয়েছে। আদিত্য গোবিন্দ রায়ের কথাগুলো এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

সে বলল, 'ঠিক আছে। পরশু সকাল এগারোটা নাগাদ আমার অফিসে চলে আসুন। আমার অফিসটা বউবাজার স্ট্রিট মানে এখন যার নাম বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, তার ওপরে। সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে বউবাজার স্ট্রিট ধরে বিবাদী বাগের দিকে এগোলে আমার অফিসটা ডান হাতে পড়বে। বাড়ির নাম বিনানি ম্যানসন। পাঁচতলা বাড়ি। আমার আপিস দোতলায়। গেটে শ্যামল বলে একজন সিকিউরিটি বসে থাকে। তাকে বললেই আমার অফিসটা দেখিয়ে দেবে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন?'

'শুনতে পাচ্ছি। পরশু সকাল এগারোটার সময় আপনার অফিসে পৌঁছে যাব। একটা অনুরোধ। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি এটা দয়া করে পুলিশকে বলবেন না। পুলিশ কিন্তু আমাকে খুঁজছে। দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে যাবে। তাহলে দরকারি কথাগুলো বলাই হবে না। ফিরদৌস বলেছিল আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পুলিশ কিচ্ছু জানতে পারবে না। আপনি এগারোটায় চলে আসুন।'

আদিত্য মোবাইলটা পকেটে পুরে দেখল বৃষ্টি একেবারে থামেনি বটে, তবে অনেকটা কমেছে। এই সুযোগে বেরিয়ে পড়তে হবে।

৪

যে আর্দ্র, কৃষ্ণ মেঘমালা সুদূর দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের অনন্ত ঊর্মিরাশি থেকে উৎপন্ন হয়ে হাজার হাজার ক্রোশ উত্তাল জলপথ অতিক্রম করতে করতে প্রতি মুহূর্তে আরও আরও শক্তি সঞ্চয় করছিল, গতকাল বিকেলে বাংলার নরম, সবুজ মাটির প্রলোভনে সে স্থলপথে প্রবেশ করে। আজ সেই মেঘমালা সকাল থেকে শহরের ওপর অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। যেন এই শহরের শরীরে মিশে যাওয়াই তার শেষতম লক্ষ্য। কাল রাত্তিরে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির বেগ সামান্য কমেছিল, না হলে আদিত্য বাড়ি পৌঁছতেই পারত না। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি তার গত রাতের সাময়িক বিচ্যুতি কড়ায় গণ্ডায় পূরণ করে দিচ্ছে। আদিত্য মগ্ন হয়ে বৃষ্টি দেখছিল। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো জানলার কাঁচের ওপর পড়ে, ভেঙে, ছড়িয়ে গিয়ে, পদহীন সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে নিচে নেমে আসছে।

ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজতে চলল। আদিত্যর বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল আজ সন্ধেবেলা কেয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা। কেয়া কি আসতে পারবে? সে-ই বা যাবে কী করে? কেয়াকে একটা ফোন করলে হত।

ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে গেল। এরকম তো সচরাচর হয় না। কোথায় গেল কেয়া? আদিত্যর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। আর পরের মুহূর্তেই তার মনে হল বাবাকে বাদ দিলে সে তো কখনও কারও জন্যে এরকমভাবে চিন্তা করেনি। ভেবে আদিত্যর ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। নিজের অজান্তেই সে কেয়ার জন্য চিন্তা করতে শুরু করেছে। একেবারে অন্যরকম একটা অনুভব।

আবার ফোনটা লাগাল আদিত্য। আবার অনেকক্ষণ ধরে ফোনটা বেজে গেল। আদিত্য চিন্তিত মুখে বাথরুমে ঢুকল। বেরিয়ে আবার ফোনটা লাগাল, আবার বেজে গেল ফোনটা। ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে।

জানলায় বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির থেকে এখন ঝোড়ো হাওয়াটাই বেশি। কেয়ার একটা হদিশ করতে পারলে মুহূর্তটা খুব উপভোগ করা যেত। কিন্তু এখন কিছুই ভাল লাগছে না। গান শুনতেও ইচ্ছে করছে না। আদিত্য ইন্টারনেট খুলে দেখল বিকেলের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি নাকি বাংলাদেশের দিকে সরে যাবে। খবর কাগজের হেডলাইনগুলোতে চোখ বোলাল। আরও দু-বার ফোন লাগাল, উত্তর নেই।

মিনিট কয়েক পরে যখন আদিত্য কফির কাপটা মুখে তুলে প্রথম চুমুকটা দিতে যাবে, ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। কেয়া।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কতবার ফোন করলাম। ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল।' কথাগুলো আদিত্যর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'আদিত্য মজুমদার আমার জন্য চিন্তা করছিল? ও মা আমি কোথায় যাব!' কেয়া কি ঠাট্টা করছে? খুশি হয়েছে? বিরক্ত?

'কোথায় গিয়েছিলে বলবে তো?' আদিত্য ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'কোথায় যাব আবার? নিচে খাবার ঘরে চা খেতে খেতে গল্প করছিলাম। আজ সব স্কুলে রেনি ডে হয়ে গেছে। স্কুলের দিদিমণিদের সকলের ছুটি। তাই সবাই মিলে গল্প করছিলাম। খেয়াল করিনি মোবাইলটা ওপরে ফেলে এসেছি।'

'আর কখনও ওপরে মোবাইল ফেলে রেখে নিচে বসে গল্প করবে না। আমার খুব চিন্তা হয়।' আদিত্য নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে কথাগুলো বলছে।

'আর কখনও এরকম করব না গো।' কেয়ার গলাটা হঠাৎ ভীষণ নরম শোনাল। একটু থেমে সে বলল, 'তোমাকে ঠিক চারটের সময় তোমার মেসের সামনে থেকে তুলে নেব। ঝড়বৃষ্টি তার আগেই তো চলে যাচ্ছে।'

'ঝড়বৃষ্টি চলে যাচ্ছে? কী করে জানলে?'

'সবাই জানে। টিভিতে বারবার বলছে। তুমি আঁতেল বলে টিভি দেখ না। তাই দরকারি খবরও জানতে পার না।'

আদিত্য ভাবল একবার বলে সেও ইন্টারনেট থেকে খবরটা পেয়েছে। কিন্তু সেকথা না বলে সে শুধু বলল, 'চারটের সময় আমি নিচে দাঁড়িয়ে থাকব। কিন্তু তোমার ছাত্র পড়ানো?'

'বৃষ্টির জন্যে আজ টোলও বন্ধ।'

বৃষ্টির বিকেলের জন্য কেয়া মন্দ প্ল্যান করেনি। চারটের সময় যখন সে আদিত্যকে তুলে নিল তখনও আদিত্য জানত না তারা কোথায় যাচ্ছে। বৃষ্টি সমানে পড়ে যাচ্ছে। খুব আস্তে নয়, আবার এতটাই জোরে নয় যে রাস্তায় জল জমে যাবে। বৃষ্টির বোধহয় বাংলাদেশ যাবার ইচ্ছেটা চলে গেছে। বেরনোর আগে আদিত্য ইন্টারনেটে দেখল হাওয়া মোরগ বলছে, মাঝরাত্তির অব্দি কলকাতায় এরকম ঝড়বাদল চলবে।

'থিয়েটার রোডের পেছনে, শর্ট স্ট্রিটে একটা রেস্টোরেন্ট আছে। আমরা বন্ধুরা মিলে কয়েকবার গেছি। রেস্টোরেন্টটা দোতলায়। দোতলার জানলা থেকে রাস্তার উল্টোদিকে একটা সবুজ পার্ক দেখা যায়। চমৎকার লাগে। আমরা এখন সেখানে গিয়ে কফি খেতে খেতে বৃষ্টি দেখব। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ওখানে বা অন্য কোথাও ডিনার খাব।' গাড়ি চলতে শুরু করার পর কেয়া জানাল।

'ওখানে কফি নিয়ে অনেকক্ষণ বসতে দেবে?'

'বসতে দেবে বলেই তো ওখানে যাচ্ছি। আসলে ওখানে বেলা সাড়ে-তিনটে অব্দি বুফে লাঞ্চ চলে। আবার সন্ধে আটটা থেকে বুফে ডিনার শুরু হয়। এই মাঝখানের সময়টা রেস্টোরেন্টটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। তখন কফি নিয়ে বসে থাকলে ওরা কিচ্ছু বলে না। আমি বসে দেখেছি।'

আদিত্য ভাবল জিজ্ঞেস করে 'কার সঙ্গে ওখানে বসতে?'। কিন্তু সাহস পেল না। কী দরকার ঘুমন্ত অতীতকে জাগিয়ে? সে তার বদলে জিজ্ঞেস করল, 'রেস্টোরেন্টটার নাম কী?'

'ভাইনইয়ার্ড। খুব ভাল কন্টিনেন্টাল করে। ইন্ডিয়ানও করে, তবে সেটা সাদামাটা।'

'ভিনইয়ার্ড। আঙুরের খেত।' আদিত্য মৃদুস্বরে বলল।

'ওই হল। আমি তোমার মতো সাহেবি ইস্কুলে পড়িনি যে অত উচ্চারণ শিখব। বহরমপুর জেলা ইস্কুলে পড়েছি। ক্লাস ফাইভ অব্দি ইংরিজিই ছিল না।' কেয়া আদিত্যর সাহেবিয়ানাকে পাত্তাই দিল না।

কেয়ার চরিত্রের এই দিকটা আদিত্যর খুব ভাল লাগে। কোনও ব্যাপারে তার কোনও হীনমন্যতা নেই। সে আসলে যা, তাই নিয়ে মহাখুশি। সে যা নয় বা হতে পারেনি, তাই নিয়ে তার কোনও দুঃখ নেই। কেয়া সহজ, সরল, কাঁচের মতো স্বচ্ছ। আদিত্য ভাবে, এই একটা ব্যাপারে সে যদি কেয়ার মতো হতে পারত, তাহলে জীবনটা আরও অনেক সুন্দর কাটত। আদিত্য জানে তার মধ্যে অনেক জটিলতা আছে, অনেক অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তি। টাকা-পয়সার অপূর্ণতা নয়, আধ্যাত্মিক অপূর্ণতা। যা আসলে আত্মম্ভরিতার আরেকটা রূপ। যা মানুষকে সুখী হতে দেয় না। কেয়া আধ্যাত্মিকভাবে তার তুলনায় অনেক পূর্ণ।

'কী ভাবছ জানলার দিকে তাকিয়ে?' কেয়া জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি, সকালে অতবার ফোন করলাম, একবারও তো জিজ্ঞেস করলে না কেন?'

'কেন আবার? তুমি নিজেই তো বললে আমার জন্যে তোমার খুব চিন্তা হয়। সেই জন্যে অতবার ফোন করলে।'

'কেন চিন্তা হয় বলত?'

'কেন আবার? আমার জন্যে তোমার খুব টান।' কেয়া বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হাসল। তারপর নিজের কথায় নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল।

'সেসব ছাড়াও অন্য কারণ আছে।' আদিত্য গম্ভীর মুখে বলল। 'কিছুদিন আগে টিভিতে দেখলাম রাজারহাটে একটি অল্প বয়সী মেয়েকে কারা যেন খুন করে তার সব টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। কলকাতা শহরে এরকম তো আজকাল মাঝে মাঝেই হচ্ছে। খুব সাবধানে থেকো।'

'তুমি টিভি দেখ?'

'এমনিতে খুব একটা দেখা হয় না। সেদিন রত্নাদের বাড়ি গিয়ে দেখছিলাম।'

'আরে ওসব খুন-টুন হয় রাজারহাট নিউটাউন, সল্ট লেক, বাইপাস এইসব ফাঁকা ফাঁকা জায়গায়। আমাদের বাগবাজারে এসব হয় না। তাছাড়া আমি তো আর একা থাকি না। হস্টেলে পাঁচজনের সঙ্গে থাকি। আমার কীসের ভয়? ওই মেয়েটা একা-একা থাকত।'

'তুমি জান মেয়েটার কথা?'

'না জেনে উপায় কী? কদিন ধরে ওটাই তো খালি টিভিতে দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছে আর পুলিশের শ্রাদ্ধ করছে। পুলিশ এখনও কাউকে ধরতে পারেনি। তবে মেয়েটাও মনে হয় ভাল ছিল না। একটা নাইট ক্লাবে কাজ করত। ওই নাইট ক্লাবেরই মালিকের সঙ্গে থাকত। রাজারহাটের ওই বাড়িটায়। সেই রাত্তিরে লোকটা

নাকি দিল্লিতে ছিল। পুলিশকে তার প্রমাণও দিয়েছে। তাই পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। অদ্ভুত নাম লোকটার। পিটার অরোরা। কী জাত কে জানে?'

'নাম শুনে মনে হয় পাঞ্জাবি। মেয়েটার নাম কী?'

'মেয়েটার নাম পল্লবী। পল্লবী ভদ্র। বাঙালি। আর যে নাইট ক্লাবে মেয়েটা কাজ করত সেটার নামটাও অদ্ভুত। বুটলেগার। ক্লাবটা নাকি রাজারহাটের দিকেই। বুটলেগার মানে কী গো?'

'বুটলেগার মানে যারা বেআইনি জিনিসপত্র বিক্রি করে। বিশেষ করে বেআইনি মদ।'

আদিত্য আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। 'বুটলেগার' নামটা সে সম্প্রতি কোথায় যেন শুনেছে। টেলিভিশনে নয়। অন্য কোথাও। কুমুদিনীর ব্যাপারে কোথাও? একটু ভাবলেই মনে পড়ে যাবে। বৃষ্টিটা আবার ঝেঁকে এল। সামনের কাঁচটা ঝাপসা হয়ে আসছে। ড্রাইভার ওয়াইপারের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

'আবার কী ভাবছ?'

'ভাবছি, বাগবাজার হোক, মেয়েদের হস্টেল হোক, যাই হোক, তুমি সাবধানে থাকবে। সাবধানের মার নেই।'

কেয়া চুপ করে রইল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা পাউচ বার করল। মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার গিফটটা দেখবে না?'

আদিত্য দেখল পাঁচশ গ্রাম খাঁটি দার্জিলিং চা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

গোবিন্দ রায় এল না। আদিত্য তার আপিসে বসে আছে তো বসেই আছে। এগারোটা বেজে গেল, সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, এক সময় বারোটাও বেজে গেল। সাড়ে বারোটার সময় আদিত্য গোবিন্দ রায়ের নম্বরে ফোন করল। নম্বরটা সে কাল সেভ করে রেখেছিল। ফোন সুইচ অফ। লোকটার বিপদ হল নাকি?

পৌনে একটা নাগাদ একটা ফোন এল। পুলিশ ইন্সপেক্টার সোমেন মুখুটি ফোন করেছে।

'কেমন আছেন স্যার?'

'ভাল আছি। আপনার তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?'

'দু-একটা লিড পেয়েছি। সেইজন্যেই আপনাকে ফোন করলাম। ফিরদৌসের দু-টো ফোন, দু-টো নম্বর। দু-টো নম্বরই আমাদের আই টি ডিপার্টমেন্টকে দিলাম। ওরা বলে দিয়েছে খুন হবার আগের এক সপ্তাহ কার কার সঙ্গে ফিরদৌসের ফোনে কথা হয়েছিল। সেই ফোনগুলো কার কার নামে রেজিস্টার্ড সেটাও জানা গেছে। আপনি কি লিস্টটা একবার দেখবেন?'

'অবশ্যই দেখব। ওটা কি মেলে পাঠানো সম্ভব হবে? আমার মেল আইডিটা টেক্সট করে দিচ্ছি।'

'পাঠিয়ে দেব স্যার। আপনি ওটা ভাল করে স্টাডি করুন।'

'আর কিছু পেলেন?'

'আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম কুড়ি লক্ষ ইউ এস ডলার কলকাতার হাওয়ালা বাজারে কোথাও ভাঙানো হয়েছে কিনা। সেরকম কিছু ট্রেস করতে পারিনি। হয়তো এখনও টাকাটা ভাঙানো হয়নি।'

'ল্যাপটপটা দেখেছিলেন?'

'ল্যাপটপে কিচ্ছু নেই। থাকার মধ্যে অনেকগুলো সিনেমা ডাউনলোড করা আছে। আর কিছু হিন্দি সিনেমার গান। ফিরদৌস মনে হয় খুব সিনেমা দেখত। বিশেষ করে সে যখন সিতারা হোটেলে লুকিয়ে রয়েছে, সারাদিন হাতে কাজ নেই।'

'আর কিছু?'

'আপনার মনে আছে একটা ফাঁকা নীল রঙের ব্যাগ ফিরদৌসের ঘরে পাওয়া গিয়েছিল? খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম গত বড়দিনের সময় ওইরকম কয়েকটা ব্যাগ কুমুদিনী কম্পানি কয়েকজনকে গিফট করেছিল। ফিরদৌসও পেয়েছিল একটা। তাছাড়া কম্পানির ক্লায়েন্ট হিসেবে জাহাঙ্গির খানও একই রকম দেখতে একটা ব্যাগ পেয়েছিল। আমি জাহাঙ্গির খানের বডিগার্ড সহদেবকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি জাহাঙ্গিরের নীল ব্যাগটা করেই সেদিন ফিরদৌস কুড়ি লক্ষ ইউ এস ডলার নিয়ে রওনা হয়েছিল। জামিলও একই কথা বলল। জামিল আর সহদেব তো ফিরদৌসের সঙ্গেই ছিল।'

'ঠিক বলেছেন। ফিরদৌস বলেছিল ব্যাগের টাকাগুলো বটুক সামন্তকে দেবার পর সে ফাঁকা ব্যাগটা সহদেবকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ব্যাগটা নিয়ে সহদেব আর জামিল হালিশহর ফিরে গিয়েছিল। জাহাঙ্গিরের কম্পানিতে ব্যাগটা এখনও টাকা বয়ে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। কম্পানির ম্যানেজার তারক দাস যেদিন প্রথম সহদেবকে নিয়ে আমার কাছে আসে, সেদিন তার হাতে ব্যাগটা ছিল। তারক দাস আমাকে বলেছিল কিছু পেমেন্ট কলকাতা থেকে তার নেবার ছিল। সেগুলো নিয়ে সে ব্যাগে রেখেছে। তাই বডিগার্ড হিসেবে সহদেব তার সঙ্গে রয়েছে। ফিরদৌসের ব্যাগটা দেখে ওই ব্যাগটার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরদৌসের ঘরে ঠিক ওই রকম আর একটা ব্যাগ কেন থাকবে বুঝতে পারছিলাম না।

আপনার কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি ফিরদৌসও একই রকম দেখতে একটা ব্যাগ কম্পানি থেকে পেয়েছিল।'

'আমি কিন্তু একটা অন্য কথা ভাবছিলাম স্যার।'

আদিত্যর মনে হল, সোমেন মুখুটি দরকারি কিছু একটা বলার জন্য নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। আদিত্য তাকে উৎসাহিত করার জন্য বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি ভাবছিলাম স্যার, এমন কি হতে পারে ফিরদৌস তার নিজের ব্যাগে এক কোটি টাকা নিয়ে গাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল? পরে সুবিধে মতো সে কুড়ি লক্ষ ডলারের ব্যাগটার সঙ্গে এক কোটি টাকার ব্যাগটা বদলা বদলি করে দেয়। এবং বটুক সামন্তকে এক কোটির ব্যাগটা দিয়ে আসে। হয়তো বটুক সামন্তকে সে আগেই বলে রেখেছিল এক কোটি টাকা নিয়ে সে যাচ্ছে?'

'এক্সেলেন্ট, সোমেনবাবু। এক্সেলেন্ট। আপনি যেটা বললেন সেটা খুবই সম্ভব। তবে আপনার থিয়োরিটা সাবস্ট্যানশিয়েট করার জন্য আর একটু প্রমাণ লাগবে।'

'আমি তো প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্যে লেগে রয়েছি স্যার। যদি কিছু পাই আপনাকে জানাব।'

'আচ্ছা, আপনি কি বটুক সামন্তর অফিসটা একবার দেখতে যাবেন? গেলে আমাকে একবার নিয়ে যাবেন প্লিজ।'

'নিশ্চয় নিয়ে যাব স্যার। অ্যাডিশানাল কমিশানার আমাকে বলেছেন আপনি যেতে চান। আমি কাল পরশুর মধ্যে একদিন যাব। আপনাকে জানাব কবে যাচ্ছি। আজ বিকেলে অবশ্য আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এই কুমুদিনীর ব্যাপারেই। আপনার যদি হাতে সময় থাকে আমার সঙ্গে আসবেন?'

'কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'রণপ্রিয় ঘোষাল। সবাই বলে রনি ঘোষাল। নিউ এজ মুভিস-এর প্রোডাকশান ম্যানেজার। ওই রোহিত ধামানির কম্পনিটা যারা কুমুদিনীর কাছ থেকে কুড়ি কোটি টাকা ধার চেয়েছিল। রোহিত ধামানি বিদেশে। তাই ওদের ম্যানেজারটাকে ধরলাম। সে যদি কিছু বলতে পারে। অনেক ধানাই পানাই করে সে আজ বিকেল সাড়ে চারটেতে সময় দিয়েছে। আপনি যাবেন?'

'অবশ্যই যাব। আমি সোয়া চারটের মধ্যে লালবাজারে পৌঁছে যাচ্ছি। ওখান থেকে এক সঙ্গে রওনা হওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে স্যার। আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

রনি ঘোষালের বাড়ি টালিগঞ্জে। টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোড থেকে দক্ষিণ দিকে একটা গলি ঢুকে গেছে, তার মধ্যে। চারতলা বাড়ি, এক-একটা তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। সাধারণ মধ্যবিত্তদের ফ্ল্যাট যেমন হয়। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢোকার মুখে লেটার বক্স, ইলেকট্রিকের মিটার। এক কোণে ময়াল সাপের মতো পাকানো আলগা কেবল টিভির তার ডাঁই করে রাখা। কয়েকটা সাইকেলের সঙ্গে একটা স্কুটারও দাঁড় করানো রয়েছে। রনি ঘোষালের ফ্ল্যাটটা চারতলায়। লিফট নেই। সিঁড়িটা সরু। হতশ্রী। বোঝাই যায়, প্রত্যেক তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট বার করতে গিয়ে সিঁড়ির পরিসরে টান পড়েছে।

চারতলায় উঠতে গিয়ে আদিত্য ঈষৎ হাঁপিয়ে উঠছিল। সিগারেট। সোমেন মুখুটি কিন্তু বেশ ফিট। বেল বাজাতে মধ্যবয়স্কা পরিচারিকা দরজা খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমরা লালবাজার থেকে এসেছি। রনি ঘোষাল এখানে থাকেন?' সোমেন মুখুটি পুলিশি গলায় বলল।

'দাদাবাবু চানে গেছেন। আমাকে বলেছেন আপনাদের বসাতে।'

আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। পৌনে পাঁচটা বাজে। এই অবেলায় কেউ চানে যায়?

পরিচারিকা বোধহয় আদিত্যর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে। আদিত্যদের বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'একটু আগে দাদাবাবু কাজ থেকে ফিরেছে। খাওয়া-দাওয়া কিচ্ছু হয়নি। এই চান করতে

গেল।'

ভেতরে ঢুকেই একটা অগোছাল বসার ঘর। বেতের সোফা সেট। সোফার কোণে ধুলো জমেছে। সেন্টার টেবিলের ওপর ডাঁই করা পুরোনো খবর কাগজ, ম্যাগাজিন, ইংরেজি পেপারব্যাক। এক দিকে খাবার টেবিল। একটা ক্যাবিনেট কাম বুক কেস বসার জায়গা থেকে খাবার টেবিলটাকে খানিকটা আড়াল করে তাকে আংশিক আবরু দিয়েছে। সোফার ওপর বসতে বসতে আদিত্য লক্ষ করল খাবার টেবিলের ওপর রনি ঘোষালের মধ্যাহ্ন ভোজন ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

আদিত্য বুক কেসের বইগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। বইগুলো সেভাবে সাজানো নেই। ইংরেজি বেস্ট-সেলারের পাশে মোটা অ্যাকাউন্টেন্সির বই। গীতবিতান। শারদীয় বাংলা সিনেমা পত্রিকা। সোমেন মুখুটি টেবিলের ওপর থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে পাতা ওল্টাচ্ছে।

ওরা কেউই টের পায়নি কখন রনি ঘোষাল নিঃশব্দে শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে এসে ঢুকেছে। 'আপনাদের বসিয়ে রাখার জন্য সত্যিই খুব লজ্জিত। সকালে কাজে এমন আটকে গেলাম, ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল।' রনি ঘোষালের গলাটা আন্তরিক শোনাল। গলার আওয়াজটা বেশ গমগমে।

আদিত্য দেখল বছর তিরিশের এক যুবক। তার মাথার চুল ভেজা, বোঝা যায় সদ্য স্নান সেরে এসেছে। পরনে পাজামা, গাঢ় নীল ফতুয়া-পাঞ্জাবি। শ্যামলা গায়ের রঙ, লম্বা হাড়ালো শরীর। তার মুখের আদলে সুমনা ঘোষালের মুখাবয়বের স্পষ্ট ছাপ আছে। রনি ঘোষাল মাতৃমুখী সন্তান।

'ইনি ইন্সপেক্টর সোমেন মুখুটি। লালবাজার থেকে এসেছেন। আমি ওঁর সঙ্গে এসেছি। আমার নাম আদিত্য মজুমদার। পেশায় আমি একজন'

'আমি আপনার কথা জানি আদিত্যবাবু। আপনি কে আমাকে বলতে হবে না। আপনি যে কুমুদিনীর কেসটা ইনভেস্টিগেট করছেন সেটাও আমার মা আমাকে বলেছে। আর ইন্সপেক্টার মুখুটির সঙ্গে আমার তো ফোনেই কয়েকবার কথা হয়েছে। আপনারা বসুন। চা খান। আমাকে যদি অনুমতি দেন আমি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিতে পারি। সেই সকাল থেকে ঘুরছি। কিচ্ছু খাওয়া হয়নি।' রনি ঘোষালের শেষের কথাগুলো খুব কুণ্ঠিত শোনাল।

সোমেন মুখুটি কিছু বলার আগেই আদিত্য দরাজ গলায় বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি খেয়ে নিন। আমরা বসছি।'

রনি ঘোষাল খেতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা এসে গেছে। নিশ্চয় এর প্রস্তুতিপর্ব আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

'সন্ধ্যাদি, ভাত তুলে নাও। এই অবেলায় এত ভাত খেলে শরীর টিসটিস করবে।'

'কিচ্ছু টিসটিস করবে না। ওই কটা তো ভাত। খেয়ে নাও।' অন্তরাল থেকে সন্ধ্যাদির গলা শোনা গেল।

'তাড়াতাড়ি তুলে নাও। নইলে খাওয়া শুরু করতে পারছি না। এঁরা বসে আছেন। তাড়াতাড়ি করো।'

'খাবার গরম আছে তো? তুমি চান করতে ঢোকার সময় গরম করেছি।' সন্ধ্যাদি ভাত তুলতে এসে জিজ্ঞেস করল।

আদিত্য লুকিয়ে টেবিলের ওপর দৃষ্টি দেবার লোভ সামলাতে পারল না। দেখল, প্লেটে ভাতের সঙ্গে দুটি বেগুন ভাজা, আলুভাতের ওপর কাঁচা লঙ্কা গাঁথা। পাশে একটা বাটিতে ডাল, আর একটাতে পুরুষ্টু কাতলার পেটি একটা ডুমো করে কাটা আলুকে সঙ্গে নিয়ে কালচে ঝোলের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। মন্দ কী? আদিত্য ভাবল, তার নিজের এত ভাল খাওয়া জোটে না।

কিছু পরে যখন রনি খাওয়া শেষ করে আদিত্যদের সঙ্গে এসে বসেছে, সোমেন মুখুটি জিজ্ঞেস করল, 'আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'একটা লোকেশনের খোঁজে। কাকদ্বীপের কাছে। শুটিং-এর ডেট ঠিক হয়ে গেছে অথচ লোকেশন ঠিক হয়নি। বহু কষ্টে হিরো-হিরোইনের ডেট পাওয়া গেছে। লোকেশন পাচ্ছি না বলে সেটা যদি পিছিয়ে দিতে

হয়, তাহলে আমার চাকরিটা চলে যাবে। তাছাড়া প্রোডাকশানেরও বড় ক্ষতি।'

'লোকেশন ঠিক হল?' সোমেন মুখুটিই প্রশ্ন করছে।

'মোটামুটি ঠিক হয়েছে। আসলে গঙ্গার ধারে একটা ডান্স সিকোয়েন্স তোলা হবে। ডিরেক্টর লোকেশনটা দেখবেন, কোরিওগ্রাফার দেখবেন। তাঁরা অ্যাপ্রুভ করলে তবে ফাইনাল হবে। আমার অবশ্য মনে হয় লোকেশনটা বেশ ভাল, অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে।'

'এটা কি আপনাদের সেই ফেরারি বলে ছবিটার শুটিং?' এবার আদিত্য প্রশ্ন করল।

'বাঃ। আপনি তো অনেক খবর রাখেন। হ্যাঁ, এটা সেই ছবিটাই।'

'এই ছবিটার শুটিং বিদেশে হবার কথা ছিল না? আলাস্কা না কোথায় যেন?'

'হ্যাঁ। আলাস্কার টনগ্যাস ন্যাশানাল ফরেস্ট-এ। প্রডিউসারের টাকা নেই বলে সেই প্ল্যানটা বাতিল করা হয়েছে। ফলে ছবির গল্পটাও পালটে দিতে হয়েছে। গল্প পালটালে বোধহয় ছবির নামটাও বদলাতে হবে। অবশ্য এর আগে ছবির একটা পার্ট ইয়োরোপে শুটিং হয়ে গেছে।'

'ফেরারি নাম আর থাকবে না?' আদিত্য নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল।

'গল্প বদলে গেলে কী করে আর থাকবে? ফেরারির দু-টো মানে ছিল। একটা হল ফেরারি গাড়ি। আর একটা ফেরারি মানে ফিউজিটিভ। প্রথমে ভাবা হয়েছিল ছবিটাতে দু-টো মানেই অ্যাপ্লিকেবল হবে। হিরো ফেরারি গাড়ি চেপে আলাস্কার জঙ্গলে ফেরারি হয়ে যাবে। হাসবেন না, আদিত্যবাবু। আমাদের দর্শকরা এসব খুব খায়। তাছাড়া অল্প খরচে আলাস্কা দেখার সুযোগও কেউ ছাড়ত না। এখন পয়সার অভাবে সব ঘেঁটে গেল।'

'হঠাৎ পয়সার অভাব ঘটল কেন?' সোমেন মুখুটি প্রশ্ন করল।

'দেখুন আমি তো সবটা জানি না। আমি এই কম্পানিতে চাকরি করি মাত্র। তবে যেটুকু শুনেছি বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি সেইটুকুই বলুন না।' আদিত্য ব্যগ্রভাবে বলল।

'জানেন তো আমাদের কম্পানির মালিক ধামানি সাহেবের আসল ব্যবসা হিরের। আনকাট হিরে কিনে উনি দেশে সেটা কাটিয়ে অ্যামস্টারড্যাম-এর হিরের বাজারে বিক্রি করেন। শুনেছি কোনও কারণে সেই ব্যবসায় ওঁর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই তিনি এখন সিনেমায় টাকা ঢালতে পারছেন না।'

'আচ্ছা, কুমুদিনীর কাছ থেকে আপনাদের কুড়ি কোটি টাকা ধার নেবার কথা ছিল না?' সোমেন মুখুটি সরাসরি রনির চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

রনি কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। তারপর খানিকটা দ্বিধাজড়িত গলায় বলল, 'দেখুন, এই ধার-টার নেবার ব্যাপারগুলো হাই লেভেল পলিসি ডিসিশান। এগুলো আমাদের কম্পানির বড় কর্তা ধামানি সাহেব ঠিক করেন। আমি এসব ব্যাপারে কী করে জানব?'

'আপনি এ-ব্যাপারে কিছু শোনেননি?' সোমেন মুখুটি আবার জিজ্ঞেস করল।

'কিছু ভাসা ভাসা গুজব শুনেছিলাম।'

'কী শুনেছিলেন?'

'শুনেছিলাম, আলাস্কায় শুটিং হলে অনেক টাকার দরকার পড়বে। তখন কিছু টাকা কুমুদিনী থেকে ধার নেওয়া হবে।'

'কুমুদিনীর থেকে ধার নিয়ে তো এখনও আলাস্কায় শুটিং হতে পারে।' আদিত্য মন্তব্য করল।

'না আদিত্যবাবু। পুরোটা ধার নিয়ে একটা এত বড় প্রোডাকশান চলতে পারে না। কিছু টাকা প্রোডিউসারকে ঢালতেই হয়। প্রোডিউসার নিজে কিছু ইনভেস্ট না করলে ফাইন্যান্সারই বা টাকা ধার দেবে কেন?'

'আপনাদের কম্পানির মালিক রোহিত ধামানি এখন কোথায়?' সোমেন মুখুটি জিজ্ঞেস করল।

'শুনেছি ব্যবসা সামলানোর জন্যে ইয়োরোপের কোথাও আছেন। আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, কুমুদিনীর কাছ থেকে কুড়ি কোটি ধার নিয়ে ধামানি সাহেব সেই টাকাটা ব্যবসা পুনরুদ্ধারের কাজে লাগিয়েছেন? অর্থাৎ টাকাটা ধামানি সাহেব কুমুদিনীর কাছ থেকে পেয়ে গেছেন?' সোমেন জেরা করে যাচ্ছে।

'এটাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ওই যে বললাম, এসব হাই লেভেলের ডিসিশান। আমি নেহাতই চুনোপুঁটি। তাছাড়া ধামানি সাহেব তাঁর হিরের ব্যবসার জন্য যদি টাকা ধার করেন সেটা আমি কী করে জানব? হিরের ব্যবসাটা তো অন্য একটা কম্পানির নামে।'

'আর একটা প্রশ্ন। যদি ধামানি সাহেব ফেরারি ছবির জন্যে কুমুদিনীর কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন, তাহলে কি সেটা ডলারে নিতেন?'

'ডলারে?' রনি ঘোষালকে কিছুটা হতভম্ভ দেখাচ্ছে। 'ডলারে কেন?'

'কারণ অ্যামেরিকায় গিয়ে আপনাদের তো ডলারই খরচ করতে হত।'

রনি ঘোষাল কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বলতে পারব না। এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই। আমি শুধু প্রোডাকশানের দিকটা দেখি।'

'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। আদিত্যবাবু, আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন?' সোমেন মুখুটি সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসল।

'কিছুদিন আগে স্টুডিও পাড়ায় গুজব রটেছিল যে আপনি কাউকে কিছু না বলে বেপাত্তা হয়ে গেছেন আর সেই জন্যে 'ফেরারি' ছবির শুটিং বন্ধ রয়েছে। গুজবটা কি সত্যি?' আদিত্য খানিকটা আক্রমণের ভঙ্গীতে প্রশ্নটা করল।

প্রশ্নটা শুনে রনি ঘোষাল একটু থতমত খেয়ে গেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'দেখুন, 'ফেরারি' ছবির শুটিং কিছুদিন বন্ধ ছিল এটা সত্যি। কিন্তু সেটা আমি কাউকে কিছু না বলে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলাম বলে নয়। শুটিং বন্ধ ছিল টাকার অভাবে। আমি যখন দেখলাম শুটিং হচ্ছে না তখন বসকে বলে কিছুদিন ছুটি নিয়েছিলাম। দিল্লিতে আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ ছিল। যে হোটেলে আমি আগে কাজ করতাম সেখানে কিছু টাকা-পয়সা পাওনা ছিল। সেই টাকা উদ্ধার করতে আমি ছুটি নিয়ে কয়েক দিনের জন্য দিল্লি গিয়েছিলাম।' রনি ঘোষাল উত্তর শেষ করে পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে আদিত্যর দিকে তাকাল।

আদিত্য বলল, 'আমার দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে। উত্তর দিতে ইচ্ছে না করলে দেবেন না।'

রনি ঘোষালের মুখে সামান্য চিন্তার ছায়া পড়েছে।

'এই বাড়িটা কি আপনার নিজের? নাকি ভাড়া?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'এই বাড়িটা আমার মা সুমনা ঘোষালের। মা নিজে এখানে থাকে না। আমাকে থাকতে দিয়েছে।'

'আপনার মা কবে কিনেছিলেন এই বাড়িটা?'

'অনেক দিন আগে। বোধহয় আমার জন্মের বছর সাত-আট আগে। মা তখনও অভিনেত্রী হিসেবে ততটা নাম করতে পারেনি। টালিগঞ্জের কাছে একটা বাসস্থানের দরকার হয়ে পড়েছিল। তখন মা অল্প দামে এই বাড়িটা কেনে। বোধহয় দিদিমারও কিছু টাকা ছিল।'

'আপনার মা এই বাড়িতে কতদিন বসবাস করেছেন?'

'খুব অল্প দিন। এই বাড়িতে উঠে আসার কিছুদিনের মধ্যেই মার সাকসেস শুরু হয়। এই বাড়িতে থাকাটা মার স্টেটাসের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। মা নিউ আলিপুরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে যায়।'

'আপনার ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছিল?'

'খুব ছোটবেলায় মার সঙ্গে থাকতাম। তারপর হস্টেলে হস্টেলে বড় হয়েছি।'

'এই বাড়িটায় আপনি কবে থেকে আছেন?'

'কলেজ জীবন অব্দি হস্টেলে থেকেছি। বি কম পাশ করার পর মা এম বি এ পড়াল। কলকাতায় নয়, ব্যাঙ্গালোরে। তারপর কিছুদিন নয়ডায় চাকরি করলাম। মাইনে ভাল নয়, তার ওপর প্রচণ্ড খাটনি। আর পেরে উঠছিলাম না। মার সঙ্গে ধামানি সাহেবের বহুদিনের পরিচয়। ধামানি সাহেবকে বলে মা নিউ এজ মুভিজ-এ একটা চাকরি জোগাড় করে দিল। তখন থেকেই এই বাড়িতে আছি। বাড়িটা বহুদিন ফাঁকা পড়েছিল। এখানে প্রায় ছবছর হতে চলল আমার।'

'মা আর দিদিমা ছাড়া আপনার আর কোনও আত্মীয় নেই?'

রনি ঘোষালের চোয়াল শক্ত হল। মুখে কাঠিন্যের ছায়া পড়ল। সে থেমে থেমে বলল, 'আপনি যদি আমার পিতৃ-পরিচয় জানতে চান সেটা আমি আপনাকে জানাতে পারব না। কারণ আমি নিজেই সেটা জানি না। এ-ব্যাপারে মাকে অনেক জিজ্ঞেস করেও কোনও উত্তর পাইনি। মা ছাড়া আমার আর কোনও আত্মীয় নেই। দিদিমা বহুদিন হল মারা গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রনি ঘোষাল ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আপনাদের যদি প্রশ্ন করা হয়ে গিয়ে থাকে, দয়া করে আমাকে এবার অব্যাহতি দিন। সারাদিন খুব পরিশ্রম গেছে। একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

'আমার প্রশ্ন যদি কোনওভাবে আপনাকে আঘাত করে থাকে আমি ক্ষমা চাইছি। আমি কিন্তু সত্যিই অত কিছু ভেবে প্রশ্নটা করিনি।' সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতে আদিত্য বলল।

২

রনি ঘোষালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আদিত্য খেয়াল করল সে ল্যাপটপটা আপিসে ফেলে এসেছে। তার মানে একবার আপিস হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। সামনের গেটটা বন্ধ করে শ্যামল বাড়ি চলে গেলে মুশকিল। পেছনে একটা দরজা আছে। সেটা সাধারণত বন্ধ থাকে। আদিত্যর কাছে সেই দরজার একটা চাবি আছে বটে কিন্তু চাবিটা আপিসেই রয়ে গেছে। শ্যামলের অবশ্য সন্ধে আটটা অব্দি ডিউটি করার কথা। তার আগে আদিত্য নিশ্চয় পৌঁছে যাবে। কিন্তু শ্যামল মাঝে মাঝে আটটার অনেক আগেই কেটে পড়ে। আদিত্য শ্যামলকে ফোন করে বলল সে আটটার মধ্যে আপিসে পৌঁছচ্ছে। শ্যামল যেন তার আগে গেট বন্ধ করে চলে না যায়। সাবধানের মার নেই।

সাড়ে সাতটা নাগাদ আদিত্য চাবি খুলে তার আপিসে ঢুকতে যাবে হঠাৎ তার নজরে এল এক কোনায় একজন লোক চাদর দিয়ে মুখের অনেকটা ঢেকে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। লোকটা আদিত্যকে দেখে উঠে দাঁড়াল। আদিত্য তার দিকে তাকাতে সে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি গোবিন্দ, কুমুদিনীর গোবিন্দ রায়। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম।'

'আপনার তো সকাল এগারোটায় আসার কথা ছিল। আমি সাড়ে বারোটা অব্দি আপনার জন্য অপেক্ষা করলাম। সকালে এলেন না কেন?'

'ভেতরে গিয়ে বলছি। আপনি অফিসের দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলুন প্লিজ।' বলতে বলতে লোকটা সিঁড়ির দিকে তাকাল। কেউ উঠে আসছে কিনা দেখার জন্যে। আদিত্যর মনে হল লোকটা ভয় পেয়েছে।

'আসুন।' আদিত্য দরজা খুলে আপিসের ভেতরে ঢুকল। পেছন পেছন লোকটা।

'বসুন।' ঘরের আলো জ্বালিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে আদিত্য বলল। 'এবার বলুন কী ব্যাপার।'

লোকটা চেয়ারে বসেছে। আদিত্য আগে খেয়াল করেনি, লোকটার পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক ছিল। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আজকাল যেমন পিঠে ব্যাগ নেয়। লোকটা তার ব্যাগটাকে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। এতক্ষণ পরে আদিত্য লোকটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেয়েছে। তামাটে রঙ, তোবড়ানো গাল, পাকানো চেহারা। গালে দু-তিন দিনের না কামানো দাড়ি। চোখে ধূর্ত সতর্কতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ মিশেছে।

আদিত্য সিগারেটের প্যাকেট বার করে লোকটার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটার সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরাল। আদিত্য চাইছে লোকটা নিজের থেকে কথা বলতে শুরু করুক।

লোকটার মধ্যমা ও তর্জনীর মধ্যে ধরা সিগারেটটা সামান্য কাঁপছে। খানিকক্ষণ নীরবে ধূমপান করার পর লোকটা বলল, 'এক গ্লাস জল হবে?'

আদিত্য উঠে গিয়ে বোতল থেকে এক গ্লাস জল ভরে লোকটাকে দিতেই সে ঢকঢক করে এক ঢোঁকে জলটা খেয়ে ফেলল। আর ঠিক তখনই দরজায় খটখট শব্দ। লোকটা চমকে উঠেছে। কাতর গলায় বলল, 'একটু দেখে খুলবেন, প্লিজ।'

আদিত্য দরজা খুলে দেখে শ্যামল। 'আমি তাহলে বাড়ি যাচ্ছি? সামনের গেটটা বন্ধ করে দিলাম। আপনি পেছনের গেটটা দিয়ে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দেবেন।'

গোবিন্দ রায়ের দিকে শ্যামলের নজর পড়ল। 'দেখা হয়েছে তাহলে?' সে গোবিন্দ রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর শ্যামলকে বলল, 'এই ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছিলেন। তার একটু আগে আপনি ফোন করে বললেন আপনি আসছেন তাই একে দাঁড়াতে বললাম।' কথাগুলো বলে শ্যামল চলে গেল।

আদিত্য চেয়ারে ফিরে এসে গোবিন্দ রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার বলতে শুরু করুন। রাত্তির হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। আমি খুব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় ফিরদৌসের যে অবস্থা হয়েছে, আমারও সেটা হতে পারে।'

'মানে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেউ আপনাকে খুন করতে পারে?' আদিত্য সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। ঠিক যেভাবে ফিরদৌস খুন হয়েছে।'

'ফিরদৌস কেন খুন হল? আপনাকেই বা কেউ খুন করতে চাইবে কেন?'

'ফিরদৌস যে কারণে খুন হয়েছে, আমার ভয় আমিও হয়তো সেই কারণেই খুন হব।'

'কারণটা কী?'

'কারণটা আমি এখানে বসে আপনাকে বলতে পারব না।'

'যদি না বলতে পারেন তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'আপনার কাছে একটা কারণেই এসেছি, আদিত্যবাবু। আমি জানি পুলিশের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা খুব ভাল। আপনি বলে দিলে পুলিশ আমাকে প্রোটেকশন দিতে পারে। আমার অনেক কিছু বলার আছে। পুলিশ যদি আমাকে প্রোটেকশন দেয় তাহলে আমি পুলিশকে সব বলব।'

ব্যাপারটা আদিত্যর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। সে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যদি পুলিশকে সব কথা বলতে চান তাহলে তো সরাসরি পুলিশের কাছেই যেতে পারেন। আমি এর মধ্যে আসছি কোথায়?'

'আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। দেখুন পুলিশের মধ্যে অনেক ঘুণ আছে। কুমুদিনীতে এত বছর কাজ করতে করতে এটা আমি জেনে গেছি। আমি যদি নিজে সরাসরি পুলিশের কাছে যাই তাহলে হয়তো আমি যেটা পুলিশকে বলব সেটা ঠিক জায়গায় পৌঁছবেই না। উলটে আমারই প্রাণ সংশয় হবে। তাই আপনার মাধ্যমে আমি একেবারে পুলিশের ওপরমহলে পৌঁছতে চাইছি। সকলেই জানে অ্যাডিশানাল কমিশানার গৌতম দাশগুপ্ত আপনার বন্ধু। এটাও সকলে জানে যে অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেবের সততা নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। খুন হয়ে যাবার কয়েক ঘণ্টা আগে ফিরদৌস আমাকে ফোন করেছিল। ও খুব জোর দিয়ে আপনার কথা বলেছিল। আপনার ফোন নম্বরটাও ওর কাছ থেকে পেয়েছি।'

গোবিন্দ রায় থামল। সম্মতির আশায় আদিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনাকে হ্যাঁ-না বলার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করব। প্রথম কথা, সুদর্শন শিকদার বলে যে ইন্সপেক্টার কুমুদিনীর কেসটা দেখছিলেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অন্য একজন পুলিশ অফিসার কেসটা ইনভেস্টিগেট করছেন। এই রদবদলটা গৌতমের নির্দেশেই হয়েছে। আপনি কি এটা জানেন?'

'না আমি এটা জানতাম না। এটা খুব ভাল হল।' গোবিন্দ রায়ের মুখটা খানিকটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

'তাহলেও কি আপনি সরাসরি পুলিশের কাছে যেতে ভয় পাবেন?'

গোবিন্দ রায় কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'যে ইনফর্মেশনটা আমি দিতে চাই সেটা খুবই গোপনীয়। যদি একেবারে খোদ বড়কর্তাকে খবরটা দিতে পারি তাহলেই ভাল হয়। একটা ফোকর বন্ধ হয়েছে বলে পুলিশের মধ্যে সব ফাঁক-ফোকর বন্ধ হয়ে গেছে এমন তো নয়।'

'ঠিক আছে। বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, আপনি যে ইনফর্মেশনটা দিতে চান সেটার সঙ্গে কি ওই কুড়ি লক্ষ ইউ এস ডলারের কোনও সম্পর্ক আছে?'

গোবিন্দ রায় খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আছে। গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু তার থেকে বেশি আমি এখন বলতে পারব না।'

'একটা জিনিস বলুন। বটুক সামন্ত বলছে, ফিরদৌস ওকে এক কোটি টাকা পৌঁছে দিয়েছিল। কুড়ি লক্ষ ডলার নয়। আবার ফিরদৌস বলছে এক কোটি টাকা নয়, পুরো কুড়ি লক্ষ ডলারই ও বটুক সামন্তর হাতে তুলে দিয়েছে। কে সত্যি বলছে, আপনার মনে হয়?'

গোবিন্দ রায় আবার অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'কে সত্যি বলছে আমি বলতে পারব না। ফিরদৌস আমাকে বলেছিল সে কুড়ি লক্ষ ডলারই পৌঁছে দিয়ে এসেছে। সেটা সত্যি কিনা আমি জানি না। তবে কুমুদিনীতে এক কোটি টাকা এসেছিল। কে এনেছিল বলতে পারব না। কিন্তু টাকাটা কোথায় গেছে সেটা আন্দাজ করতে পারি।'

'এক কোটি টাকা কোথায় গেছে সেটা বলতে কি আপনার অসুবিধে আছে?'

'স্বাভাবিক অবস্থায় বলতাম না। কিন্তু এখন আপনার কথার উত্তর না দিলে আপনিও আমার অনুরোধ রাখবেন না। তাই আমি যতটুকু জানি, বলছি। আমার তারিখ মনে থাকে না। তবে ঘটনাটা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে ঘটেছিল। কুমুদিনীর কাজে আমাকে অনেক সময় নর্থ বেঙ্গলে ঘুরতে হয়। সেদিন আমি কলকাতায় এসেছিলাম। অফিসে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। আমি বটুকবাবুর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় বটুকবাবুর সেক্রেটারি শৌভিক নন্দ ঘরে ঢুকে বলল, পিটার অরোরা এসেছে। বলে রাখি, পিটার অরোরার নাইটক্লাবে কুমুদিনীর কিছু ইনভেস্টমেন্ট আছে। পিটারকে ঘরে ঢুকতে দেখে বটুকবাবু আমাকে বলল, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোসো। আমি পিটারের সঙ্গে কথাটা সেরে নিয়ে তোমাকে ডাকছি। পিটারের হাতে একটা নীল ব্যাগ ছিল।'

'নীল ব্যাগ? কী রকম নীল ব্যাগ?'

'বড় নীল ব্যাগ। ওই রকম অনেকগুলো ব্যাগ গত বড়দিনে কম্পানি কিনেছিল। ক্লায়েন্টদের গিফট দিয়েছিল। আমরাও কেউ কেউ পেয়েছিলাম। পিটারও নিশ্চয় গিফট হিসেবে কুমুদিনীর কাছ থেকে ব্যাগটা পেয়েছিল।'

'ব্যাগটা কি খালি ছিল? না ভর্তি?'

'জানি না। চেন টানা ছিল।'

'তারপর কী হল বলুন। আপনি বাইরে গিয়ে কোথায় বসলেন?'

'কুমুদিনীর আপিসে আমার একটা বসার জায়গা আছে। কিন্তু আমি সেখানে না বসে শৌভিকের সামনের চেয়ারটাতে বসলাম। কয়েক দিন কলকাতায় ছিলাম না। ভাবলাম, শৌভিকের কাছ থেকে কলকাতার খবরাখবর জানা যাবে।'

'তারপর?'

'একথা সেকথার পর শৌভিককে জিজ্ঞেস করলাম পিটার অরোরা কী করতে এসেছে? শৌভিক বলল, জান তো পিটার ওর নাইট ক্লাবের ভেতরে একটা ইল্লিগাল গ্যাম্বলিং জয়েন্ট চালায়। আমি বললাম, সে তো অনেক দিন ধরেই চালাচ্ছে। শৌভিক বলল, সেখানে এতদিন চাকতি দিয়ে জুয়ো খেলা হতো। রোজ ক্লাব খোলার পর টাকা দিয়ে চাকতি কেনো, তাই দিয়ে জুয়ো খেল, তারপর ক্লাব বন্ধ হবার সময় যে চাকতিগুলো সঙ্গে রয়েছে সেগুলো কাউন্টারে ভাঙিয়ে নাও। এই ছিল সিস্টেম। কিছুদিন আগে তাই নিয়ে গোলমাল হয়েছে। কিছু লোক নাকি জাল চাকতি, মানে যেটা পিটারের ক্লাবের নয়, সেসব ভাঙাবার চেষ্টা করেছিল। সেই থেকে জুয়ো খেলা বন্ধ। শুনলাম, আবার নাকি গ্যাম্বলিং শুরু হবে। তবে এবার চাকতি দিয়ে নয়। নগদ টাকা দিয়ে। বটুকবাবু পিটারকে পাঁচশোর নোটে এক কোটি টাকা জোগাড় করে দিচ্ছেন। আমার মনে হয় সেটা নিতেই পিটার এসেছে। দেখলে না হাতে বড় ব্যাগ। একটু পরে দেখলাম ব্যাগ নিয়ে পিটার বেরিয়ে গেল। ব্যাগের ভারে একদিকে ঝুঁকে হাঁটছে।'

'যখন পিটার ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল তখন কি ঝুঁকে হাঁটছিল?'

'না তখন সোজাই হাঁটছিল।'

'তার মানে তখন ব্যাগটা ফাঁকাই ছিল।'

'তখন অত ভেবে দেখিনি। এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'অন্য একটা প্রশ্ন। আপনি সকালে এলেন না কেন?'

'আমি ঠিক সময়েই এসে যেতাম। আপনাদের গেট দিয়ে ঢোকার আগে উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে নজর রাখছিলাম। লক্ষ করলাম একজন পুলিশের খোচড় গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকতে গেলেই ধরবে। আমি আস্তে আস্তে ফিরে গেলাম। ভাবলাম, পুলিশ জানল কী করে ঠিক এগারোটা নাগাদ আমি এখানে আসব? তারপর একটু ভাবতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। পুলিশ নিশ্চয় ফিরদৌসের কলার লিস্ট চেক করে আমার নম্বরটা পেয়েছে। নম্বরটা পুলিশ ট্যাপ করেছে। আপনার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে সবই পুলিশ জানে। তাই আমাকে ধরার জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার মোবাইলটা সঙ্গে সঙ্গে অফ করে দিলাম।'

আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'ঠিক আছে গোবিন্দবাবু। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কথা অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেবকে বলব। আশা করছি তিনি আপনার সঙ্গে শিগগির দেখা করবেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কী করে?'

'আমি শেয়ালদা স্টেশনের উল্টোদিকে একটা হোটেলে আছি। আমার হোটেলের ঘরের ফোন নম্বরটা এই কাগজে লেখা আছে।' গোবিন্দ রায় পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে আদিত্যর দিকে এগিয়ে দিল। 'আমি সারাদিন হোটেলেই থাকব। আপনার ফোনের অপেক্ষায়।'

'একটা খবর আপনি নিশ্চয় জানেন।' আদিত্য গোবিন্দ রায়কে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল। 'পল্লবী ভদ্র বলে যে মেয়েটি পিটার অরোরার নাইটক্লাবে কাজ করত সে খুন হয়েছে। তার বাড়িতে ডাকাতিও হয়েছে। আপনি মেয়েটিকে চিনতেন?'

গোবিন্দ রায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার মুখে নানারকম অভিব্যক্তি খেলে যাচ্ছে আতঙ্ক, বিস্ময়, সন্দেহ, অবিশ্বাস। প্রায় মিনিট খানেক পরে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সে বলল, 'পল্লবী ভদ্রকে আমি ভালই চিনতাম। তার বয়ফ্রেন্ডকেও চিনতাম। দু-জনে মাঝে মাঝে কুমুদিনীর আপিসে আসত। পরে বোধহয় ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তখন পল্লবী একাই পিটারের কাগজপত্র নিয়ে কুমুদিনীর আপিসে আসত। পিটার মেয়েটাকে খুব বিশ্বাস করত। কিন্তু সে খুন হয়েছে! কী করে হল? আর আমি খবরটাই জানতাম না!' গোবিন্দ নিজের মনেই বিড়বিড় করছে।

'আপনি টিভি দেখেন না? টিভিতে খবরটা তো বারবার দেখিয়েছে।'

'আমি গত এক সপ্তাহ টিভি দেখিনি। যেখানে এই এক সপ্তাহ লুকিয়ে ছিলাম সেখানে টিভি ছিল না। কবে এটা হল?'

'খুন এবং ডাকাতির ঘটনাটা ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগে। কিন্তু বাড়িতে আর কেউ ছিল না বলে অনেক পরে ব্যাপারটা পুলিশ জানতে পেরেছে।'

'কেউ ধরা পড়েছে?'

'আমি যতদূর জানি এখন অব্দি কেউ ধরা পড়েনি।'

কথা বলতে বলতে দুজন বাড়ির পেছন দিকের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। গোবিন্দ রায়কে এখনও খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'চললাম। আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।' রাস্তায় নেমে গোবিন্দ রায় বলল। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বউবাজার স্ট্রিটের ভিড়ে মিলিয়ে গেল সে।

৩

বাড়ি পৌঁছে আদিত্য গৌতমকে ফোন করেছিল। তার মনে হচ্ছিল গোবিন্দ রায়ের ব্যাপারটা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। ফোন করতে গৌতম জানাল সে মুম্বাইতে। একদিনের জন্য কনফারেন্স করতে গেছে। আগামীকাল ভোরের ফ্লাইটে ফিরবে। গৌতম বলল, আগামীকাল বিকেল চারটের আগে সে গোবিন্দ রায়কে সময় দিতে পারছে না। চারটের সময় আদিত্য যেন গোবিন্দ রায়কে নিয়ে লালবাজারে চলে আসে। সেই রাত্তিরেই গোবিন্দর হোটেলের নম্বরে ফোন করে গৌতমের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল আদিত্য। গোবিন্দ বলেছে সে নিজেই পৌনে চারটা নাগাদ লালবাজারের মেন গেটে চলে আসবে।

পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ আদিত্য সবে আপিসে পৌঁছে কেটলিতে কফির জল বসিয়েছে এমন সময় দরজায় প্রবল করাঘাত। নক নক নয়, দুম দুম করে কেউ দরজায় ঘা দিচ্ছে। আদিত্য দরজা খুলে অবাক। নূপুর মণ্ডল!

'আদিত্যদা! তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে না জানিয়ে চলে এলাম! ভাল করিনি?' নূপুর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে।

'খুব ভাল করেছ। এবার ঠাণ্ডা হয়ে বোসো। কফি খাবে তো?'

'তুমি বানালে নিশ্চয় খাব।'

নূপুরকে দেখে আদিত্যরও খুব ভাল লাগছে। চন্দ্রলেখা অন্তর্ধান-এর কেসটার সময় নূপুর তাকে খুব সাহায্য করেছিল। তারপর চাকরি নিয়ে নূপুর ব্যাঙ্গালোর চলে গেল। আদিত্যর সঙ্গে যোগাযোগটাও কমে এল। মেয়েটার ওপর আদিত্যর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল।

নূপুর আরও রোগা হয়েছে। তার রঙটা এমনিতেই চাপা, যেন আর একটু পুড়েছে।

'রোগা হয়ে গেছ কেন? ব্যাঙ্গালোরে খাবার পাও না?' আদিত্য কাপে কফির জল ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল।

'যে রাঁধুনিটাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম সে অনেক দিন হল পালিয়ে এসেছে। এখন একটা কন্নড় বউ রান্না করে। যেটা রান্না করে সেটা মুখে দেওয়া যায় না। যেমনি ঝাল, তেমনি টক। অফিসেও খুব খাটনি। সব মিলিয়ে ওখানে আর পোষাচ্ছিল না। তাই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে এলাম।'

কথাটা বলে নূপুর মিটিমিটি হাসছে। মুখে একটা 'কেমন দিলুম?' ভাব। আদিত্যর আধ মিনিট লাগল খবরটা হজম করতে। হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে আদিত্য বলল, 'চাকরি ছেড়ে চলে এলে? এখানে কিছু পেয়েছ?'

'আর পরের গোলামি করব না আদিত্যদা। আমার দুজন ব্যাঙ্গালোরের রুম মেট আর আমি মিলে একটা কম্পানি খুলেছি। কনসাল্টেন্সি ফার্ম। নাম দিয়েছি ই-কিয়োর। ব্যাঙ্গালোরে বসেই দু-তিনটে কাজের বরাত পেয়েছি। সেক্টর ফাইভে একটা স্পেস ভাড়া করেছি। ওটাই আমাদের আপিস। ভাব কী আমাকে?' নূপুর হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা ভিজিটিং কার্ড আদিত্যকে দিল।

'কলকাতায় থাকছ কোথায়?'

'বাগুইআটিতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। তিনটে শোবার ঘর আছে। একটা বসার ঘর। তিনজনেই ওখানে থাকব। আমার বন্ধুরা দুজনেই আমার মতো মফস্বলের মেয়ে। একজনের বাড়ি মেদিনীপুর টাউনে। আর একজন মালদার। সেদিক থেকে আমাদের খুব মিল হয়েছে। এখন ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পারলে হয়।'

'বেশ, বেশ। খুব ভাল কথা। তবে জানো তো, ব্যবসা দাঁড় করাতে গেলে প্রথম দিকে খুব খাটতে হয়। তার জন্যে প্রস্তুত থেকো।'

'খাটতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে কিনা আগে কাজ আসুক তার পরে তো খাটব। এখন যে কটা কাজ এসেছে সেগুলো আমার বন্ধুরাই সামলে দিচ্ছে। ওরা আমার সিনিয়ার, কাজের অভিজ্ঞতাও বেশি। তাই প্রথম কাজগুলো ওরাই করছে। তাতে কম্পানির সুনাম হবে।'

'তাহলে তুমি এখন কী করছ? বাড়িতে বসে আরাম করছ?'

'না, না। আরাম করব কী? ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করছি। তাছাড়া অফিসটা সাজানোর দায়িত্বও আমার। ফ্ল্যাটটাও।'

'তাহলে তো তুমি এখন খুবই ব্যস্ত। আমি ভাবছিলাম, তোমার হাতে তেমন কোনও কাজ না থাকলে আমার একটা কাজ তোমাকে করে দিতে বলব। চন্দ্রার ব্যাপারটায় তুমি আমায় খুব সাহায্য করেছিলে।' আদিত্য হালকা করে একটা প্রস্তাব হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

'আদিত্যদা, তুমি যদি আমাকে একটা চাকরি দাও তাহলে সব কাজ ছেড়ে আমি তোমার কাজটা করব। তোমার কাজে যে থ্রিল আছে, রুটিন কন্সাল্টিং-এর কাজে তার ছিটেফোঁটাও নেই। তুমি শুধু বল আমায় কী করতে হবে।' নূপুরকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

'দেখো নূপুর, তোমাকে পাকাপাকি কাজ দেবার ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই। থাকলে তোমার মতো চালাক-চতুর মেয়েকে আমি কখনই ছাড়তাম না। আসল কথা হল, আমার নিজেরই রোজগারের ঠিক নেই। আমি কী করে একজনকে পাকাপাকিভাবে সহকারি হিসেবে রাখব? আমি ভাবছিলাম, যেহেতু তুমি এখন ফ্রিলান্স কন্সাল্টিং-এর কাজ করছ, তাই দরকার মতো আমিও তোমার সার্ভিসটা মাঝে মধ্যে পেতে পারি কিনা। অবশ্য আমি তোমার কাছ থেকে যে সার্ভিসটা চাইব সেটা, বলাই বাহুল্য, রুটিন কন্সাল্টিং নয়।' আদিত্যর গলাটা কিছুটা রক্ষণাত্মক শোনাল।

নূপুর মাথা নিচু করে তার নিজের আঙুলগুলো নিয়ে খেলছে। আদিত্য জানে, তার মানে সে গভীরভাবে চিন্তা করছে। একটু পরে সে বলল, 'তোমার কাজটা কতদিনের? কত ঘণ্টা লাগবে কাজটা করতে?'

'কাজটা আর কিছু নয়। একজন অতীত দিনের অভিনেত্রীকে একটা সিনেমা পত্রিকার সাংবাদিক সেজে ইন্টারভিউ করতে হবে। অভিনেত্রীটি এখন রিটায়ার্ড। ধর, একটু লম্বা ইন্টারভিউ। এই ঘণ্টা দুয়েকের। তার আগে অবশ্য মহিলাটির সম্বন্ধে ভাল করে রিসার্চ করে নিতে হবে। সবার আগে, ইন্টারভিউ দেবার ব্যাপারে মহিলাকে রাজি করাতে হবে। পারবে করতে?'

'এ আর এমন কী কাজ? নিশ্চয় পারব।'

'কাজটা ওপর ওপর সহজই মনে হয়। কিন্তু আসলে ততটা সহজ নয়। ভদ্রমহিলার একটা গোলমেলে অতীত আছে। ইন্টারভিউ করতে করতে সেই অতীতটাকে টেনে বার করতে হবে। ভদ্রমহিলা খুব সহজে ওপেন আপ করবেন বলে মনে হয় না। এটা করানোর জন্যে তোমাকে একটু বুদ্ধি খরচ করে ভদ্রমহিলার মনস্তত্ত্বটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমার মনে হয় তোমার সেই বুদ্ধিটা আছে। আমি ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে

যতটুকু জানতে পেরেছি তোমাকে বলে দেব। অবশ্য তার কতটা সত্যি আর কতটা সিনেমা পত্রিকাগুলোর গসিপ আমি বলতে পারব না।'

'কাজটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমি কাজটা করব। আমার এখন অন্য কাজের যা চাপ তাতে কাজটা করতে অসুবিধে হবে না। কাকে ইন্টারভিউ করতে হবে?' নূপুরের গলায় উৎসাহ উপচে পড়ছে।

'দাঁড়াও। তোমাকে কাজটা দেবার আগে আমার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে একটা পারমিশান নিয়ে নিই। আফটার অল, তোমার পারিশ্রমিকটা তো তিনিই দেবেন।' আদিত্য মোবাইলে নুসরতের নম্বরটা লাগাল।

'নমস্কার আদিত্যবাবু। আপনার কাজ কেমন এগোচ্ছে?' ওদিক থেকে শোনা গেল।

'কাজ খানিকটা এগিয়েছে ম্যাডাম। তবে কিছু জট এখনও ছাড়াতে হবে। সাবিনা ম্যাডামের সঙ্গে কবে কথা বলা যাবে?'

'সাবিনার সঙ্গে এখনই কথা বলা যেতে পারত। কিন্তু সমস্যা হল সাবিনা এখনও হালিশহরেই আছে। হালিশহরে এসে আমার স্বামীর চোখ এড়িয়ে সাবিনার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। আপনি আর দু-তিন দিন অপেক্ষা করুন। সাবিনা কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় যাবে। তখন ওর সঙ্গে কথা বলাটা অনেক সেফ।'

আদিত্য খুব দ্রুত চিন্তা করছিল। জাহাঙ্গির খানকে তাহলে পুলিশ এখনও অ্যারেস্ট করেনি। গৌতম যে বলেছিল, পুলিশ শিগগিরই জাহাঙ্গিরকে অ্যারেস্ট করবে? ব্যাপারটা খোঁজ নিতে হবে। সে মুখে বলল, 'ম্যাডাম, তদন্তের জন্যে আমার দুজন অ্যাসিস্টেন্ট লাগবে। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা এক্সট্রা খরচ হবে। আপনার অ্যাপ্রূভাল চাই। পরে আপনাকে ডিটেলে হিসেব দেব।'

'কোনও অসুবিধে নেই। আপনি অ্যাসিস্টেন্ট নিয়ে নিন।'

'আমি জানতাম আপনি আপত্তি করবেন না। থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। সাবিনা কলকাতায় এলে আমাকে প্লিজ জানাবেন। ওর সঙ্গে কথা বলাটা খুব দরকার।'

আদিত্য ফোন রাখতেই নূপুর বলল, 'আমি ছাড়া তোমার আরও অ্যাসিস্টেন্ট আছে নাকি, আদিত্যদা?'

'আছে তো। বিমলকে তুমি বোধহয় দেখেছ। তাকে অন্য একটা কাজের ভার দিতে হবে।'

'বিমল? ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে বিমল। কোথায় যেন সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে। খুব হুঁশিয়ার ছেলে। যাগগে, তুমি আমার কাজটা এবার বল।'

'বসো বলছি। আর একটু কফি খাবে?'

'না আদিত্যদা, আমি অতবার চা-কফি খেতে পারি না। তুমি খাও।'

আদিত্য আবার কফি বানাল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তুমি বাংলা সিনেমা দেখ?'

'না আদিত্যদা। আমি বাংলা, হিন্দি, ইংরিজি কোনও সিনেমাই দেখি না। টানা দু-তিন ঘণ্টা সিনেমা হলে বসে থাকতে আমার খুব বোর লাগে। তার থেকে বরং মল বা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো অনেক ইন্টারেস্টিং। কত অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ দেখা যায়।'

'সিনেমা যখন দেখ না তখন তোমাকে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে হবে। একদিক থেকে ভালই হল। ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে তোমার কোনও পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা থাকবে না। যাকে ইন্টারভিউ করতে হবে তার নাম সুমনা ঘোষাল। যৌবনে দু-একটা ছবিতে হিরোইন হয়েছিলেন, তেমন সুবিধে করতে পারেননি। তারপর থেকে ক্যারেকটার আর্টিস্ট। কিছুদিন মুম্বাইতে থেকে হিন্দি সিরিয়াল করেছেন। কলকাতাতেও কিছু সিরিয়াল করেছেন। তবে আজকাল আর তেমন সুযোগ পান না। সুমনা ঘোষালের মা সুনয়নাও পেশাদার মঞ্চের অভিনেত্রী ছিলেন। তুমি তোমার ইন্টারভিউটা সুমনার মায়ের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করতে পার। সুমনার পিতৃ-পরিচয় ঈষৎ ঘোলাটে। মা-ই সুমনাকে বড় করেছেন। তাই মায়ের ব্যাপারে সুমনার একটা দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। সুমনার নিজের একটা ছেলে আছে। সেই ছেলেটির বাবার পরিচয় সুমনা প্রকাশ করে না। এই বিষয়ে যদি আর কিছু জানতে পার খুব ভাল হয়। আমি সুমনা সম্বন্ধে যেটুকু নোট করেছি তোমাকে স্ক্যান

করে পাঠিয়ে দেব। তাছাড়াও তুমি দেখো আর কী তথ্য জোগাড় করতে পার। খুব ওয়েল-প্রিপেয়ার্ড হয়ে ইন্টারভিউটা নিতে যাবে। তোমাকে যেন অ্যামেচার বলে সন্দেহ না করে।'

'আমি কোন পত্রিকার তরফ থেকে ইন্টারভিউটা নিতে যাব?'

'নতুন কোনও পত্রিকা। যেটা এখনও বেরোয়নি। যেটার প্রথম ইসুতেই সুমনা ঘোষালের ইন্টারভিউটা বেরোবে। পত্রিকার একটা ভাল দেখে নাম ঠিক করে আমাকে জানিও। আমি দেখছি সুমনা ঘোষালের ফোন নম্বরটা জোগাড় করতে পারি কিনা।'

'আমার কিন্তু একটু জানা দরকার কেন এই সুমনা ঘোষালের ব্যাপারে তুমি এত ইন্টারেস্টেড। নাহলে আমি ঠিক কী করছি বুঝতেই পারব না।'

'একদম ঠিক কথা। আমি তোমাকে পুরো কেসটা খুলে বলছি। তোমার হাতে সময় আছে তো?'

আদিত্যর সঙ্গে কথা বলে নূপুর যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। ফোনটা এল তার ঘণ্টা খানেক পরে। আদিত্য তখন লাঞ্চ শেষ করে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

'আমি সাব ইন্সপেক্টার চাকি বলছি স্যার। আমাকে মনে আছে। সেদিন আপনাকে সিতারা হোটেলে নিয়ে গেলাম।'

'খুব মনে আছে। বলুন কী ব্যাপার।'

'সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে স্যার। শেয়ালদার কাছে একটা হোটেলে গোবিন্দ রায় বলে একজন খুন হয়েছে। মুখুটি স্যার বললেন, কুমুদিনীর গোবিন্দ রায়, আপনাকে বললেই আপনি বুঝতে পারবেন। মুখুটি স্যার ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে গেছেন। আমাকে বলেছেন আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে। আপনি এখন কোথায় আছেন স্যার?'

আদিত্য সত্যিই কথা বলতে পারছিল না। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হল। কেউ তার কাছে আশ্রয় চাইল, স্বীকারোক্তি করল, অথচ আদিত্য তাকে বাঁচাতে পারল না। নিজেকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করছে। এই প্রফেশনে থাকার যোগ্যতা তার আছে কি?

চাকি বোধহয় ভাবছে ফোনটা কেটে গেল। সে ওপার থেকে 'হ্যালো, হ্যালো' করছে।

আদিত্য খুব কষ্ট করে বলল, 'আমি আমার অফিসে আছি। বউবাজারের ওপর, বিনানি ম্যানশনে আমার অফিস। সেন্ট্রাল এভিনিউ বউবাজার স্ট্রিট মোড় থেকে দু-তিন মিনিট। বউবাজার তো ওয়ান-ওয়ে। আপনাকে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর দিক থেকেই আসতে হবে। ওদিক থেকে এলে অফিসটা আপনার ডানদিকে পড়বে। আমি নিচে নেমে দাঁড়াচ্ছি। আপনি চলে আসুন।'

বৃষ্টির পরে অসম্ভব গরম পড়েছে। শুধু গরম নয়, তার সঙ্গে আর্দ্রতা। আদিত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে যাচ্ছিল। গলাটা শুকিয়ে আসছে। আদিত্য পাশের পানের দোকান থেকে একটা ঠান্ডা জলের বোতল কিনল। এক ঢোঁকে পুরো বোতলের জলটা খেয়ে শরীরটা ভারী লাগছিল। অথচ গলাটা আবার শুকিয়ে আসছে। আদিত্যর মনে হল, গরমের জন্যে নয়, গোবিন্দ রায়ের খুনের খবরটা পাবার পর থেকে তার ভেতরে যে তোলপাড়টা চলেছে, এটা তারই ফল। তবু সে আরেক বোতল জল কিনে রাখল। দোকানিকে পয়সা দিতে দিতে দেখল একটা পুলিশের জিপ রাস্তার ডান পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আদিত্য হাত তুলে তার উপস্থিতি জানাল।

৪

হোটেলটা বড় রাস্তার ওপরে, শেয়ালদা ফ্লাইওভারের দক্ষিণ দিকে। প্রাচী সিনেমার ফুটপাথ ধরে মৌলালি মোড়ের উদ্দেশে খানিকটা এগিয়ে গেলে ডানহাতে ক্রিক রো বলে রাস্তাটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, হোটেলটা প্রায় সেখানে। হোটেলের নাম ক্রিক ভিউ। রাস্তার নামে হোটেলের নাম। যদিও রাস্তাটা একটা

ক্রিক বা ছোট নদীর মতো এঁকেবেঁকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার অব্দি চলে গেছে, দৃষ্টির মধ্যে খাল, বিল, জলাশয়, নদী, নালা কিছুই নেই। অর্থাৎ ক্রিক ভিউ মানে ক্রিক রো নামক রাস্তাটার দৃশ্য। কেউ চাইলে হোটেলের জানলা থেকে প্রাণ ভরে ক্রিক রো-র কর্মব্যস্ত পূর্ব প্রান্তটা দেখতে পারে।

আসলে কিন্তু ক্রিক রো নামটার সঙ্গে একটা ছোট্ট নদীর ইতিহাস সত্যি সত্যিই জড়িয়ে আছে। আঠেরো শতকেও এই অঞ্চলে একটা ছোট নদী ছিল। সেই সময় সল্ট লেক উপনগরীর লবণ হ্রদ বিস্তৃত ছিল শেয়ালদা-বউবাজারের মোড় অব্দি। সন্দেহ নেই, শেয়ালদা বা শিয়ালদহ-র দহ কথাটা লবণ হ্রদ থেকেই এসেছে। ছোট নদীটা শেয়ালদা-বউবাজার অঞ্চলের লবণ হ্রদ থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে ভাগীরথী নদী অব্দি বয়ে যেত। সাহেবদের পুরোনো ম্যাপে এর উল্লেখ আছে। আন্দাজ করা যায়, সেই নদীটা থেকেই ক্রিক রো নামের উৎপত্তি। নদীটা নাব্য ছিল। একটা সময় যখন পুরোনো কলকাতা নিয়ে আদিত্যর খুব উৎসাহ হয়েছিল তখন সে পড়েছিল, ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের প্রবল ঝড়ে এই নদীতে অনেক নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা থেকে নোঙর ছিঁড়ে ছিটকে আসা একটা জাহাজও ডুবে যায়। অনেকে মনে করেন, সেই ঝড়ের ফলে নদীটাতে যেসব আবর্জনা জমেছিল সেগুলোই আস্তে আস্তে নদীর নাব্যতাটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। কালের নিয়মে নদীটা মজে যাবার পর তার ওপর দিয়ে কলকাতা শহর তার শরীর বিছিয়ে দিয়েছে।

ক্রিক ভিউ হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে আদিত্যর অনেক দিন আগে পড়া এইসব পুরোনো ইতিহাস মনে পড়ে যাচ্ছিল। হোটেলের সামনে পুলিশ পাহারা। কিছু কর্মহীন কৌতূহলী মানুষ রাস্তায় ভিড় করে হোটেলের ভেতর উঁকি মারছে। চাকিকে দেখে কর্মরত কনস্টেবলটি সেলাম করে পথ ছেড়ে দিল। কনস্টেবলটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল চারতলার যে ঘরে খুনটা হয়েছে ইন্সপেক্টর মুখুটি সেখানে রয়েছেন। আদিত্যর মনে পড়ে গেল, ফিরদৌসও আর একটা হোটেলের চারতলাতেই খুন হয়েছিল। এটা অবশ্য সমাপতন হতেই পারে।

হোটেলটা সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের জন্যে। লিফট আছে, একতলায় রিসেপশনের চেহারাটাও চটকদার, উল্টোদিকের ডাইনিং হলটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যুগের নিয়ম অনুযায়ী আলো-আঁধারি। আদিত্য অনুমান করল, কাজে-কর্মে যারা শেয়ালদা স্টেশন হয়ে কলকাতায় আসে, তারাই ক্রিক ভিউ-এর মূল খদ্দের। সম্ভবত এদের বেশিরভাগই ব্যবসায়ী। আবার দূরবর্তী জেলা কিংবা রাজ্য থেকে কলকাতায় বেড়াতে আসা দু-চারটে দলও আদিত্যর চোখে পড়ল। তারা ডাইনিং হলে খেতে বসেছে। হোটেলে যে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে তারা জানে বলে মনে হল না।

লিফটে উঠে চারতলার কোণার দিকে একটা ঘরে ঘটনাটা ঘটেছে। ঘরটা খুব বড় নয়। আদিত্য ঘরে ঢুকে দেখল, একটা খাট, দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ড্রেসিং টেবিল, একটা ডেস্ক ও চেয়ার, দেয়ালে লাগানো এসি মেশিন। মেশিনটা চলছে। ঘরটা নিশ্চয় হোটেলের পেছন দিকে। ঘরে একটাই জানলা। সেটা খোলা রয়েছে। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায় না, কেবল পাশের বাড়ির একটা উঠোন চোখে পড়ে। উঠোনটা ফাঁকা।

মৃতদেহটা মেঝেতে, কার্পেটের ওপর শোয়ানো ছিল। মৃতের মুখে যন্ত্রণার কোনও ছাপ নেই। শুধু তার বুকের বাঁ দিকে গেরুয়া হাফ-হাতা পাঞ্জাবির ওপর এক খাবড়া রক্ত। শরীরে আর কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই। বোঝা যায়, একটাই গুলি মৃতের বুকের বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে হার্টটাকে ফুটো করে দিয়েছে এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যু হয়েছে তার। খুনি পেশাদার, গোবিন্দ রায়কে মারার জন্য তাকে একটার বেশি গুলি খরচ করতে হয়নি।

পুলিশের ফটোগ্রাফার ছবি তোলার তোড়জোড় করছিল। তার পেছনে সোমেন মুখুটি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে।

'আসুন স্যার। কেসটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।' সোমেন মুখুটি আদিত্যকে দেখে বলল।

'মৃতদেহটা কে আবিষ্কার করল?'

'হাউসকিপিং-এর লোক। দুপুরবেলা গোবিন্দ রায়ের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমে সে নক করে। কোনও উত্তর না পেয়ে ধরে নেয় ঘরে কেউ নেই। তখন সে নিজের স্মার্টকার্ড দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে।

ঢুকে দ্যাখে গোবিন্দ রায় জানলার কাছে মরে পড়ে আছে।'

'কখন ঘটনাটা ঘটেছে কিছু আন্দাজ পেয়েছেন?'

'পুলিশের ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। একটু আগে চলে গেলেন। উনি বললেন, রাফলি ঘন্টা চারেক আগে খুনটা হয়েছে। তার মানে ধরুন এই সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ।'

'অর্থাৎ দিন-দুপুরে খুন। কেউ কি গুলির কোনও শব্দ শুনেছে?'

'হোটেলের কর্মচারীরা কেউই কিছু শুনেছে বলে মনে করতে পারছে না। এমনিতেই এই জায়গাটায় খুব হট্টগোল। তাছাড়া ঘরটাও একটেরে। আশেপাশের ঘরগুলোতেও এখন কেউ নেই। তার ওপর খুনি হয়তো তার বন্দুকে সাইলেন্সার বা সাপ্রেসার ব্যবহার করেছিল। তাতে গুলির শব্দটা খানিকটা কমে যাবার কথা।'

'হুঁ। রিসেপশনে এসে কেউ কি গোবিন্দ রায়ের খোঁজ করেছিল?' আদিত্য চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করল।

'আমি রিসেপশনের মেয়েটিকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলাম। না। কেউই গোবিন্দ রায়ের খোঁজ করেনি। তবে মেয়েটি বলল, সকালের ভিড়ের মধ্যে কেউ রিসেপশনের সামনে দিয়ে গিয়ে লিফটে উঠে চারতলায় গোবিন্দ রায়ের ঘরে পৌঁছে গেলে সে টের পাবে না। ওই সময়ে বহু বাইরের লোক রিসেপশনের উল্টোদিকের রেস্টোরেন্টটাতে খেতে আসে, তাই রিসেপশনের জায়গাটায় খুব ভিড় হয়।'

'কিন্তু তার মানে খুনি আগে থেকেই জানত গোবিন্দ রায় কোন ঘরে রয়েছে। কে তাকে জানাল? গোবিন্দ নিজে ছাড়া আর কে জানাবে?' আদিত্য বিড়বিড় করে বলল।

'তাহলে কি স্যার ধরে নেব খুনি গোবিন্দ রায়ের চেনা লোক? গোবিন্দ রায় নিজেই তাকে দরজা খুলে নিজের ঘরে ঢুকিয়েছে?' সোমেন মুখুটি প্রশ্ন করল।

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। ফিরদৌসের ক্ষেত্রেও মনে হয় তাই হয়েছিল।' আদিত্য কিছুটা অন্যমনস্কভাবে বলল।

পুলিশের ফটোগ্রাফার নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিচ্ছে। আদিত্য বলল, 'আপনারা কি হোটেলের অন্য বোর্ডারদের জানিয়েছেন এখানে একটা খুন হয়ে গেছে?'

'এখনও জানাইনি। ফিরদৌসের বার তো পুরো তলাটাই সিল করে দিয়েছিলাম। কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার ধীরেসুস্থে এগোচ্ছি।'

আদিত্য ঘরের চারদিকটা বারবার তাকিয়ে দেখছিল। কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি আছে, সে ধরতে পারছে না। হঠাৎ অসঙ্গতিটা সে বুঝতে পারল। সে সোমেন মুখুটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা যখন এই ঘরে ঢুকলেন তখন কি ঘরটা ঠিক এই রকমই ছিল?'

সোমেন বোধহয় প্রশ্নটার গুরুত্বটা ঠিক ধরতে পারেনি। সে একটু দ্বিধাজড়িত গলায় বলল, 'এই রকমই তো ছিল। শুধু মৃতদেহটা জানলার সামনে পড়েছিল, আমরা সেটাকে সরিয়ে এনে বিছানার পাশে রেখেছি।'

'তার মানে আপনারা ঘরে ঢুকে দেখলেন জানলাটা খোলা?'

'তাই তো দেখলাম।' আদিত্যর চিন্তাটা কোনদিকে এগোচ্ছে সোমেন মুখুটি এখনও ধরতে পারেনি।

'একই সঙ্গে দেখলেন এসিটা চলছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম।' সোমেন মুখুটি একটু থতমত খেয়ে গেছে। যেন এবার ভাসা ভাসা বুঝতে পারছে আদিত্যর অস্বস্তিটা কোথায়।

'এই গরমে এসি চালানোটা স্বাভাবিক। কিন্তু এসি চালিয়েও গোবিন্দ রায় জানলাটা খুলে রেখেছিল। এটা আপনাদের অস্বাভাবিক মনে হল না?'

'আপনি বলতে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি কীভাবে এটার ব্যাখ্যা করছেন?' সোমেন কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে বলল।

আদিত্য চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, খুনি দরজা দিয়ে নয়, এই জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। নাহলে খোলা এসির সঙ্গে খোলা

জানলাটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না।'

'কিন্তু গোবিন্দ রায় নিশ্চয় খুনি ঢুকবে বলে জানলাটা খুলে রাখেনি? জানলাটা খোলা ছিল কেন?' সোমেন প্রশ্ন করল।

'জানলাটা বন্ধই ছিল। আমার ধারণা, খুনি বাইরের প্যারাপেট দিয়ে জানলার কাছে এসে একটা পাতলা লোহার স্কেল বা ওই ধরনের কিছু ঢুকিয়ে বাইরে থেকে জানলাটা খুলে ফেলেছিল। গাড়ি চোরেরা যেমন করে গাড়ির লক খোলে। সম্ভবত গোবিন্দ রায় তখন তাকে দেখতে পায়, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুনি জানলার বাইরে থেকে তাকে গুলি করে। গোবিন্দ পড়ে যাবার পর জানলা দিয়ে খুনি ঘরের ভেতরে ঢোকে। নাহলে জানলাটা এতটা খোলা থাকত না। এই সব কিছু সম্ভব হয়েছিল কারণ এই ঘরটা হোটেলের পেছন দিকে। এই দিকটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না।'

'খুনি ঘরে ঢুকল কেন? খুন করার পর প্যারাপেট দিয়েই তো পালিয়ে যেতে পারত।'

'আমার বিশ্বাস গোবিন্দ রায়ের কাছে এমন একটা কিছু ছিল যেটা নেবার জন্য খুনিকে ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। বস্তুত ওই জিনিসটা পাবার জন্যেই খুনি গোবিন্দকে খুন করেছে। জিনিসটা সম্ভবত একটা কালো রঙের ব্যাকপ্যাকে ছিল। একটা কালো ব্যাকপ্যাক ঘরে পাওয়া গেছে কি?'

'কালো ব্যাকপ্যাক? কই না তো। গোবিন্দর লাগেজ বলতে শুধু এই সুটকেসটা পাওয়া গেছে।' আয়নার নিচে রাখা একটা লাল সুটকেসের দিকে সোমেন আঙুল তুলে দেখাল। 'কিন্তু গোবিন্দ রায়ের একটা কালো ব্যাকপ্যাক ছিল আপনি জানলেন কী করে?'

'নিজের চোখে আমি ব্যাকপ্যাকটা দেখেছি। গতকাল সন্ধেবেলা গোবিন্দ রায় যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন ব্যাকপ্যাকটা তার সঙ্গে ছিল।'

'গতকাল সন্ধেবেলা গোবিন্দ রায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল!' সোমেন মুখুটি হতভম্ভ হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ। পুলিশকে তার কিছু একটা জানানোর ছিল। বলল, কথাটা গোপনীয়। কিন্তু সেই গোপন কথাটা সে আমাকে বলতে চায়নি। আমার কাছে এসেছিল যাতে পুলিশের অ্যাডিশানাল কমিশানারের সঙ্গে আমি তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে পারি। সে জানত গৌতম দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। কথাটা সে সরাসরি গৌতমকেই বলতে চেয়েছিল। আজ বিকেল চারটের সময় গৌতমের কাছে গোবিন্দ রায়কে নিয়ে যাবার কথা।'

সোমেন মুখুটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আদিত্যর কথাগুলো সে হজম করার চেষ্টা করছে। দীর্ঘ নীরবতার পর সে বলল, 'আপনার সঙ্গে যখন গোবিন্দ দেখা করতে এসেছিল তখন তার সঙ্গে একটা ব্যাকপ্যাক ছিল?'

'ছিল। আমার ঘরে বসে ব্যাগটা সে নিজের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছিল। আমার সঙ্গে যখন গোবিন্দ রায় দেখা করতে এসেছিল তখন তার চোখে আমি মৃত্যুভয় দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সে যেন কোনও অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা করার আগে কিছুদিন সে প্রত্যন্ত কোনও জায়গায় লুকিয়েও ছিল। এখন কথা হচ্ছে, মানুষ যখন লুকিয়ে থাকছে বা পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন সে চেষ্টা করবে যথাসম্ভব ঝাড়া হাত পা থাকার। অকারণে একটা ব্যাগ নিয়ে সে ঘুরতে চাইবে না। পালিয়ে বেড়ানোর অবস্থাতেও যখন ওই ব্যাগটাকে গোবিন্দ রায় কাছ ছাড়া করেনি, তখন ধরে নিতে হবে ব্যাগটায় মহা মূল্যবান কিছু ছিল। আর এখন যেহেতু দেখা যাচ্ছে ব্যাগটা উধাও হয়ে গেছে, এটা মনে করা স্বাভাবিক যে ওই ব্যাগটার জন্যেই গোবিন্দ রায় খুন হয়েছে। গোবিন্দ রায়কে খুন করে খুনি ব্যাগটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।'

সোমেন মুখুটি কথা বলছে না। খুব গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে। পুলিশের ফটোগ্রাফার আরও কিছু ছবি তুলে বিদায় নিল। ঘরে আদিত্য এবং সোমেন ছাড়া আর একজন পুলিশ অফিসার।

আদিত্য বলল, 'মনে হচ্ছে, প্যারাপেটের ওপর দাঁড়িয়ে, জানলাটা অল্প ফাঁক করে খুনি গোবিন্দ রায়কে গুলি করেছিল। তারপর জানলা খুলে সে ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল। কালো ব্যাকপ্যাকটা হাতিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মানে খুনি যে শুধু গোবিন্দ রায়ের ঘরের নম্বরটাই জানত তাই নয়, গোবিন্দর ঘরে যে মহা মূল্যবান জিনিসটা আছে তার খবরও রাখত। শুধু যাবার সময় তাড়াহুড়োতে সে জানলাটা খোলা রেখে যায়।'

'এমন কি হতে পারে ব্যাকপ্যাকে উধাও হয়ে যাওয়া কুড়ি লক্ষ ডলার ছিল?' সোমেন জিজ্ঞেস করল।

'কিছুটা থাকতে পারে, পুরোটা নয়। কুড়ি হাজার একশ ডলারের নোট ওইটুকু একটা ব্যাকপ্যাকে আঁটবে না। কুড়ি হাজার একশ ডলারের নোট আঁটাতে গেলে একটা বড় ব্যাগ দরকার। যেরকম ব্যাগ আমরা ফিরদৌসের হোটেলের ঘরে পেয়েছিলাম। তাছাড়া কুড়ি হাজার একশ ডলার নোটের ভার পিঠে নিয়ে হাঁটতে গেলে একটা মানুষকে যতটা ঝুঁকে হাঁটতে হবে, গতকাল সন্ধেবেলা গোবিন্দ রায়কে সে রকম ভাবে হাঁটতে দেখিনি। সে নিশ্চয় টাকাগুলো হোটেলে রেখে পিঠে শূন্য ব্যাগ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। চলুন একটু বাইরে গিয়ে দেখি খুনি কোনখান দিয়ে প্যারাপেটে নেমেছিল।' আদিত্য দরজার উদ্দেশে হাঁটা লাগাল।

'একটা খুনের জায়গায় বাড়তি ব্যাগ। থাকার দরকার ছিল না কিন্তু আছে। আর একটা খুনের জায়গায় একটা ব্যাকপ্যাক থাকার কথা কিন্তু নেই।' আদিত্য হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই বিড়বিড় করছিল।

করিডোরটা খুব বড় নয়। এক প্রান্তে গোবিন্দ রায়ের ঘর। তার দুদিকে দুটো অতিথি-কক্ষ যেগুলো সোমেন মুখুটির কথা অনুযায়ী ফাঁকা রয়েছে। তারপর একটা ঘর যার দরজার ওপর লেখা, 'স্টোররুম'। স্টোররুমের দরজাটা খোলা রয়েছে।

'এই দরজাটা কি সব সময় খোলা থাকে?' আদিত্য সোমেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি ঠিক বলতে পারব না স্যার। বরং এখানকার কোনও স্টাফকে জিজ্ঞেস করা যাক।'

সোমেনের সঙ্গী পুলিশ অফিসারটি নিচে গিয়ে এক শীর্ণকায়, মাঝবয়সী ভদ্রলোককে ধরে আনল।

'নমস্কার স্যার। আমি হাউসকিপিং সুপারভাইজার শশীকান্ত সরকার। আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?' শীর্ণকায় ভদ্রলোক সোমেন মুখুটির দিকে তাকিয়ে দুহাত জড়ো করে নমস্কার করলেন।

'এই স্টোররুমের দরজাটা কি সব সময় খোলা থাকে?' সোমেন মুখুটির গলায় পুলিশি ধমক।

'চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে না স্যার। সকাল ছটায় সুইপার এসে দরজা খুলে ঘরটা পরিষ্কার করে। তখন থেকে ওটা খোলাই থাকে। তারপর রাত্তির আটটায় সিকিউরিটি এসে স্টোররুমটা বন্ধ করে দিয়ে যায়। সারা রাত্তির ওটা বন্ধই থাকে।'

'কারা ঢোকে এই স্টোররুমে? আদিত্য প্রশ্ন করল।

'মেনলি হাউসকিপিং স্টাফরা ঢোকে। এই ঘরে কাচা চাদর-তোয়ালে, কম্বল, বালিশ এইসব থাকে। গেস্টদের বাথরুমে রাখার সাবান-শ্যাম্পুও থাকে। এখান থেকে জিনিসপত্র কার্ট-এ তুলে হাউসকিপিং স্টাফরা গেস্টরুমগুলো ক্লিন করে। চাদর-তোয়ালে বদলে দেয়, সাবান-শ্যাম্পু রিপ্লেস করে দেয়। আসুন না, ভেতরটা দেখবেন।'

শশীকান্ত সরকারের সঙ্গে সকলেই স্টোররুমের ভেতরে ঢুকল। এক দিকে সারি সারি র‍্যাকে চাদর-তোয়ালে, কম্বল, বালিশ ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। অন্য দিকে সাবান-শ্যাম্পু-চিরুনি-টুথপেস্ট। ঘরে একটাই জানলা। জানলাটা খোলা রয়েছে। গোবিন্দ রায়ের ঘরের জানলার মতো এই জানলাতেও কোনও গরাদ নেই।

'শশীকান্তবাবু, এই জানলাটা কি সব সময় খোলা থাকে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'না তো। বরং সব সময়েই জানলাটা বন্ধ রাখা হয়। এটা কে খুলল বুঝতে পারছি না।' শশীকান্ত সরকারকে খানিকটা উদভ্রান্ত দেখাল।

আদিত্য জানলার কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে বাইরে নামলেই প্যারাপেট। যে কেউ প্যারাপেট দিয়ে হাঁটতে পারবে না। কিন্তু একজন পেশাদার খুনি অনায়াসে জানলা দিয়ে নেমে প্যারাপেট ধরে হেঁটে গোবিন্দ রায়ের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

আদিত্য ঘরের ভেতর দৃষ্টি দিয়ে বলল, 'সোমেনবাবু দেখে যান। কীভাবে এই জানলা দিয়ে নেমে খুনি গোবিন্দ রায়ের ঘরের জানলা অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল।'

একটু পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আদিত্য সোমেন মুখুটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সিতারা হোটেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজগুলো দেখবার সময় পেয়েছিলেন?'

'সত্যি বলতে কি ফুটেজগুলো এখনও ভাল করে দেখার সময় পাইনি স্যার। এটা আমার একটা ল্যাপ্স হয়ে গেছে। ভেরি সরি। আমি ফুটেজগুলো দেখে নিয়েই আপনাকে জানাব।'

'না, না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার এত কাজ। তার মধ্যে একটা দু-টো মিস হয়ে যেতেই তো পারে। আপনি ফুটেজটা দেখে নিয়ে আমাকে জানালেই হবে।' আদিত্য ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলল।

তারপর আদিত্য একটু থেমে বলল, 'এই ক্রিক ভিউ হোটেল থেকেও সম্ভবত একটা সিসি ফুটেজ আপনি পাবেন। আমার মনে হয়, দুটো ফুটেজকে মিলিয়ে দেখলে হয়ত দরকারি কোনও তথ্য পাওয়া যেতেও পারে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

কয়েকটা দিন শুয়ে-বসেই কেটে গেল। তার মানে যে আলস্যে কেটে গেল তা নয়। শুয়ে-বসে মানে এই কয়েকটা দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপিস ছাড়া আদিত্য আর কোথাও যায়নি। ঘরে শুয়ে কড়িকাঠ গুনতে গুনতে কিংবা আপিসে বসে জানলা দিয়ে বউবাজারের জনস্রোত দেখতে দেখতে সে অনবরত চিন্তা করে যাচ্ছিল। একটা গল্প চোখের সামনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ভগবান যদি তাকে আর একটু মনঃসংযোগের ক্ষমতা দিতেন, আর একটু বুদ্ধি দিতেন, তা হলে ভেঙে যাওয়া টুকরোগুলো জুড়ে জুড়ে সে আরও তাড়াতাড়ি গল্পটা তৈরি করে ফেলতে পারত। এই কটা দিন সিগারেট খাওয়া খুব বেড়ে গেছে, বুকের বাঁ দিকে কখনও কখনও একটা চিনচিনে ব্যথা হয়, তবু আদিত্য সিগারেট কমাতে পারছে না। সে মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছে, কুমুদিনীর রহস্যটা ভেদ করে সে সিগারেট খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেবে। সে যে কুমুদিনীর রহস্যটা ভেদ করতে পারবে এটা নিয়ে তার কোনও সংশয় নেই। কত তাড়াতাড়ি পারবে সেটাই প্রশ্ন। তার মন বলছে, যত দেরি হবে তত আরও প্রাণক্ষয় হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

এইভাবে চার দিন কেটে যাবার পর সোমেন মুখুটির ফোন এল। আদিত্য তখন সবে আপিসে ঢুকেছে।

'স্যার, ফিরদৌসের বিরুদ্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনাকে না জানিয়ে পারছি না।' সোমেনের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'আচ্ছা? কী প্রমাণ পেলেন?' আদিত্য গলায় উৎসাহ এনে বলল।

'ফিরদৌসকে যে দুজন বডিগার্ড হালিশহর থেকে কলকাতা যাবার পথে সঙ্গ দিয়েছিল তারা দুজনেই বলল রাস্তায় একবার তারা থামতে বাধ্য হয়েছিল।'

'সহদেব আর জামিল একথা বলল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই দুজন।'

'তারপর?'

'আমি দুজনকে আলাদা আলাদা করে জেরা করেছিলাম। দু-জনেই বলল, টাকা নিয়ে কলকাতা যাবার পথে ব্যারাকপুর পৌঁছনোর একটু আগে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ওপর রাস্তার একেবারে মাঝখানে একটা লরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লরিটা না সরলে ফিরদৌসদের গাড়িটার পক্ষে এগোনো সম্ভব ছিল না। লরির ড্রাইভার নেমে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল, যদি কোনও সাহায্য পাওয়া যায়। যদি লরিটাকে ঠেলে রাস্তার এক পাশে করে দেওয়া যায় যাতে রাস্তার ওপর দিয়ে অন্য গাড়ি যাতায়াত করতে পারে। মাল বোঝাই লরি। পাঁচ-ছজন জোয়ান লোক মিলে না ঠেললে তাকে নড়ানো যেত না। তাই গাড়ি থেকে ড্রাইভার ছাড়াও সহদেব এবং জামিল দুজনেই নেমে পড়ে হাত লাগায়। ওরা তিনজন ছাড়াও লরির ড্রাইভার এবং দুজন খালাসি সব মিলিয়ে ছ-জন মিলে অতি কষ্টে লরিটাকে রাস্তার এক ধারে দাঁড় করায়। লরিটা সরাতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়। এই সময়টা ফিরদৌস টাকার ব্যাগটা নিয়ে একেবারে একলা গাড়িতে বসেছিল।'

'এই সময় কী ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার অনুমান, এই সময় ফিরদৌসের দলের কোনও লোক ধানখেতের দিক থেকে উঠে এসে ফিরদৌসের টাকার ব্যাগটা বদলে দিয়েছিল। কুড়ি লক্ষ ডলার ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে তার বদলে এক কোটি টাকার একটা ব্যাগ সে ফিরদৌসের পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিল।

'চমৎকার। চমৎকার।' আদিত্য বলে উঠল।

'মনে রাখতে হবে, ঠিক এক রকম দেখতে একটা নীল রঙের ব্যাগ ফিরদৌসেরও ছিল। সেটাতে পাঁচশো টাকার নোটে এক কোটি টাকা আগেই ভরা ছিল।' সোমেনের গলায় উৎসাহ ঝরে পড়ছে।

'একটা প্রশ্ন। বটুক সামন্ত কুড়ি কোটির বদলে এক কোটি টাকা পেয়ে আপত্তি করেনি কেন? সে তো কুড়ি কোটি টাকা বা কুড়ি লক্ষ ডলার এক্সপেক্ট করছিল।'

'আমি জাহাঙ্গির খানকে খুব ভাল করে জেরা করেছি। জাহাঙ্গির বলেছে, তার সামনে বটুকবাবুর সেক্রেটারি শৌভিক নন্দকে ফোন করে ফিরদৌস বলেছিল, বটুকবাবুকে বলে দিতে সে কথা মতো টাকা নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে বলেনি। সম্ভবত, ফিরদৌস তার আগের রাত্তিরে বটুকবাবুকে ফোন করে বলে রেখেছিল সে এক কোটি টাকা নিয়ে পৌঁছে যাবে।'

'ব্রিলিয়ান্ট! অ্যাবসোলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট!' আদিত্য আবার বলে উঠল।

'এই টাকা চুরির অ্যাঙ্গল থেকে দেখলে ফিরদৌসের খুনেরও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। টাকাটার জন্যেই ফিরদৌসকে ফিরদৌসের কোনও অ্যাসোসিয়েট খুন করেছিল। টাকাটা ফিরদৌসের কাছে ওই নীল ব্যাগটাতে ছিল যেটা আমরা ফিরদৌসের হোটেলের ঘরে পেয়েছি। টাকাটা নিয়ে খুনি ফাঁকা ব্যাগটা ফেলে রেখে চম্পট দেয়।'

'আর গোবিন্দ রায়? সে কেন খুন হল?'

'আমার মনে হয় গোবিন্দও ফিরদৌসের দলে ছিল। কিন্তু কোনও কারণে গোবিন্দ পুলিশকে সব কথা বলে দিতে চেয়েছিল। তাই তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'আপনার বিশেষ কাউকে সন্দেহ হয়? যে এই খুনগুলো করছে?'

'শুধু সন্দেহ নয় আমার স্থির বিশ্বাস একজনই এই খুনের পেছনে আছে।' সোমেনের গলাটা বেশ আত্মপ্রত্যয়ী শোনাল। 'সে আর কেউ নয়, কুমুদিনীর তিন নম্বর এজেন্ট শিবেন মাইতি। পুলিশ এখনও তার কোনও হদিশ করতে পারেনি।'

'আপনার অনুমান নির্ভুল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আপনি তো কেসটা চোদ্দো আনা সলভ করেই ফেলেছেন। কনগ্র্যাচুলেশনস।' আদিত্যর গলাটা আন্তরিক শোনাল।

'ছকটা মোটামুটি ধরতে পেরেছি। কুমুদিনীর তিনজন এজেন্ট মিলে প্ল্যান করে টাকাটা সরিয়েছিল। তার মধ্যে একজন, যার নাম শিবেন মাইতি, একটু লোভী হয়ে উঠে অন্য দুজনকে খুন করে পুরো টাকাটা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার এখনও দুটো আসল কাজ বাকি। এক, শিবেন মাইতিকে ধরতে হবে। দুই, টাকাটার হদিশ করতে হবে। শিবেন মাইতির বাড়ি জলপাইগুড়িতে। কাছেই শিলিগুড়ি। সেখানে কোটি কোটি টাকার বেআইনি বিদেশি জিনিস কেনাবেচা হয়। ভুললে চলবে না টাকাটা মার্কিনি ডলারে ছিল। চোরাই পথে বড় রকমের ডলার খরচ করার পক্ষে শিলিগুড়ি আদর্শ জায়গা। তাই মনে হচ্ছে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি অঞ্চলে হানা দিলে হয়তো আমার দুটো কাজই হয়ে যাবে। আমার ইনফর্মাররা আমাকে দুএকটা লিডও দিয়েছে। আজ রাত্তিরের ট্রেনে শিলিগুড়ি রওনা হচ্ছি। আশা করছি, আপনাদের আশীর্বাদে কেসটা শিগগিরই সলভ করে ফেলতে পারব।'

'জাহাঙ্গির দলার কোথায় পেল, জিজ্ঞেস করছেন?'

'করেছি। সে বলল, বাংলাদেশে বিড়ি এক্সপোর্ট করে পেয়েছে।'

'আপনার দক্ষতায় আমি মুগ্ধ। আপনি তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধি করে ফিরে আসুন, আমার এই কামনা রইল।'

ফোনটা রেখে দেবার পর আদিত্যর মনে হল সে যে বটুকবাবুর আপিসটা একবার দেখতে চায় সেটা সোমেনকে বলা হল না। আগে একবার বলেছিল, সোমেন নিশ্চয় ভুলে গেছে। তারপর মনে হল, এখন বলে খুব লাভ হত না। সোমেন রাত্তিরের ট্রেনে শিলিগুড়ি যাচ্ছে, নিশ্চয়ই এখন খুব তাড়ায় থাকবে। কাকে এ-ব্যাপারে বলা যায়? সব কিছু নিয়ে গৌতমকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না। ভাবতে ভাবতে আদিত্যর মনে

হল, সুদর্শন শিকদারকে একবার বলে দেখলে হয়। আফটার অল, সেই তো কুমুদিনীর রেডটা লিড করেছিল। সুদর্শন শিকদারের ফোন নম্বরটা আদিত্যর মোবাইলে সেভ করা আছে।

একটু দ্বিধা নিয়ে সুদর্শন শিকদারের নম্বরটা লাগাল আদিত্য।

'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। আমাকে মনে আছে? কুমুদিনী বিত্ত নিগম কেসটার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল?' ওদিক থেকে 'হ্যালো' শুনে আদিত্য কুণ্ঠার সঙ্গে বলল।

আদিত্যকে চিনতে অন্তত আধ মিনিট সময় নিল সুদর্শন শিকদার। তারপর দায়সারাভাবে বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বলুন।'

'বলছিলাম, আপনি কি এখনও কুমুদিনী কেসটার চার্জে আছেন? থাকলে আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করতাম।'

'কাগজে কলমে আছি, আসলে নেই। আমার জায়গায় সোমেন মুখুটিকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে। তবে চিঠি লিখে নয়, অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেবের মুখের কথায় ব্যাপারটা হয়েছে। কিন্তু এটা তো আপনার না জানার কথা নয়। আমি তো শুনেছি, অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেব আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই রদবদলটা করেছেন।' সুদর্শন শিকদার তার ভেতরের তিক্ততাটা ঢাকার চেষ্টা করল না।

অভিযোগটা আদিত্যকে হজম করে নিতে হল। সুদর্শন শিকদারকে দেবার মতো উত্তর আদিত্যর কাছে নেই। সে একটু মিনমিন করে বলল, 'কুমুদিনীর অফিসটা কি একবার দেখা যেতে পারে? আপনি কি তার একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?'

'না পারি না। কুমুদিনীর ব্যাপারে কার্যত আমার আর কোনও অথরিটি নেই। আর তাছাড়া কানাঘুষোয় শুনছি, কুমুদিনীর কেসটা নাকি মুখুটি সলভ করে ফেলেছে। তাহলে আর ওদের অফিসটা দেখে আপনি কী করবেন? আমি এখন রাখছি। একটু ব্যস্ত আছি।' সুদর্শন শিকদার বেশ রূঢ়ভাবে ফোনটা রেখে দিল।

সুদর্শন শিকদার মনে হয় চটেছে। নাকি চটে যাবার অভিনয় করছে? আসলে কি তার মনে গভীরতর কিছু আছে? ভেবে দেখতে হবে। ঈষৎ চিন্তান্বিতভাবে আদিত্য গৌতমের নম্বরটা লাগাল। সেই অগতির গতি গৌতম।

'বল। খবর কি? ফোন-টোন করিস না কেন?' গৌতমের গলায় উৎফুল্ল ভাব।

গৌতমের গলা শুনেই আদিত্যর মনমরা অবস্থাটা কিছুটা কেটে যাচ্ছে। গোবিন্দ রায় খুন হবার ঠিক পরে সেই যে গৌতমের সঙ্গে কথা হয়েছিল তারপর চার-পাঁচদিন আর যোগাযোগ করা হয়নি। সে বলল, 'তোর গলায় এত ফুর্তি কেন রে? আবার প্রোমোশন পাচ্ছিস নাকি?'

'আরে না, না। প্রমোশন-টোমোশন নয়। আমি হলাম গিয়ে সদা আনন্দময় পুরুষ। ফুর্তিতে থাকার জন্য আমার কোনও কারণ লাগে না। তোর মতো আঁতেল নাকি যে সর্বদা বিষণ্ণতায় ভুগব? যাক গে, বাজে কথা থাক। বল কী ব্যাপার।'

'সোমেন মুখুটি তো বলছে কুমুদিনীর কেসটা মোটামুটি সলভ করে ফেলেছে।'

'তাই তো বলছে। শুধু আসল লোকটাকে ধরা বাকি। সেই কাজটা সম্পন্ন করতে ও আজ রাত্তিরে শিলিগুড়ি যাচ্ছে। ওর গল্পটা কিন্তু আমার প্লজিবল মনে হচ্ছে। তোর কি মনে হয়?'

'সোমেন মুখুটির গল্পটা সত্যি হতেও পারে। তবে আমার দু-একটা খটকা এখনও রয়ে গেছে। আমি অবশ্য সোমেনকে সেসব বলিনি। উৎসাহ নিয়ে ছেলেটা কাজ করছে, খটকার কথা বললে ডিমরালাইজড হয়ে যাবে। কিন্তু আমার নিজের বোঝার জন্যে খটকাগুলো দূর করা দরকার। আর এর জন্যে আমার দরকার একবার কুমুদিনীর আপিসটা ভাল করে দেখা। আমি তোকে আগেও বলেছিলাম, এখনও বলছি, আমাকে কুমুদিনীর আপিসটা দেখার একটা ব্যবস্থা করে দে।'

'তুই এখনও কুমুদিনীর আপিসটা দেখিসনি? স্ট্রেঞ্জ! আমি কবে সোমেনকে বলেছিলাম তোকে কুমুদিনীর আপিসটা একবার ভাল করে দেখিয়ে দিতে।'

'হয়ত কাজের চাপে ভুলে গেছে। তুই একটু দেখ না, অন্য কাউকে দিয়ে হয় কিনা।'

'নো প্রবলেম। কাল দুপুরবেলাটা খালি রাখিস। আমি লালবাজার থেকে কাউকে তোর কাছে পাঠিয়ে দেব। সে তোকে কুমুদিনীর অফিসে নিয়ে যাবে।'

'আর একটা কথা। তুই তো বলেছিলিস জাহাঙ্গির খানকে পুলিশ শিগগির অ্যারেস্ট করবে। সেটা এখনও করল না কেন?'

'আমরা তো প্রথমে সেটাই করব ঠিক করেছিলাম। তারপর সোমেন বলল, স্যার ওকে অ্যারেস্ট না করে বরং ওর পেছনে লোক লাগিয়ে দেখি লোকটা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে। সেই মতো দুজন পুলিশের লোক, একজন জাহাঙ্গিরের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে, আর একজন বটুক সামন্তের ওপর। জাহাঙ্গিরকে অ্যারেস্ট না করার আরেকটা কারণ, অ্যারেস্ট করা হলে ও শিয়োরলি বটুক সামন্তের মতো বেল পেয়ে যেত। সেটাই যদি হয় তাহলে আর অ্যারেস্ট করে লাভ কী? তার থেকে ওকে ছেড়ে রেখে ফলো করা ভাল।'

'বুঝলাম। ঠিক আছে। তুই তাহলে কাল দুপুরে কাউকে পাঠিয়ে দিস।'

'ওক্কে।'

বিমলকে একটা ফোন করতে হবে। আদিত্য মোবাইলটা তুলে নিল। দুবার নম্বরটা লেগেই কেটে গেল। আজকাল লাইন পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। অনেক কষ্টে তৃতীয়বারের চেষ্টায় পাওয়া গেল নম্বরটা। লাইনে খুব ডিসটার্বেন্স।

'শোনো, তোমার জন্যে একটা কাজ আছে। আজ বিকেলে একবার আসতে পারবে?'

'কাজে যাবার পথে যাব স্যার। এই পাঁচটা নাগাদ? আপনি আপিসে থাকবেন, না বাড়িতে?'

'আপিসেই থাকব। তুমি চলে এস।'

বিমল এল সোয়া পাঁচটায়। ঘামছে।

'বলুন স্যার কী কাজ।' বিমল চেয়ারে বসে বলল।

'আরে, আগে ঠান্ডা হয়ে বোসো। খুব ঘেমে গেছ। পাখার তলায় বসে ঘামটা শুকোও। তোমার বাড়ির কী অবস্থা? আর কোনও ঝামেলা টামেলা হয়নি তো?'

'না স্যার। আপাতত আর কোনও ঝামেলা নেই। ছেলেটা দিল্লিতেই আছে। কাজ করছে। ওর মাকেই বেশি ফোন করে। তবে আমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা হয়। গিন্নির শরীরটাও, বলতে নেই, ঠিকঠাক আছে। না, কোনও ঝামেলা নেই স্যার।'

'খুব ভাল। দাঁড়াও একটু চা বলি। শ্যামল চা আনতে আনতে কাজের কথাটা সেরে ফেলতে পারব।'

এই আপিস বাড়ির সিকিউরিটি শ্যামল আজকাল একতলায় তার ঘরে চা বানায়। সেই চা কেটলিতে করে আপিসে আপিসে বিক্রি করে। আদিত্য অবশ্য নিজের চা কফি নিজেই বানিয়ে নেয়, কিন্তু আদিত্যর বানানো চা বিমলের চলবে না।

'দুটো মশলা চা আমার ঘরে। একটু তাড়াতাড়ি।' আদিত্য শ্যামলকে ফোন করে বলল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিমলকে বলল, 'কাজটা কী শোনো।'

বিমল চেয়ারের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসেছে। এটা তার মনঃসংযোগের প্রস্তুতি।

'রাজারহাট নিউ টাউনে একটা নাইট ক্লাব আছে। নাম বুটলেগারস। ওপর ওপর নাইট ক্লাব অর্থাৎ অনেক রাত্তির অব্দি নাচগান, খানাপিনা হয়। কিন্তু এর ভেতরে একটা জুয়ার আড্ডা আছে। সেটা অবশ্য বেআইনি, তাই সকলের জন্যে নয়। তোমাকে সেখানে গিয়ে নাইট ক্লাব এবং তার মালিক সম্বন্ধে জানতে হবে। মালিকের নাম পিটার অরোরা। তার সম্বন্ধে যা যা জানতে পারবে আমাকে এসে জানাবে। সম্ভব হলে জুয়ার আড্ডাটার সম্বন্ধেও জানার চেষ্টা করবে। ওটা সম্বন্ধেও আমার জানা দরকার। এর জন্যে তোমাকে কয়েক দিন কাজ থেকে ছুটি নিতে হবে। তোমার তো নাইট ডিউটি?'

'সে আমি ম্যানেজ করে নেব। সকালে যে ছেলেটা কাজ করে তার সঙ্গে বদলা বদলি করে নিতে পারব। কিন্তু নাইট ক্লাবে যাবার মতো আমার তো ভাল জামা-প্যান্ট নেই স্যার।'

'আরে কী মুশকিল। আমি কী তোমাকে নাইটক্লাবের খদ্দের হয়ে যেতে বলছি? বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নাইট ক্লাবে নাচতে যায়। তাদের মধ্যে তোমাকে মানাবে কেন? তুমি তো নাচতেও পার না। শোনো, তুমি ওখানে যাবে কাজ খুঁজতে। যেমন কিছুদিন আগে স্টুডিও পাড়ায় গিয়েছিলে। ওখানে ফেরিওলা বা চা-ওলা সেজেও যেতে পার। বাবু-বিবিরা যারা নাইট ক্লাবে যায় তাদের ড্রাইভারদের অনেক রাত্তির অব্দি বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। সেই ড্রাইভারদের কাছে চা বিক্রি করতে পার। চা বানাতে পারবে তো?'

'চা-ওলা সেজেই যাব স্যার। চা বানানোটা গিন্নির কাজ থেকে শিখে নেব। একটা কেটলি কিনতে হবে আর একটা উনুন। ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে স্যার।'

'কিছু টাকা রাখ। খরচপাতি আছে। তোমার পারিশ্রমিকটা কাজ হয়ে গেলে পাবে।'

'সে আপনি যখন খুশি দিন স্যার। ও নিয়ে আমার চিন্তা নেই। আমার চিন্তা আপনার কাজটা ঠিকমতো করে উঠতে পারব কিনা তাই নিয়ে।'

কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে। শ্যামল। চা নিয়ে এসেছে।

২

বিমল চলে যেতে না যেতে কেয়ার ফোন।

'কয়েকজন কলিগের সঙ্গে বউবাজারে ঘড়ি কিনতে এসেছি। তুমি অফিসে আছ? তাহলে ফেরার পথে দেখা করে যাব।'

কেয়া আদিত্যর অফিসে আগে কয়েকবার এসেছে। জায়গাটা চেনে। আদিত্য বলল, 'আমি এখনও অফিসেই আছি। বেরোবার তোড়জোড় করছিলাম। তাড়াতাড়ি চলে এস।'

'কেনাকাটা হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

মিনিট পনেরো বাদে আবার কেয়ার ফোন এল। আদিত্য চুপ করে আপিসেই বসে আছে।

'তোমার অফিসের মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আর ওপরে উঠব না। তুমি নিচে নেমে এস।'

'বউবাজারে ঘড়ি কিনতে এসেছিলে কেন? তোমার বাড়ির কাছে, শ্যামবাজারেই তো ভাল ঘড়ির দোকান আছে।' আদিত্য নিচে নেমে জিজ্ঞেস করল।

'একটা বড় দেয়াল ঘড়ি কেনার ছিল। সেটা দেখতে হবে পুরোনো আমলের ঘড়ির মতো, কিন্তু ভেতরের কলকব্জা হতে হবে একেবারে আধুনিক। কয়েকটা জাপানি কম্পানি এরকম ঘড়ি তৈরি করছে। কিন্তু সেগুলো শ্যামবাজারে পাওয়া যায় না।'

'কার জন্যে কিনলে এরকম ঘড়ি?'

'ও মা, সেটাই তো বলা হয়নি। আমাদের এক কলিগের পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকী। স্কুলের সবাই মিলে জব্বর গিফট দেওয়া হবে। তার মধ্যে এই ঘড়িটাও আছে।'

ওরা বউবাজার স্ট্রিট ধরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর দিকে হাঁটছিল।

'আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে। এক্ষুনি কিছু একটা খেতে হবে।' কেয়া অস্থিরভাবে বলল।

'খিদে আমারও পেয়েছে। কচুরি খাবে? পুঁটিরামে? অনেক দিন পুঁটিরামে যাইনি।' আদিত্য খানিক ব্যগ্রভাবে বলল।

'পুঁটিরাম! সে তো অনেক দূর! এত খিদে নিয়ে অতটা হাঁটতে পারব না।' কেয়া ঘোষণা করল।

'এই অফিস টাইমে ট্যাক্সি কোথায় পাব? আর ট্র্যাম-বাসে তুমি তো চড়ই না। এইসব কারণেই বোধহয় সেদিন আমার পুলিশ বন্ধু গৌতম দাশগুপ্ত আমাকে একটা গাড়ি কিনতে বলছিল।' আদিত্যর গলায় ঠাট্টা।'

'বাজে কথা বোলো না। একে হাঁটতে পারছি না, তার ওপর যত বাজে কথা। তুমি কিনবে গাড়ি! তা হলেই হয়েছে!' কেয়া খিঁচিয়ে উঠল।

আদিত্য দেখেছে শারীরিক কষ্ট কেয়া একদম সহ্য করতে পারে না। এমনিতে কেয়া খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু শারীরিক কষ্টের উপক্রম হলেই তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। আদিত্যর ভাগ্য যথেষ্টই ভাল বলতে হবে, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর মোড়ে পৌঁছে দেখল একটা হলদে ট্যাক্সি তার মিটারটা লাল শালু দিয়ে মুড়ে ট্র্যাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য ছুটে গিয়ে তাকে পাকড়াও করল।

'কলেজ স্ট্রিট যাবেন?' আদিত্য কাতর গলায় আর্জি জানাল।

'দেখছেন না, মিটার খারাপ আছে।'

'মিটারের দরকার নেই। আপনি বলুন না কত লাগবে।'

টাক্সিওলা একটা ভাল দাঁও মারল। অবশ্য আদিত্যর মনে হল দাঁওটা সেই মেরেছে। কেয়াকে নিয়ে আর হাঁটা যাচ্ছিল না। কলেজ স্ট্রিট আর সূর্য সেন স্ট্রিটের মোড়ে এসে আদিত্য ট্যাক্সিওলাকে ডানদিকে বেঁকতে বলল। দু-পা গেলেই পুঁটিরাম।

'ওদিকে যাওয়া যাবে না। ওদিকটা ওয়ান ওয়ে। ঢুকলে ফেঁসে যাব। আমাকে মিটার সারাতে মহাত্মা গান্ধী রোডে যেতে হবে। আপনারা এখানেই নেমে পড়ুন।' ট্যাক্সিওলা সাফ জানিয়ে দিল।

অগত্যা ওখানেই ছেড়ে দিতে হল ট্যাক্সিটা। ওইটুকু হাঁটতে অবশ্য কেয়ার আপত্তি নেই। ট্যাক্সি পাবার পর থেকেই কেয়ার মেজাজটা একটু একটু করে ভাল হচ্ছে। পুঁটিরাম পৌঁছে তাকে রীতিমতো খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল।

'কতদিন পরে পুঁটিরামে এলাম। সেই কলেজে পড়ার সময় মাঝে-মাঝে আসতাম। খুব একটা বদলায়নি কিন্তু।' কেয়া স্মৃতিতাড়িত গলায় বলল।

অন্তত কচুরির স্ট্যান্ডার্ডটা একই রকম আছে। শুধু পরিবেশনের কায়দা বদলেছে। আগে টেবিলে বসে কচুরি-মিষ্টি অর্ডার দেওয়া যেত। যেমন সব দোকানে দেওয়া যায়। এখন আর সেই নিয়ম নেই। সেলফ-সারভিস চালু হয়েছে। কাউন্টার থেকে নিজেই খাবার নিয়েটেবিলে বসতে হবে। তবে তরকারি ফুরিয়ে গেলে টেবিলেই দ্বিতীয়বার দিয়ে যায়। তখন আর উঠতে হয় না। কচুরির পর বোঁদে খাওয়া হল। বোঁদেটা গরম এবং টাটকা।

'এর পর কি কফি খাবে? নাকি প্যারাগনের সরবত?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'দুটোই খাব। প্রথমে সরবত। রোজ সিরাপ দিয়ে ঘোলের সরবত। তারপর কফি হাউসের ওপরতলায় বসে কোল্ড কফি।' কেয়া উত্তেজনায় ফুটছে। পুঁটিরামের কচুরি খেয়ে তার মন একেবারে ভাল হয়ে গেছে।

আধঘণ্টা পরে কফি হাউসের দোতলায় বসে দু-জনে যখন বেয়ারার জন্যে অপেক্ষা করছে, আদিত্য বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করব করব করেও করা হয়নি। এখন হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল।'

'কী কথা?'

'তোমার ডাক নাম অপু, কিন্তু ভাল নাম কেয়া। এরকম কেন হল? সাধারণত যাদের ডাক নাম অপু হয় তাদের ভাল নাম হয় অপর্ণা বা অপরাজিতা ধরনের কিছু। তোমার ক্ষেত্রে সেটা না হবার কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?'

কেয়া মিটিমিটি হাসছে। কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে সে বলল, 'আমার নামকরণ নিয়ে একটা লম্বা ইতিহাস আছে। বাবা ছিলেন স্কুল টিচার। বহরমপুরে একটা স্কুলে বাংলা পড়াতেন। বিভূতিভূষণের অন্ধ ভক্ত। আমি যখন মায়ের পেটে তখন কেন জানি না বাবা ধরেই নিয়েছিলেন ছেলে হবে। আর ছেলে হলে তার নাম রাখা হবে অপু। ছেলে তো হল না, কিন্তু অপু নামটা রয়ে গেল। তুমি ঠিক বলেছ। অপু যদি কারও ডাক নাম হয় তাহলে তার ভাল নাম অপর্ণা হবার চান্স খুব বেশি। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক হল, ভাল নাম হবে অপর্ণা।

এইভাবে তিন বছর কাটল। তখনও ইস্কুলে ভর্তি হইনি। বাবা সাত-তাড়াতাড়ি ইস্কুলে ভর্তি করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন বড়পিসিরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। বড় পিসেমশাই সরকারি অফিসে বড় চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। পুনে, সাজাহানপুর, কার্কি, জব্বলপুর এইসব ছিল তাঁর কাজের জায়গা। ফলে বড়পিসিদের সঙ্গে খুব বেশি দেখা হত না। বড়পিসি সেই প্রথম আমাকে দেখলেন। দেখে তো বেজায় খুশি। কিন্তু যেই শুনলেন আমার ভাল নাম অপর্ণা রাখা হয়েছে অমনি তাঁর মুখ ভার। অপর্ণা নামের মেয়েরা নাকি বিয়ে করে সুখী হয় না। তিনি তিনজন অপর্ণার কথা জানেন যাদের মধ্যে দু-জন অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছে, আর একজনের বিয়েই হয়নি। বড়পিসির আজ্ঞায় অপর্ণা নামটা পালটানো হল। আমাদের বাড়ির পেছনে কয়েকটা কেয়াঝোপ ছিল। তাই দেখে বড়পিসি আমার নাম রাখলেন কেতকী। বড়পিসি চলে যাবার পরে বাবা নামটাকে আর একটু ছোট আর আধুনিক করে নিলেন। আমার নাম হল কেয়া। কেতকী মানেই তো কেয়া। আর ওটাকে পালটানো হয়নি।'

বেয়ারা এসেছে। আদিত্য কালো কফি খাবে, কেয়া খাবে কোল্ড কফি উইথ ক্রিম। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল। আদিত্য ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বলল, আচ্ছা, 'তোমার বাড়ি তো বহরমপুরে। তুমি হাবিবুর রহমান বলে কাউকে জান? এক সময় ওখানকার এম এল এ ছিলেন।'

'নামটা চেনা চেনা লাগছে। হ্যাঁ, এম এল এ-ই ছিলেন। বোধহয় অল্প বয়সে মারা যান। আমি তখন কলকাতায় চলে এসেছি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না।' কেয়ার গলাটা অনিশ্চিত শোনাল।

'তুমি এমন কাউকে জান যে বলতে পারবে? মানে বহরমপুরের পুরোনো কোনও লোক যে হাবিবুর রহমানের পরিবারকে চিনত?'

কেয়া বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'আমাদের বহরমপুরের বাড়িতে আর কেউ নেই। বাড়ির আমাদের অংশটা বিক্রি হয়ে গেছে। যে অংশটা এখনও বিক্রি হয়নি সেখানে আমার এক জেঠু থাকেন। জেঠিমা গত হয়েছেন, দুই মেয়ের বিদেশে বিয়ে হয়েছে। জেঠু একাই থাকে। জেঠু বহরমপুরের পুরোনো বাসিন্দাদের অনেককেই চেনে। তুমি জেঠুর সঙ্গে কথা বলতে পার। কিন্তু তার আগে বলো হাবিবুর রহমান সম্বন্ধে কেন জানতে চাইছ?'

'ঠিক হাবিবুর রহমান সম্বন্ধে জানতে চাইছি না। হাবিবুর রহমানের ছেলে ফিরদৌস রহমান সম্বন্ধে জানতে চাইছি। ফিরদৌস সম্প্রতি খুন হয়েছে। তার পিসি, মানে হাবিবুর রহমানের এক বোন, আমাকে খুনি ধরার কাজে নিযুক্ত করেছে। ফিরদৌস একটা বয়েস অব্দি বহরমপুরে ছিল। তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে চাইছি।'

'তা হলে তোমাকে একদিন বহরমপুরে চলে যেতে হবে। আমি জেঠুকে বলে রাখব। জেঠু খুব মাই ডিয়ার লোক। বুড়ো মানুষ, কথা বলার লোক পায় না। তোমাকে পেলে খুব খুশি হয়ে বকবক করবে।'

কেয়া কথা বলা থামিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কী যেন ভাবছে। আদিত্য তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্যাখে নিচে রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে। ঠেলা, রিকশা, রিকশা-ভ্যান বোঝাই করে শুধু বই আর বই। সবই ইস্কুলপাঠ্য পুস্তক। বোধহয় নতুন ক্লাশ সবে শুরু হয়েছে বা শিগগির হতে চলেছে। আদিত্য লক্ষ করেছে, এই সময় মফস্বলের ইস্কুলগুলো থেকে প্রচুর মানুষ কলেজ স্ট্রিটে বই কিনতে আসে। হিন্দু ইস্কুলের সামনে জটলা। কারা যেন তর্কাতর্কি করছে। কী নিয়ে তর্ক করছে, তিনতলা থেকে ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

কেয়া হঠাৎ বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে আদিত্যর দিকে তাকাল। নরম গলায় বলল, 'জেঠুই কিন্তু এখন আমার একমাত্র অভিভাবক।'

আদিত্য হাসল। অনেকক্ষণ কথা বলল না। তারপর বলল, 'দেখো, আমাকে তোমার জেঠুর অপছন্দ হবে না।'

কেয়াকে খুব ছুঁতে ইচ্ছে করছে আদিত্যর।

কেয়াকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আদিত্য সবে রাত্তিরের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে সিগারেট ধরিয়েছে, এমন সময় নূপুর মণ্ডলের ফোন।

'আদিত্যদা, হোম ওয়ার্ক হয়ে গেছে। সুমনা ঘোষাল সম্বন্ধে এখন আমার মতো খুব কম লোকই জানে। তুমি বলেছিলে সুমনা ঘোষালের ফোন নম্বরটা জোগাড় করে দেবে। তারও আর দরকার নেই। আমি ফোন নম্বরটা পেয়ে গেছি।'

'কোথা থেকে পেলে?'

'সুমনা ঘোষালের একটা ওয়েবসাইট আছে। সেখানে যোগাযোগ করে সুমনা ঘোষালকে কাজের জন্য কনট্যাক্ট করা যায়। সুমনা ঘোষাল হয়ত এখনও টুকটাক সিনেমায় বা সিরিয়ালে অভিনয় করে। অন্তত আশা করে নতুন কোনও অফার আসবে। তাই ওয়েবসাইটটা চালু রেখেছে। ওই ওয়েবসাইটে সুমনা ঘোষালের ল্যান্ডফোন এবং মোবাইল নম্বর দুটোই আছে। আমি 'অ্যাক্ট্রেসেস' বলে আর একটা ওয়েবসাইট থেকে নম্বরগুলো ক্রস চেক করে নিয়েছি। এই দ্বিতীয় ওয়েবসাইটটায় বাঙালি অভিনেত্রী প্রায় সকলের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর আছে। দু-একজন খুব বিখ্যাতকে বাদ দিয়ে। তো এখানে ভেটারেনদের লিস্টে সুমনা ঘোষালকে পেয়ে গেলাম।'

'তুমি কি ভদ্রমহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?'

'এখনও করিনি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে কথা বলে নিয়ে করব।'

'পত্রিকার কী নাম ঠিক করলে?'

'বায়োস্কোপ। খুব সিমপ্ল নাম। ফাইন্যান্সার উত্তরবঙ্গের। উত্তরবঙ্গ, কারণ ওই অঞ্চলটা আমি চিনি। যদি মহিলা ফাইন্যান্সার সম্বন্ধে ডিটেল কিছু জানতে চান ঢপ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'তোমার কম্পিউটার কন্সালটেন্সি কেমন চলছে?'

'একটু স্লো। মনে হচ্ছে পিক আপ করতে সময় লাগবে। এক দিক থেকে ভালই। তোমার কাজটা করার জন্যে সময় বার করে নিতে অসুবিধে হবে না।'

'ফ্ল্যাট আর আপিস গোছানো হয়ে গেছে?'

'কোথায় আর হল? তোমার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে তো সুমনা ঘোষালকে নিয়েই রিসার্চ করে যাচ্ছি। আমার এক বন্ধু খুব হেল্প করেছে। বন্ধু বাগবাজারে থাকে। ওদের বাড়ির কাছে খুব পুরোনো একটা লাইব্রেরি আছে। সেখানে গিয়ে অনেক দিনের পুরোনো সিনেমা পত্রিকা পাওয়া গেল। সেগুলো থেকে সুমনা ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যেগুলো ইন্টারনেট থেকে জানতে পারতাম না।'

'বেশ বেশ। তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করে দাও। গুড নাইট।'

'গুড নাইট, আদিত্যদা।'

৩

বটুক সামন্তর অফিসটা পোদ্দার কোর্টের পাশে, আদিত্যর অফিস থেকে খুব দূরে নয়। অফিসটা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে, গৌতম বলেছিল, কাউকে সঙ্গে দেবে। গৌতম কথা রেখেছে। সঙ্গে যাকে দিয়েছে সে আর কেউ নয়, আদিত্যর পূর্বপরিচিত সাব-ইন্সপেক্টার চাকি।

চাকি আদিত্যর জন্য কুমুদিনীর অফিসের সামনেই অপেক্ষা করছিল। আদিত্যকে দেখে বলল, 'চাবিগুলো সব কটা নিয়ে এসেছি স্যার। মেন গেটের দুটো চাবি, ভেতরের ঘরের আরও চারটে। কয়েকটা আলমারির চাবিও আছে, কয়েকটা মনে হয় ড্রয়ারের চাবি। তবে কোন চাবিটা কোন আলমারির বা ড্রয়ারের সেটা লাগিয়ে লাগিয়ে দেখতে হবে। এছাড়াও কিছু চাবি আছে যেগুলো কীসের আমরা জানি না। বটুকবাবুকে অনেক প্রশ্ন করেও উত্তর পাওয়া যায়নি। ওর একটাই উত্তর—এগুলো কীসের চাবি উনি জানেন না।'

অফিসটা একটা পুরোনো বাড়ির দোতলায়। একতলায় কয়েকটা দোকান তার মধ্যে একটা নাম করা মোবাইল কম্পানির শোরুম-সার্ভিস—সেন্টার অনেকটা জায়গা নিয়ে রয়েছে। দোতলা থেকে পাঁচতলা অব্দি নানা ধরনের অফিস। লিফট আছে। তবে লিফটটা দোতলায় থামে না।

'বটুকবাবু কেমন আছেন? ওর গতিবিধির ওপর আপনারা নজর রেখেছেন নিশ্চয়।' আদিত্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল।

'নজর তো রাখা হচ্ছে। কিন্তু লোকটা বাড়ি থেকেই বেরোচ্ছে না। টেলিফোন-মোবাইল দুটোই ট্যাপ করা আছে। সেখান থেকেও কিছু পাওয়া যায়নি। লোকটা স্যার, হয় একেবারে গোবেচারা আর না হয় গভীর জলের মাছ। বোধহয় দ্বিতীয়টা। আসলে কি স্যার, বটুক সামন্তকে আরও কিছুটা রগড়ালে হয়তো কিছু পাওয়া যেত। শিকদার সাহেব এই কাজটাই করছিলেন স্যার। কিন্তু, ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে, মুখুটি সাহেব তো বটুক সামন্তকে ছেড়ে ফিরদৌসকে নিয়ে পড়েছেন। মানে ফিরদৌসের খুনিকে নিয়ে।'

'মুখুটি সাহেবের কী খবর?'

'তেমন কিছু খবর আছে বলে শুনিনি স্যার।'

কথা বলতে বলতে ওরা দোতলায় পৌঁছে গিয়েছিল। কুমুদিনীর মূল প্রবেশ পথে কোলাপসিবল গেট টানা, তালা লাগানো। সেই তালা ছাড়াও দরজায় আর একটা গা-তালা। ভেতরে অন্ধকার। চাকি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ডটা খুঁজে কয়েকটা আলো জ্বালিয়ে দিল। আদিত্য দেখল একটা বড় ঘরের ভেতরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ার-টেবিলগুলো অবিন্যস্ত। মনে হয় পুলিশি তল্লাসির পরে আর গুছিয়ে রাখা হয়নি। চেয়ার-টেবিলের ওপর অব্যবহারের ধুলো জমেছে। আদিত্য নাকে রুমাল চাপা দিল। ধুলোতে তার ভীষণ অ্যালার্জি আছে। এক্ষুনি হাঁচি শুরু হয়ে যাবে।

চাকি তিনটে বড় বড় জানলা খুলে দিয়েছে। একদিকের জানলা দিয়ে টেরিটি বাজারের ভিড় ভর্তি রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকের জানলা দিয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, চিৎপুরের ট্র্যাম।

'বটুক সামন্ত কোন ঘরে বসে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ওই কোণের ঘরটায় স্যার। দাঁড়ান, খুলে দিচ্ছি।'

বড় ঘরটার একদিকে ছোট্ট করিডোর। সেটার মুখে একটা বসার জায়গা। করিডোরের শেষে বটুকবাবুর কামরা।

'এইখানে বটুক সামন্তর সেক্রেটারি শৌভিক নন্দ বসে।' চাকি করিডোরে ঢোকার মুখে বসার জায়গাটা দেখিয়ে বলল।

বটুক সামন্তর ঘরটা বন্ধ। দরজায় ইয়েল লক। চাকি চাবির গোছা বার করে তিন-চারটে চাবি চেষ্টা করার পর একটা চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে গেল। কাঠের প্যানেল দিয়ে সাজানো ঘর। রিভলভিং চেয়ারের সামনে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এক পাশে সোফা সেট। সোফা সেটের উল্টোদিকের দেয়ালে একটা পেল্লায় সাইজের এল ই ডি টিভি স্ক্রিন। ফিরদৌস বলেছিল, সম্ভবত কোনও ছবির পেছনে বটুক সামন্তর লুকোনো একটা সেফ আছে। আদিত্য নজর করে দেখল, ঘরে তিনটে ছবি রয়েছে। একটা গান্ধী, একটা বিবেকানন্দ আর একজন আটপৌরে করে শাড়ি পরা মধ্যবয়স্কা মহিলা। আদিত্য আন্দাজ করল, ইনি বটুক সামন্তর মা কুমুদিনী সামন্ত, যাঁর নামে কোম্পানির নাম।

'চাকি সাহেব, এই তিনটে ছবিকে একটু সরাতে হবে। আমিও হাত লাগাচ্ছি। তার আগে একটা সিগারেট খেয়ে নিই।'

আদিত্য সোফায় বসে সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল চাকির দিকে।

'আমি স্মোক করি না স্যার।' চাকি লাজুক গলায় বলল। 'কিন্তু ছবি সরাবেন কেন?'

'ফিরদৌস আমাকে বলেছিল, কোনও একটা ছবির পেছনে নাকি একটা সেফ আছে। সেখানে গোপন কিছু থাকতেও পারে। দাঁড়ান সিগারেটটা আগে খেয়ে নিই।'

'আমি ততক্ষণ একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি স্যার। একতলায় লিফটের সামনে একটা লোক চা নিয়ে বসে। দেখি যদি দিয়ে যায়।'

ঘরে একটাই জানলা। 'জানলাটা কি খোলা যাবে?' বলতে বলতে আদিত্য নিজে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল। জানলার নিচে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট। জনস্রোত। আদিত্য আবার সোফায় এসে বসল।

বসে বসে আদিত্য এক মনে ভাবছিল। একটা জটিল ক্যানভাস, তার কিছু কিছু অংশ এখনও অস্পষ্ট। রেনেসাঁস-এর মাস্টাররা একটা বড় ছবি আঁকার সময় যেমন কিছু কিছু অংশ আবছা রাখতেন, পরে স্পষ্ট করে নিতেন, আদিত্যর ক্যানভাসটাও এখন সেই রকম। আবছা অংশগুলোকে ভরাট করতে হবে। হাতে অনেক কাজ। আদিত্য মনে মনে কাজগুলোর তালিকা তৈরি করল। বহরমপুর যেতে হবে। সাবিনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। 'নিউ এজ মুভিজ'-এর মালিক রোহিত ধামানির সঙ্গেও একবার কথা বলা দরকার। পল্লবী ভদ্র বলে যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে। এ-ব্যাপারে পুলিশ যতটা জানে সেটা গৌতমকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

চাকি কাজের ছেলে। চা-ওলাকে ধরে এনেছে। চা-ওলার হাতে কেটলি ও ভাঁড়। সে কিছুতেই চায়ের পয়সা নেবে না। ধমক-টমক দিয়ে তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিতে পারল আদিত্য।

'চমৎকার চা।' আদিত্য ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বলল। 'লোকটাকে ধরে আনার কৃতিত্বটা কিন্তু ষোলো আনা আপনার।'

'আসবে না কেন স্যার। আমার ইউনিফর্মটা দেখে সুড়সুড় করে চলে এল।' পুলিশকে সবাই চমকায়।

'সেটা ওর চায়ের পয়সা নেবার অনিচ্ছে দেখেই বুঝলাম।'

ছবি তিনটে সরিয়ে ফেলতে খুব একটা খাটতে হল না। গান্ধী এবং বিবেকানন্দর ছবির পেছনে নিরেট সাদা দেয়াল। কুমুদিনী সামন্তর ছবির পিছনে ছোট একটা পর্দা। পর্দাটা সরাতেই একটা সেফ বেরিয়ে পড়ল। সেফটা তালাবন্ধ।

'এই চাবির গোছাটার মধ্যেই হয়তোসেফের চাবিটা আছে স্যার।' চাকির গলাটা উত্তেজনায় কাঁপছে।

চাকির ধারণা ঠিক। সেফের চাবি গোছার মধ্যেই ছিল। মিনিট দশেকের মধ্যে সেফটা খুলে ফেলা গেল। ভেতরে কিছু আলগা কাগজপত্র, একটা বাক্স, দুটো ফাইল, কিছু ক্যাশ টাকা। আলগা কাগজগুলো দরকারি কিনা বলা শক্ত। পুরোনো ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, বাড়ি ভাড়ার রসিদ। বাক্সের মধ্যে তিনটে ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবই, টাকা জমা দেবার কাগজ। ফাইল দুটোর একটাতে বটুক সামন্তর গত আট-দশ বছরের ইনকাম ট্যাক্সের রিসিট যত্ন করে রাখা। অন্যটাতে কিছু ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট, এল আই সি-র পলিসি, কম্পানির ডিবেঞ্চার ইত্যাদি সবই বটুক সামন্তর একার নামে। আদিত্য লক্ষ করল, সবকটা সার্টিফিকেটেই নমিনির নাম রয়েছে। প্রায় সবকটাতেই নমিনির নাম ডা. শুভঙ্কর সামন্ত। শুধু একটা পঁচিশ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের নমিনি রণপ্রিয় ঘোষাল। এছাড়া সেফের মধ্যে উনিশ হাজার আটশো টাকার আলগা ক্যাশ রয়েছে।

বটুক সামন্ত স্ত্রী বা রক্ষিতাকে কিছু দিয়ে যেতে চাইছে না। কিন্তু তাদের ছেলেদের নমিনি করে রেখেছে। এটা কি খুব স্বাভাবিক? আদিত্যর মনে হল, এটা নিয়ে আর একটু ভাবতে হবে। সে চাকিকে বলল, 'এই কাগজগুলো যত্ন করে নিয়ে নিন। এর থেকে হয়তো বটুক সামন্তর আর্থিক অবস্থার কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।'

আরও কিছুক্ষণ কুমুদিনীর অফিসে খোঁজাখুঁজি করে দুজনে যখন ফেরার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আদিত্য তখনও চিন্তায় ডুবে আছে।

'কী এত ভাবছেন স্যার। আমরা তো দারুণ জিনিস পেয়ে গেলাম। আগে এই সব কাগজপত্রের হদিশ তো কেউ পায়নি।' চাকির গলা বেশ উৎফুল্ল শোনাল।

'দেখুন, সামন্তর মতো ব্যবসাদারদের এক নম্বরী এবং দু-নম্বরী দু-রকমের কাগজপত্র থাকে। এই কাগজগুলো দেখে মনে হচ্ছে এগুলো সবই এক নম্বরী। এগুলো দিয়ে আপনি বটুক সামন্তকে ফাঁসাতে পারবেন না। একটা জিনিস দেখে আমি একটু অবাক হচ্ছি। আমি হিসেব করে দেখলাম, ফিক্সড ডিপোজিট, কম্পানির কাগজ, এল আই সি সব মিলিয়ে ওই আলমারিতে যা পাওয়া গেল তাতে মনে হচ্ছে বটুক সামন্তর মোট অ্যাসেট আশি-পঁচাশি লাখের বেশি হবে না। ক্যাশের পরিমাণটাও এমন কিছু বেশি নয়। এটা কি সম্ভব? বটুক সামন্তর বাড়ি আমি দেখেছি। তার দাম অন্তত ছ-সাত কোটি। বাড়ির ভেতর যে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল একটা হণ্ডা অ্যাকর্ড একটা বি এম ডাবলু তাদের মোট দাম কোটির কাছাকাছি। এই সব থেকে কী মনে হয় না বটুক সামন্তর বেআইনি কাগজপত্রও কিছু আছে? যার হদিশ আমরা এখনও পাইনি?'

কথা বলতে বলতে দুজনে বড় রাস্তায় চলে এসেছিল। চাকির গাড়িটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি স্যার। আসুন।' চাকি গাড়ির দরজা খুলে বলল।

'এক মিনিট দাঁড়ান তো।' কিছু একটা জিনিস আদিত্যকে অস্বস্তি দিচ্ছিল। আদিত্য এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে সেটা কী। সে ওপর দিকে তাকাল। এখান থেকে কুমুদিনীর অফিসটা পরিষ্কার দেখা যায়। সন্দেহ নেই, এই দিকটাই বটুক সামন্তর অফিস। বটুক সামন্তর অফিসের জানলা দিয়ে রাস্তার এই অংশটাই আদিত্য দেখতে পেয়েছিল যেখানে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে।

'কী আশ্চর্য দেখুন, বটুক সামন্তর অফিসঘরের বাইরের দেয়ালে একটা উইন্ডো এসি লাগানো আছে।' আদিত্য উত্তেজিত গলায় বলল।

'সে তো থাকতেই পারে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?' আদিত্যর হঠাৎ মেজাজ পরিবর্তনে চাকি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছে।

'আশ্চর্য নয়? বটুক সামন্তর ঘরের ভেতরে তো কোনও উইন্ডো এসি ছিল না। দুদিকের দেয়ালে দুটো সপ্লিট এসি লাগানো ছিল। তাহলে বাইরে উইন্ডো এসির খোলসটা রয়েছে কেন?'

'হয়তো উইন্ডো এসি আগে ছিল। মেশিনটা আর নেই। শুধু বাইরের খোলসটা রয়ে গেছে।'

'সেটা হতে পারে, কিন্তু হবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইন এনি কেস আমাদের একবার দেখতে হবে ব্যাপারটা কী। আসুন।' কথাগুলো বলে আদিত্য চাকির জন্যে অপেক্ষা না করেই কুমুদিনীর আপিসের দিকে হাঁটা লাগাল।'

চাকি তার ভেতরের বিরক্তিটা মুখে প্রকাশ করে ফেলেছে। কিন্তু বিরক্তি লাগলেও উপায় নেই। আদিত্যর কথা তাকে শুনতেই হবে। আদিত্যর অবশ্য চাকির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার সময় নেই।

বটুক সামন্তর ঘরে ঢুকে আদিত্য আবার জানলাটা খুলে দিল। এই জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই সে একটু আগে বাইরে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো উইন্ডো এসির বাক্সটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তখন অতটা খেয়াল করেনি, তবে মনের ভেতরে একটা অস্বস্তি রয়ে গিয়েছিল। এবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সে এসির বাক্সটার অবস্থানটা খুব ভাল করে দেখে নিল। এসিটা লাগানো থাকলে যেখান দিয়ে ঠান্ডা হাওয়াটা বেরোত ঠিক সেখানে বিরাট এল ই ডি টিভি স্ক্রিনটা লাগানো আছে। স্ক্রিনটা একটা ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো। আদিত্য হাতের চাপ দিতেই স্ক্রিনটা ফ্রেমের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁদিকে সরে গেল। এখন স্ক্রিনটা ফ্রেমের বাঁ দিকের কোনায় আটকানো রয়েছে। আর স্ক্রিনের পেছনে দেয়ালের বদলে দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট সেফের দরজা।

'ফিরদৌস ঠিকই বলেছে। টিভিটাও তো একটা ছবি।' আদিত্য বিড়বিড় করে বলল।

সমস্ত ব্যাপার দেখে চাকি একবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। সেফের গায়ে দু-টো চাবির গর্ত। তার হতভম্ভ ভাবটা কাটিয়ে এবার চাকি তার চাবির গোছা থেকে চাবি খোঁজার কাজে লেগে পড়ল। মিনিট পনেরো পরে যখন সে চাবি দিয়ে সেফটা খুলতে পারল তখন আদিত্য তার পেছনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে।

সেফের ভেতরে কিছু দু-হাজার টাকার নোটের বান্ডিল। গুণে দেখা গেল মোট পঞ্চাশটা বান্ডিল। অর্থাৎ ঠিক এক কোটি টাকা!

৪

'সেফের পেছন দিকের বেশিরভাগ অংশটা আসলে বাইরে বেরোনো। সেটাকে ঢাকার জন্যে ওপরে উইন্ডো এসির খোলটা লাগানো ছিল। বাইরে থেকে দেখলে লোকে ভাববে এসি। আর ভেতরে সেফের মুখটা তো বিরাট টিভি স্ক্রিন দিয়ে ঢাকা।' ঘণ্টা খানেক পরে আদিত্য গৌতমকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছিল।

'এটা কিন্তু একটা ব্রেক থ্রু হল। আমরা এবার বটুক সামন্তকে চেপে ধরতে পারব। দেখা যাক ও কী করে এক কোটি টাকাটা এক্সপ্লেন করে।' গৌতম তার চায়ের কাপে চুমুক লাগাল।

'আমার কিন্তু অন্য একটা ইনফর্মেশন দরকার।' আদিত্যও চায়ে চুমুক দিল। 'তোর নিশ্চয় মনে আছে কিছুদিন আগে পল্লবী ভদ্র বলে একটি মেয়ে রাজারহাট নিউ টাউনে খুন হয়।'

'তাকে ভোলার কোনও উপায় আছে নাকি? এখন অব্দি তো খুনি ধরা পড়েনি, তাই মিডিয়া রাতদিন আমাদের বাবা-মা তুলে খিস্তি করছে। এটা নিয়ে পলিটিকাল চাপও বাড়ছে। শিগগির কিছু একটা না করতে পারলে আমাদের সকলকে চাকরি-বাকরি ছেড়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু, ওয়েট আ মিনিট। তুই হঠাৎ পল্লবী ভদ্রর কেসটাতে ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লি কেন?'

'কারণ আছে। বলছি। খুন হয়ে যাবার আগের দিন সন্ধেবেলা গোবিন্দ রায় আমাকে একটা দরকারি খবর দিয়েছিল। সেটা আমি তোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। গোবিন্দ বলেছিল, যেদিন কুমুদিনী রেড হয় তার আগের দিন বুটলেগার নাইট ক্লাবের মালিক পিটার অরোরা বটুক সামন্তর কাছ থেকে পাঁচশোর নোটে এক কোটি টাকা ক্যাশ নিয়েছিল। টাকাটা তার বেআইনি জুয়োর আড্ডাটা চালানোর জন্যে দরকার হয়েছিল। কথা হচ্ছে, টাকাটা গেল কোথায়? সেটা কি জুয়োর আড্ডায় কাজে লাগানো হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তা হলে টাকাটা পিটার অরোরার কাছে থাকার কথা। আমাদের মনে রাখতে হবে, পিটার অরোরা পল্লবীর সঙ্গে রাত্তির কাটাত। ফলে, এমন হতেই পারে, পিটার দিল্লি যাবার আগে টাকাটা পল্লবীর বাড়িতে রেখে গিয়েছিল। যদি তাই হয়, তা হলে এই সম্ভবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে ওই এক কোটি টাকার জন্যেই পল্লবী খুন হয়েছিল।'

গৌতম খুব মন দিয়ে আদিত্যর কথা শুনছিল। আদিত্যর কথা শেষ হয়ে যাবার পর সে খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, 'তুই যেটা বলছিস সেটা যদি ঘটে থাকে তা হলে আমাদের খোঁজ নিতে হবে কার কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল যে ওই টাকাটা পল্লবীর বাড়িতে আছে।'

'পিটার অরোরা যে টাকাটা নিচ্ছে সেটা গোবিন্দর মতো নিশ্চয় আরও কেউ কেউ লক্ষ করেছিল। বটুকের সেক্রেটারি শৌভিক নন্দও ব্যাপারটা জানত। ইন ফ্যাক্ট, শৌভিক নন্দর কাছ থেকেই গোবিন্দ পিটার অরোরার টাকা নেবার ব্যাপারটা জানে। কিন্তু টাকাটা পিটার তার বান্ধবী পল্লবীর বাড়িতে রেখেছিল, এটা জাস্ট একটা অনুমান। আচ্ছা, শৌভিক নন্দ কি এখনও তোদের কাস্টডিতে আছে?'

'না। কুমুদিনী থেকে আমরা যাদের অ্যারেস্ট করেছিলাম তারা সকলেই বেলে ছাড়া পেয়ে গেছে। পুলিশ এখনও কারও বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করে উঠতে পারেনি। ফলে ওদের ছেড়ে দিতেই হত। তবে দরকার পড়লে এদের সকলকেই ইন্টারোগেশনের জন্যে আবার ডাকা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, তোরা এই অ্যাঙ্গেলটা এক্সপ্লোর করে দ্যাখ। আমাকে শুধু পল্লবী ভদ্রর ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বল।'

'আসলে পল্লবী ভদ্রর খুনের ঘটনাটা বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আওতায়। ওখানকার জয়েন্ট কমিশানার শার্দুল সিং কেসটা ইনভেস্টিগেট করছে। শার্দুল শুধু যে আমার ব্যাচমেট তাই নয়, আমার ঘনিষ্ঠ

বন্ধুও বটে। কেসটার ব্যাপারে শার্দুল আমার সাহায্য চেয়েছে। তাই পল্লবী ভদ্রর সম্বন্ধে আমি খানিকটা জ্ঞান অর্জন করেছি।'

গৌতম টেবিলের ওপর রাখা বেলটা বাজাল। পরিচারক ঘরে ঢুকে সাড়া দেবার পর গৌতম তাকে বলল, 'আর একবার চা দাও। আর সমীরবাবুকে আসতে বল।'

আদিত্য জানে, সমীরবাবু গৌতমের ব্যক্তিগত সচিব।

'পল্লবী ভদ্রর ডোসিয়ারটা নিয়ে আসুন।' সমীরবাবু ঘরে ঢুকতে গৌতম তাকে বলল।

একটু পরে পল্লবী ভদ্রর ফাইলটা থেকে চোখ তুলে গৌতম আদিত্যকে বলল, 'পল্লবী ভদ্রর বাড়ি কলকাতায়, যাদবপুর ছাড়িয়ে একটা রিফিউজি কলোনিতে। ডাকনাম পলি। পরিচিতরা তাকে ওই নামেই ডাকে। পলির ঠাকুরদাদা দেশভাগের সময় উদ্বাস্তু হয়ে ওপার বাংলা থেকে চলে আসে। এখানে বাঘা যতীনের কাছে একটা মনিহারি দোকান খোলে। সেই দোকান এখন পলির দুই কাকা দেখাশোনা করে। পলির বাবা কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। তার জোরে সে একটা সরকারি চাকরি পেয়ে যায়। ওই কলোনিতেই নিজে একটা বাড়ি করে পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে যায়। পলির মা গৃহবধূ। পলিরা এক ভাই এক বোন। ভাই আর্মিতে চাকরি করে। বাবা-মা ভাই সকলেই বেঁচে আছে।

'বয়ঃসন্ধি থেকেই পল্লবীর প্রচুর অ্যাডমায়ারার। প্রথমে যে কলোনিতে পলি বড় হয়েছে, সেখানে। পরে যে কলেজে সে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট পড়েছে সেখানে। কলেজ থেকে পাশ করে পলি কিছুদিন নয়ডার একটা হোটেলে চাকরি করেছিল। নয়ডার হোটেলের সহকর্মীরা পুলিশকে জানিয়েছে সেখানে একটি বাঙালি ছেলের সঙ্গে পলির সম্পর্ক হয়। ছেলেটি কলকাতার, নয়ডায় চাকরি করত। একটা সময় তারা বিয়েও করবে ভেবেছিল। তারপর ছেলেটি কলকাতায় চলে আসে। পলিকেও চলে আসতে বলে। ছেলেটি নাকি কলকাতায় পলির জন্যে একটা চাকরিও দেখে রেখেছিল। এর পরে আর ছেলেটির কোনও ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পলির বাড়িতে কোনও সিসি টিভি ছিল? মানে, সেখানে কাউকে ঢুকতে বেরতে দেখা গেছে?'

'না, সিসি টিভি ছিল না। বাড়িটা সবে হয়েছে। প্রোমোটার সিসি টিভি বসাব বসাব করে এখনও বসিয়ে উঠতে পারেনি। ঘটনার দিন সন্ধেবেলা সিকিউরিটির ছেলেটাও ছিল না। তার নাকি মা অসুস্থ বলে দেশের বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। বাজে ফোন। ছেলেটা গিয়ে দেখে মা বহাল তবিয়তেই আছে। তবে সে যে সেই রাত্তিরে দেশের বাড়িতে ছিল তার একাধিক সাক্ষী আছে। সিকিউরিটি ছেলেটা বলছে পিটার অরোরা এবং দু-চারজন ফেরিওলা ছাড়া আর খুব বেশি লোক পলির ফ্ল্যাটে আসত না। শুধু একটি অল্পবয়সী ছেলে মাঝে মাঝে আসত, পলির সঙ্গে রাত্তির কাটাত। আমাদের ধারণা সে-ই পলির পুরোনো বয়ফ্রেন্ড।'

'বুটলেগারের চাকরিটা পলি পেয়েছিল কী করে?'

'ইন্টারভিউ দিয়ে। বুটলেগার খবর কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। পলি সেই বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করেছিল। তার বাবা-মা আমাদের সেটাই বলেছে।'

'পলি কেন নয়ডা থেকে ফিরে এল সে বিষয়ে তার বাবা-মা কিছু বলেছে?'

'পলির বাবা-মা একটা অন্য গল্প বলছে। তারা বলছে, পলির নয়ডায় ভাল লাগছিল না তাই ফিরে এসেছিল। কোনও ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের কথা পলির বাবা-মা জানে না। নয়ডা থেকে ফিরে এসে কিছুদিন পলি বাড়িতে বসে ছিল। তারপর ইন্টারভিউ দিয়ে বুটলেগারের চাকরিটা পায়। এই চাকরিটা নেবার ব্যাপারে পলির বাবা-মার, বিশেষ করে বাবার খুব আপত্তি ছিল।'

'বুটলেগার নাইটক্লাবে পলির কাজটা কী ছিল?'

'ম্যানেজারের কাজ। নাইটক্লাবের সমস্ত কাজকর্মের ওপর সুপারভাইজ করার কাজ। তবে অ্যাকাউন্টস-এর দিকটা পলি দেখত না। তার দায়িত্ব ছিল জেনারেল হসপিটালিটি। গেস্টরা ঠিকমতো খাবার দাবার বা অন্যান্য ফেসিলিটিস পাচ্ছে কিনা বা তাদের অন্য কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা, এইসব দেখা। এই হসপিটালিটি নিয়েই তো পলি পড়াশোনা করেছিল।'

'পিটার অরোরার সঙ্গে তার কবে থেকে ভাব হল?'

'সঠিক সময়টা পুলিশ জানতে পারেনি। তবে এইটুকু জানা গেছে যে বুটলেগারে যোগ দেবার পর থেকেই বাবা-মায়ের সঙ্গে পল্লবীর খিটিমিটি লেগে থাকত। কাজ সেরে তার ফিরতে রাত্তির দুটো-তিনটে হয়ে যেত। সেটা শুধু পল্লবীর বাবা-মা নয়, পাড়ার লোকেরাও ভাল চোখে দেখত না। ফলে কাজে যোগ দেবার মাস ছয়েক পরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। ওই সময় থেকেই পল্লবী রাজারহাটের ফ্ল্যাটটাতে থাকতে শুরু করে। ফ্ল্যাটটা তাকে পিটার অরোরাই ভাড়া করে দিয়েছিল। পুলিশকে পিটার বলেছে ফ্ল্যাটটা ছিল পল্লবীর কোয়ার্টার। তবে সেই কোয়ার্টারে যে পিটার নিজেও মাঝে মাঝে রাত কাটাত সেটা সে অস্বীকার করেনি।'

'এই পিটার অরোরা সম্বন্ধে তোদের কী মত?'

'দু-কান কাটা বদমাস। নেহাত খুনের সময়ে লোকটা দিল্লিতে ছিল বলে ওকে ফাঁসাতে পারছি না। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে পল্লবীকে খুন করার মোটিভটাও লোকটার ছিল না।'

'দিল্লিতে যে লোকটা ছিল তার সাক্ষী আছে নিশ্চয়।'

'একটা নয়, অনেকগুলো সাক্ষী। লোকটা একটা বিয়ের পার্টি অ্যাটেণ্ড করতে দিল্লি গেছিল। রাত পর্যন্ত পার্টি করেছে। অনেকে তার সাক্ষী আছে। তারপর আরও কিছুদিন দিল্লিতে থেকে গিয়েছিল। তারও সাক্ষী আছে।'

'পিটার অরোরার ফ্যামিলি নেই?'

'বউ-এর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে ইউকে-তে। ছেলেটা মায়ের সঙ্গেই নিউ বালিগঞ্জে থাকে। এখনও বিয়ে করেনি।'

'একটা জিনিস চেক করে আমায় বলতে পারবি? গোবিন্দ রায় আমাকে বলেছিল, কুমুদিনী রেড হবার আগের দিন পিটার অরোরা তার গ্যাম্বলিং জয়েন্ট-এর জন্য এক কোটি টাকা নিয়েছিল। এটা নিয়ে সে কী করেছে? খুব সম্ভবত টাকাটার কথা সে স্বীকার করবে না, কারণ টাকা এবং গ্যাম্বলিং জয়েন্ট দুটোই দুনম্বরী। তবু একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে। আমি জেনে তোকে জানিয়ে দেব।'

'আমার আর একটা রিকোয়েস্ট আছে। দু-এক দিনের মধ্যে কয়েকটা জায়গায় গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যাকে বলে ইন্টারোগেশন। আমি একা গেলে কেউ পাত্তাই দেবে না। তুই আমার সঙ্গে একটা পুলিশ দিতে পারবি?'

'তুই চাকি ছেলেটাকে নিয়ে যা না। ও হয়তো মুখুটির মতো অতটা ব্রাইট নয়, কিন্তু খুব সিনসিয়ার। মুখুটি যে কবে নর্থ বেঙ্গল থেকে ফিরবে বুঝতে পারছি না।'

'চাকিকে পেলে আমার খুব ভাল চলে যাবে। পুলিশের উর্দিপরা যে কেউ সঙ্গে থাকলেই চলত আর চাকিকে তো আমার বিশেষ করে পছন্দ। আজ বিকেলে একবার সিতারা হোটেলে যাব ভাবছিলাম। চাকিকে পাওয়া যাবে?'

'আমি চেক করে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।'

'আর একটা কথা। গোবিন্দ রায়ের মোবাইলের কলার লিস্টটা নিশ্চয় তোরা বার করবি। ওটা তৈরি হলে আমাকে একটু জানাস।'

৫

সিতারা হোটেলের সামনে সন্ধেবেলায় খুব ভিড় থাকে। বলাই বাহুল্য, ভিড়টা সিতারা হোটেলে ঢোকার জন্যে নয়। হোটেলের মূল প্রবেশপথের দু-পাশে দুটো কাবাবের দোকান, ভিড়টা সেইখানে। দুটো দোকানের মধ্যে বেজায় কম্পিটিশন। কেউ কেউ বলে, কম্পিটিশনের কারণে দুটো দোকানই তাদের খাবারের মান

বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ফলে খদ্দেররাও অত্যন্ত তৃপ্ত। আবার অন্য একদল বলে, দুটো দোকানের একই মালিক। কম্পিটিশনটা পুরোপুরি লোক দেখানো। সত্যিটা যাই হোক, বেশ কিছুদিন হল, দুটো দোকানের কাবাবের খ্যাতি সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে।

আদিত্যর মনে হচ্ছে, এত দূর এসে এখানে কাবাব না খেলে নিজের প্রতি অন্যায় করা হবে। সে চাকিকে কাবাবের দোকানটা দেখিয়ে বলল, 'কাজ শুরু করার আগে একটু টিপিন করে নিলে মন্দ হত না।'

গৌতম একটা পুলিশের জিপ ওদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। পুলিশের জিপের সুবিধে হল যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। ওরা সেই সুযোগটা নিয়ে সিতারা হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে জিপটাকে দাঁড় করিয়ে কাবাব খাচ্ছিল। অ্যাসর্টেড কাবাব, রেশমি, বোটি, টিক্কা, শামি, আর সনাতন শিক কাবাব। দোকানের ভেতরে বসার জায়গা নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়া। আদিত্যর মনে হল, সে বহুদিন এত ভাল কাবাব খায়নি। হয়তো একটু খিদেও পেয়েছিল।

'চাকি সাহেব, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।' আদিত্য এক টুকরো রেশমি কাবাব মুখে চালান করে দিয়ে বলল।

'আমার নাম স্যার সুব্রত চাকি। আমাকে সুব্রত বলবেন, আমি আপনার থেকে অনেক ছোট।'

আদিত্য চট করে কাউকে নাম ধরে ডাকতে পারে না। সে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার সার্ভিস কতদিন হল?'

'আগামী সেপ্টেম্বরে তিন বছর পূর্ণ হবে স্যার।'

'বাড়ি কত দূরে?'

'মধ্যমগ্রামে বাবা বাড়ি করেছেন। আমরা দু-ভাই ওখানেই থাকি। দাদা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। বাবা সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার্ড।'

সিতারা হোটেলের সেই বেয়ারাটি, যে সেই রাত্তিরে রিসেপশনে ছিল, কোনও কাজে হোটেলের বাইরে এসেছিল। সে ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। আদিত্যর মনে পড়ে গেল ওর নাম রহমান।

'আপ লোগ অন্দর আয়েঙ্গে সাব?' রহমান সসম্ভ্রমে বলল। তারপর ওদের খাওয়া শেষ হয়নি দেখে মৃদুস্বরে বলল, 'বহুত বড়িয়াঁ কাবাব হ্যায় সাব। এয়সা কাবাব আপকো সারে কলকাত্তে মে কঁহি নেহি মিলেগা।'

'ম্যানেজার সাহেব এসেছেন? সফিকুল সাহেব? ওর সঙ্গে আগে কথা বলব।' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ম্যানেজার সাব অন্দর অফিস মে হ্যায়। ম্যায় উনকো যাকে বাতাউঁ কি আপ লোগ আয়ে হ্যাঁয়?'

'ঠিক আছে। তুমি গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দাও। আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।' চাকি পুলিশি গলায় বলল।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আদিত্য বিল মেটাচ্ছে দেখে চাকিও পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। 'একদম নয়, একদম নয়। এই কাবাব খাবার প্রস্তাবটা আমার ছিল।' আদিত্য জোর গলায় বলল।

চাকি আর খুব বেশি জোরাজুরির মধ্যে গেল না। শুধু একটু কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

ম্যানেজার সফিকুল ইসলাম খবর পেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'ভেতরে যাবেন তো স্যার?' সে বিনীতভাবে বলল।

'দু-একজনের সঙ্গে একটু কথা বলব। আপনার ঘরটা ব্যবহার করা যাবে?' আদিত্য কেজো গলায় বলল।

'নিশ্চয় যাবে স্যার। অবশ্যই যাবে। আপনারা চলুন আমার ঘরে গিয়ে বসবেন।'

ম্যানেজারের ঘরটা একতলাতেই। রিসেপশনের সামনে দিয়ে যেতে হয়। আদিত্য লক্ষ করল রিসেপশনে সেই রঞ্জিত বলে ছেলেটা বসে আছে। মনে হয় আদিত্যকে চিনতে পেরেছে। তাকে দেখে মলিন হাসল। দু-একজন বোর্ডার ইউনিফর্ম পরা চাকিকে দেখে ভুরু কোঁচকাচ্ছে।

সফিকুলের ঘরটা খুব বড় নয়। তার মধ্যেই একদিকে একটা সোফা সেট। সফিকুল আদিত্যদের সোফায় বসাল। বলল, 'একটু চা খাবেন স্যার?'

চাকি আদিত্যর দিকে তাকিয়েছে। আদিত্যর মনে হল চাকির একটু চা খাবার ইচ্ছে। 'চা একটু খেলে হয়। তবে আমারটা দুধ-চিনি ছাড়া।' আদিত্য ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমারটা কিন্তু দুধ, চিনি সব দিয়ে।' চাকি তার পছন্দটা জানাতেই ম্যানেজার তার টেবিলের ওপরে রাখা বেলটা বাজাল। বলল, 'প্রথমে কার সঙ্গে কথা বলবেন স্যার?'

'প্রথমে সেই সিকিউরিটির সঙ্গে কথা বলব যে সেই রাত্তিরে গেটে ছিল। সে কি এখন এখানে আছে?'

'ওর তো স্যার নাইট ডিউটি। এখনও বোধহয় এসে পৌঁছয়নি। অন্যদের সঙ্গে বরং আগে কথা বলে নিন। কথা বলতে বলতে ও এসে যাবে।'

'তাহলে চারতলায় যে বেয়ারা সেই রাত্তিরে ডিউটি করেছিল তাকে ডাকুন।'

ইতিমধ্যে বেলের ডাকে সাড়া দিয়ে লাল কোট পরা একজন বেয়ারা ঘরে ঢুকেছে। 'চারতলায় তোমাদের কে রাত্তিরে ডিউটি করে? রমেশ করে না?' সফিকুল তাকে জিজ্ঞেস করল।

'জি সাব। রমেশ করে চারতলায় আর কালীচরণ করে তিনতলায়।'

'রমেশকে পাঠিয়ে দাও। রমেশ এসেছে তো?'

'জি সাব।'

রমেশ নামধারী ব্যক্তিটি কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, বিশেষত্বহীন একজন নেই হয়ে থাকা মানুষ। চেহারা দেখে মনে হয় অবাঙালি, কিন্তু বাংলা বলে চমৎকার।

'আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?' সে সফিকুলের দিকে তাকিয়ে বলল।

'তোমাকে আমরা ডেকেছিলাম। কিছুদিন আগে চারশো বারো নম্বর ঘরে যে খুনটা হয়ে গেছে সেই ব্যাপারে দু-একটা প্রশ্ন করব।' চাকি গম্ভীর গলায় বলল।

রমেশকে খানিকটা উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। সে আদিত্যদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার পুরো নাম।'

'রমেশ পাসোয়ান, সাব।'

'কতদিন এই হোটেলে কাজ করছ?'

'দশ বছর হয়ে গেছে, সাব।'

'যে রাত্তিরে চারশো বারো নম্বর ঘরে খুনটা হয় সেই রাত্তিরে তুমি চারতলায় ডিউটি করেছিলে?'

'হ্যাঁ, সাব।'

'কতক্ষণ তোমার ডিউটি?'

'বেলা বারোটা থেকে রাত্তির বারোটা, সাব।'

'সেদিন রাত্তিরে তুমি কোনও সন্দেহজনক শব্দ শুনেছিলে?'

'আমি তো সাব চারতলায় ছিলাম না। একতলায় বেয়ারাদের ঘরে ছিলাম। এটাই এখানকার নিয়ম। চারতলার ডিউটি ছিল মানে, চারতলা থেকে রুম সার্ভিসে কেউ কিছু চাইলে আমার দায়িত্ব ছিল সেই ঘরে জিনিসটা পৌঁছে দেওয়া।'

'সেই রাত্তিরে চারশো বারো নম্বরে কিছু পৌঁছে দিয়েছিলে?'

'চারশো বারো নম্বরের সাহেব তো খাবার জন্য ডাইনিং হলে নামতেন না। ঘরে খাবার আনিয়ে নিতেন। সেই রাত্তিরেও আমি ন-টা নাগাদ সাহেবের ঘরে ডিনার পৌঁছে দিয়েছিলাম। পৌনে দশটা নাগাদ সাহেবের ঘর থেকে এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে এসেছিলাম।'

'সাহেবকে তখন কেমন দেখেছিলে?'

'অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। আমি যখন এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে আসতে সাহেবের ঘরে ঢুকেছিলাম, সাহেব তখন টিভি দেখছিলেন।'

এতক্ষণ চাকিই প্রশ্ন করছিল। এবার সে আদিত্যর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি এবার জিজ্ঞেস করুন স্যার।'

'আচ্ছা রমেশ, চারশো বারো নম্বরের সাহেব যেদিন হোটেলে চেক ইন করলেন সেদিন কি তুমি ওঁর লাগেজগুলো ঘরে নিয়ে এসেছিলে?'

'সাহেব বেলা বারোটার একটু পরে চেক ইন করেছিলেন। আমিই ওর লাগেজ বয়ে এনেছিলাম।'

'কী কী লাগেজ সাহেবের সঙ্গে ছিল তোমার মনে আছে?'

'এমনিতে মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু একটা কারণে মনে আছে। সাহেবের সঙ্গে একটা সুটকেস ছিল আর একটা ব্যাগ। আমি দুটোই নিতে যাচ্ছিলাম। সাহেব বললেন ব্যাগে যেন আমি হাত না লাগাই। ওটা সাহেব নিজেই নিলেন। ব্যাগটা মনে হয় বেশ ভারী ছিল। ব্যাগের ভারে সাহেব একদিকে ঝুঁকে যাচ্ছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন অত ভারী ব্যাগটা সাহেব নিজে নিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা আমার আশ্চর্য লেগেছিল বলে মনে আছে।'

'বেশ, বেশ। তুমি তো চারতলায় ডিউটি করতে। সাহেবের ঘরে কখনও কোনও ভিজিটার আসতে দেখেছো?'

'একজন ভিজিটর তো রোজই আসত। এসে অনেকক্ষণ থাকত। মনে হয় সে সাহেবের কোনও অ্যাসিস্টেন্ট হবে। সাহেব নিজে ঘর থেকে বেরোতেন না। মনে হয় ওই অ্যাসিস্টেন্ট ছেলেটা সাহেবের বাইরের কাজগুলো করে দিত। এছাড়া আর কাউকে চারতলায় দেখিনি। তিনতলায় সাহেব আরেকটা ঘর নেবার পর সেখানে নাকি কিছু ভিজিটার আসত। একথা কালীচরণ আমাকে বলেছে। পুলিশকেও বলেছে। কালীচরণ তিনতলায় ডিউটি করে। ও দেখেছে। আমি নিজের চোখে দেখিনি।'

'হোটেলের কোনও গেস্টকে কখনও সাহেবের ঘরে আসতে দেখেছ?'

'আপনি জিজ্ঞেস করতে এখন মনে পড়ছে সাব। তিনশো এক নম্বর ঘরের সাহেবকে একবার চারশো বারো নম্বরে দেখেছিলাম। ওরা দুজনে ড্রিঙ্ক করছিলেন। চারশো বারোর সাহেব আমাকে টাকা দিয়ে বললেন সামনের দোকান থেকে কাবাব নিয়ে এসো। আমি ওদের কাবাব এনে দিলাম। ওরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। যেমন বন্ধুরা করে।'

'ওই একদিনই কি তিনশো এক নম্বর ঘরের সাহেবকে চারশো বারো নম্বরে দেখেছিলে?'

'ওই একদিনই দেখেছিলাম সাব।'

'আচ্ছা রমেশ, চারশো বারো নম্বরের সাহেব কখনও বাইরে বেরোতেন?'

'খুব একটা বেরোতেন না সাব। খাবার তো ঘরেই খেতেন। খুব মাঝে মাঝে একবার-দুবার বেরিয়েছেন। তার মধ্যে একবার ভোরবেলা বেরিয়ে গেলেন। রাত্তিরে ফেরেননি, বাইরে কোথাও ছিলেন। ডিনার খাননি। পরের দিন দুপুরে হোটেলে ফিরে আমাকে লাঞ্চ আনতে বললেন।'

'সেটা ঠিক কবে তোমার মনে আছে?'

'ঠিক মনে নেই সাব। সাহেব খুন হবার মোটামুটি তিন-চার দিন আগে হবে।'

'আর আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। ঠিক আছে রমেশ, তুমি এখন আসতে পার।'

রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আদিত্য ম্যানেজারকে বলল, 'আপনি একটু দেখুন খুনের সময় তিনশো এক নম্বর ঘরে কে ছিলেন? তিনি এখনও সেখানে আছেন কিনা। আর না থাকলে কবে চেক আউট করেছেন।'

'আমি এক্ষুনি দেখে বলে দিচ্ছি স্যার।' ম্যানেজার তার টেবিলের পাশে রাখা কম্পিউটারে মন দিল। একটু পরে সে কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে বলল, 'তিনশো এক-এর বোর্ডারের নাম এক্রামুল হক। ঠিকানা,

বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। পেশায় ব্যবসায়ী। আমাদের হোটেলে চেক ইন করেছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ ফিরদৌস রহমান চেক ইন করার চোদ্দো দিন পরে। চেক আউট করেছে ৬ই মার্চ, মানে ফিরদৌস রহমান খুন হবার দুদিন পরে।'

'আপনি এক্রামুল হকের ডিটেলটার একটা প্রিন্ট আউট দেবেন? তাহলে চাকি সাহেব লোকটার খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। আর হ্যাঁ, লোকটা একটা আইডেন্টিটি প্রুফ দিয়েছিল নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ। আধার কার্ডের জেরক্স দিয়েছিল।'

'ওটারও একটা ফটোকপি দেবেন।'

'নিশ্চয় স্যার।'

'এবার দেখুন তো সেই সিকিউরিটির লোকটি এসেছে কিনা।'

সিকিউরিটির লোকটি মধ্যবয়স্ক, স্বাস্থ্যবান ও স্বল্পভাষী। চাকি এবং আদিত্যর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল তার নাম আবদুর রফিক। সে রোজ রাত আটটা থেকে পরের দিন সকাল আটটা অব্দি ডিউটি করে। সে কখনও রাত্তিরে ঘুমোয় না, খুনের রাত্তিরেও ঘুমোয়নি। তাছাড়া খুনের রাত্তিরে ঘুমোনো সম্ভব ছিল না কারণ পাশের গলিতে সারা রাত্তির হোলির গান চলছিল। প্রচণ্ড হল্লা হচ্ছিল। হোলি শেষ হয়ে যাবার পর একমাস অব্দি এইরকম হল্লা চলে। অত হল্লা হলে কেউ ঘুমোতে পারে?

৫

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রোহিত ধামানির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেল। শেক্সপিয়ার সরণির ওপরে রোহিত ধামানির জুয়েলারি শপ, তারই দোতলায় অফিস। টেলিফোনে রোহিত ধামানি বলেছিল সে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে অফিস পৌঁছে যায়, আদিত্য যেন নটার মধ্যে চলে আসে। সে ব্যস্ত লোক, আদিত্যকে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবে না। ঠিক দশটায় তার দোকান খুলে যায়, সাড়ে ন-টা থেকে কর্মচারীরা আসতে শুরু করে। অতএব সাড়ে ন-টার আগেই আদিত্যকে তার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে ফেলতে হবে। গৌতম নাক না গলালে রোহিত ধামানির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াই যেত না।

রোহিত ধামানির প্রোডাকশান হাউস সম্বন্ধে আদিত্য আগেই কিছু তথ্য জোগাড় করেছিল, এবার ইন্টারনেট ঘেঁটে তার পারিবারিক ইতিহাসও কিছু জানতে পেরেছে। ধামানিরা তিন পুরুষ ধরে কলকাতার বাসিন্দা। রোহিত ধামানির ঠাকুরদাদা শ্যামদাস ধামানি সামান্য পুঁজি সম্বল করে রাজস্থান থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, তারপর নিজের চেষ্টায় বউবাজারে একটা সোনা-রুপোর দোকান খুলেছিলেন। সেই ব্যবসাকে অনেকটা বাড়াতে পেরেছিলেন রোহিতের বাবা, গণেশ ধামানি। তিনি ছিলেন তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে, তাই বাবার ব্যবসার ভাগ কাউকে দিতে হয়নি। থিয়েটার রোডের এই দোকানটা তাঁর আমলেই হয়েছিল। রোহিতও তার বাবার একমাত্র ছেলে, কাজেই এই দোকানটাকে সে পুরোপুরি নিজের মতো করে বড় করতে পেরেছে এবং তার ব্যবসাটাকে সে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছে। এখন তার মূল ব্যবসা বিদেশ থেকে না-কাটা হিরে কিনে সেগুলো কেটে এবং পালিশ করে আবার বিদেশে বিক্রি করা। এর পাশাপাশি কলকাতার দোকানটা ছাড়াও শিলিগুড়ি, গৌহাটি এবং পাটনায় তার আরও তিনটে দোকান আছে। সিনেমা প্রোডাকশানেও তার অনেকদিন হয়ে গেল।

'এই 'ফেরারি' সিনেমাটা প্রোডিউস করতে গিয়ে আমি একেবারে ফেঁসে গেছি। শুরুতে প্রজেক্টটা খুব অ্যামবিশাস ছিল। তারপর টাকা-পয়সা শর্ট পড়ে গেল। আমার কিছু বিজনেস ভেঞ্চার ব্যাড হয়ে গেল। বটুকবাবু কিছু ফিনান্স করবেন বলেছিলেন। তারও অসুবিধা হয়ে গেল। এখন কোনওরকমে প্রজেক্টটা শেষ করতে পারলে বেঁচে যাই।' রোহিত ধামানি তার নতুন প্রোডাকশানের কথা বলছিল। তার বাংলাটা প্রায় বাঙালিদের মতো।

'বটুকবাবু তো আগে আপনাদের কিছু ফিল্ম ফাইনান্স করেছেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয় করেছেন। অনেকবার করেছেন। বটুকবাবুর সঙ্গে আমার বিশ বছরের বিজনেস রিলেশান। কিন্তু এবার উনি কী করে হেল্প করবেন? আপনাদের পুলিশ তো ওর ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।' রোহিত ধামানি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

'আমি কিন্তু পুলিশের লোক নই, মিস্টার ধামানি। তাছাড়া আমি তো প্রথমেই বলেছি বটুকবাবুর ব্যবসা নিয়ে আমার ইনভেস্টিগেশন নয়। বটুকবাবুর একজন এমপ্লয়ি, নাম ফিরদৌস রহমান, খুন হয়েছে। আমি সেটা ইনভেস্টিগেট করছি। আপনি কি ফিরদৌসকে চিনতেন?'

'চিনতাম। ফিরদৌস বটুকবাবুর কাজ নিয়ে মাঝে মাঝে আসত। বটুকবাবু ওঁকে খুব বিশ্বাস করত। এর বেশি আর কিছু জানি না।' রোহিত ধামানি আবার ঘড়ির দিকে তাকাল।

'আচ্ছা, অন্য একটা প্রশ্ন করছি। সুমনা ঘোষালকে আপনি কতদিন চেনেন?' আদিত্য ঘড়ি দেখার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রশ্ন করল।

রোহিত ধামানি এবার সত্যিই অবাক হয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, 'সুমনা ঘোষালের সঙ্গে ফিরদৌসের কী কানেকশান আছে? এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'একটা রিমোট কানেকশন থাকতে পারে। দেখুন, সুমনা ঘোষালের সঙ্গে বটুকবাবুর কানেকশান আছে আর বটুকবাবুর সঙ্গে ফিরদৌসের। তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'ভাল বুঝলাম না। যাই হোক, সুমনাকে আমি অনেকদিন চিনি। ও অনেকবার আমার প্রোডাকশানে কাজ করেছে। শি অয়াজ আ গুড অ্যাকট্রেস, দো অফ দ্য ওল্ড টাইপ। ওরকম অ্যাক্টিং এখন আর চলে না।'

'তাহলে আপনার সঙ্গে সুমনা ঘোষালের শুধুই একটা প্রোফেশানাল বিজনেস রিলেশান ছিল?'

রোহিত ধামানি রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল। বলল, 'আদিত্যবাবু আপনি কিন্তু মিশ্চিভিয়াস আছেন। দ্য হোল ওয়ার্ল নোজ যে এক সময় আমার সঙ্গে সুমনার একটা সম্পর্ক ছিল। ইন ফ্যাক্ট উই ইউসড লিভ টুগেদার। আমার একটা ফ্ল্যাটে সুমনা থাকত। তারপর নানা কারণে উই ব্রোক অফ।'

'এখনও কি আপনার সঙ্গে সুমনা ঘোষালের যোগাযোগ আছে?'

'দেখুন আদিত্যবাবু, উই ব্রোক অফ উইদাউট এনি বিটারনেস। তাই যোগাযোগ এখনও আছে।'

'আপনিই তো ওর ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি। আমার মনে হয়, একটা সময় আই হ্যাড ডাম্পড সুমনা। তাই একটা কিছু ওর জন্যে করতেই হত। আমারও তো একটা বিবেক আছে। তবে রনি টার্নড আউট টু বি আ ভেরি ফাইন ল্যাড অ্যান্ড আ সিন্সিয়ার ওয়ার্কার। আমার প্রোডাকশান হাউসে ও কিন্তু নিজের কাজ দেখিয়েই উন্নতি করেছে।'

রোহিত ধামানি উঠে দাঁড়াল। আদিত্য বুঝল এর পর আর কথাবার্তা চালানো যাবে না।

রোহিত ধামানির অফিস থেকে বেরিয়ে আদিত্য সবে রাস্তায় পা রেখেছে এমন সময় সে লক্ষ করল আর একটা দরজা দিয়ে রনি ঘোষাল বেরোচ্ছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। আদিত্যকে দেখে রনি এগিয়ে এল।

'আরে আদিত্যবাবু যে। এখানে কাজে এসেছিলেন?' আদিত্য রনির গলায় উষ্ণতা টের পেল।

'আপনার বসের কাছ থেকে অতি কষ্টে একটা পনেরো মিনিটের ইন্টারভিউ আদায় করতে পেরেছিলাম। কার্যত দেখা গেল সাত-আট মিনিটেই ইন্টারভিউ শেষ। আপনাদের নিউ এজ মুভিজ-এর আপিসটাও কি এখানে?'

'না, না। আমাদের আপিস টালিগঞ্জে। তবে অ্যাকাউন্টস-এর কাজ সব এখানে হয়। তাই মাঝে মাঝে এই আপিসটাতে আসতেই হয়।'

দুজনে শেক্সপিয়ার সরণি ধরে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের দিকে হাঁটছে। আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোনদিকে যাবেন?'

'আমি মেট্রো ধরব। টালিগঞ্জে আমাদের অফিসে যাব। আপনি?'

'আমিও মেট্রো ধরব। তবে উল্টোদিকে। বউবাজারে আমার আপিসে ফিরব।'

কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে হাঁটল। অ্যাসটর হোটেলের উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান। ফুটপাথেরই দোকান কিন্তু বেজায় ভিড়। এখানকার মশলা চা নাকি এতই বিখ্যাত যে গাড়ি করে লোক এখানে চা খেতে আসে। রাস্তার ধারে সত্যিই অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য বলল, 'চা খাবেন নাকি? সময় হবে?'

রনি ঘোষাল ঘড়ি দেখল। বলল, 'আমাকে এগারোটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে হবে। একজন এসে বসে থাকবে। তবে চা একটা খাওয়াই যায়।'

'আপনাদের 'ফেরারি' সিনেমার শুটিং কেমন চলছে?' কিছুক্ষণ পরে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক লাগিয়ে আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'চলছে একরকম। তবে ছবির নাম বদলেছে। এখন ছবির নাম হয়েছে 'মায়ের স্বপ্ন'। গল্পও বদলেছে। সব প্রোডাকশানেই টুকটাক ঝামেলা লেগে থাকে। এটাতেও আছে। তার ওপর এই ছবির যিনি নায়িকা সেই মধুশ্রী চ্যাটার্জীর মেজাজ তো সব সময় সপ্তমে চড়ে আছে। পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষে নেই। সব ঝামেলা এই প্রোডাকশান ম্যানেজারকেই সামলাতে হয়। নামেই প্রোডাকশান ম্যানেজার, আসলে গোমস্তার কাজ। এত অপমান মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে।' রনির গলাটা হঠাৎ খুব তিক্ত শোনাল।

'রণপ্রিয়বাবু, চাকরি মানেই পরের দাসত্ব, আর দাসত্ব মানেই অপমান। আমিও নানারকম চাকরি করে দেখেছি। অপমান সব চাকরিতেই আছে। সেদিক থেকে আপনার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা মিলে যাচ্ছে।' আদিত্য বন্ধুত্বের গলায় বলল। 'তাই তো আমি চাকরি ছেড়ে এখন স্বাধীন ব্যবসা করছি।' আদিত্য মৃদু হাসল।

'আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার মিল থাকলেও, আপনার সঙ্গে আমার অনেক তফাত আদিত্যবাবু। আপনি বনেদি ঘরের মানুষ, সমাজের ওপরের তলায় আপনার অনেক যোগাযোগ। আর আমি পিতৃ-পরিচয়হীন এক ব্যক্তি, যার মায়ের পরিচয়টাও বুক ফুলিয়ে বলার মতো কিছু নয়। তাই আমাকে একটু-আধটু অপমান সহ্য করে চাকরিটা চালিয়ে যেতেই হবে।' রনি ঘোষাল দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

আদিত্য মাথা নিচু করে রয়েছে। তার মনে হচ্ছে অনিচ্ছাকৃতভাবে সে রনি ঘোষালের মনের গভীরে আঘাত করে ফেলেছে। সে বলল, 'আমি যদি ভুল করে আপনাকে আঘাত করে ফেলে থাকি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'না, না। আপনি তেমন কিছুই বলেননি। এটা আমারই একটা ইনসিকিওরিটি বলতে পারেন। চলুন, পা চালানো যাক। আমার একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে।' রনি ঘোষাল স্বাভাবিক গলায় বলল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

আদিত্য ঠিক করেছিল ভোরবেলা বহরমপুর রওনা হয়ে সেই রাত্তিরেই ফিরে আসবে। ভোর ছটা পঞ্চাশে কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়ে হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস, দশটা বারোয় বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ঢুকে যায়। ওই ট্রেনটারই আবার পাঁচটা ষোলো মিনিটে বহরমপুর ছেড়ে নটা চল্লিশে কলকাতা স্টেশনে ফিরে আসার কথা। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলতে পারলে ফিরতি হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসটা অবশ্যই ধরা সম্ভব।

তবে ভোর ছটা পঞ্চাশে কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়ছে যে ট্রেন তাকে ধরতে গেলে ছটা দশ-পনেরোর মধ্যে কলকাতা স্টেশনে পৌঁছে যেতে হবে। সেটা, অন্তত আদিত্যর পক্ষে, মোটেই সোজা কাজ নয়। কলকাতা স্টেশনটা অদ্ভুত জায়গায়, সেখানে পৌঁছনোই এক ঝকমারি। সেখানে ছটা দশ-পনেরোর মধ্যে পৌঁছতে গেলে পাঁচটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবে। আর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠার দরকার থাকলে টেনশনে সারা রাত্তিরই ঘুম হবে না।

এর ফলে যেটা হল, ছটা পঞ্চাশের গাড়িটা আদিত্য কোনওরকমে ধরে ফেলল বটে, কিন্তু সারা রাত্তিরের ঘুম চোখে জমে ছিল বলে জানলার ধারের সিটে বসে সেই যে ঝিমোতে শুরু করল, কৃষ্ণনগর স্টেশন আসার আগে সে ঝিমুনি কাটল না। গাড়ি কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনে থামতে এক কাপ চা খেল আদিত্য। সঙ্গে দুটো দিশি বিস্কুট। একটা ইংরেজি কাগজ কিনে কিছুক্ষণ খবরে চোখ বোলাল। তারপর ট্রেনটা চলতে শুরু করার পর শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেয়ার জেঠুর বাড়ি পঞ্চাননতলা, বহরমপুর কোর্ট স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে গেলে আধঘন্টা লেগে যাবে। তার থেকে একটা টোটো ভাড়া করে নেওয়া ভাল, বিশেষ করে ভাড়ার টাকাটা যখন মক্কেলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া কেয়ার জেঠুর বাড়ি থেকে কোথায় যেতে হবে আদিত্য এখনও জানে না। তাই স্টেশনে নেমে একটা টোটো সে সারাদিনের জন্যে ভাড়া করে ফেলল। কেয়া বলে দিয়েছিল, বহরমপুর শহরে যেরকম ট্র্যাফিক জ্যাম হয় তাতে মোটর গাড়ির থেকে টোটো ভাড়া করাটাই সুবিধেজনক।

কেয়া বলেছিল, পঞ্চাননতলা পৌঁছে অমল বাগচির বাড়ি কোথায় বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে। অমল বাগচি এক সময় ওকালতি পাস করে বহরমপুর কোর্টে প্র্যাক্টিস করতেন। তবে প্র্যাক্টিসটা নামে মাত্র, তাঁর আসল নেশা ছিল দেশ-সেবা। তখনকার শাসকদলের টিকিটে দাঁড়িয়ে বার কয়েক মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনে জিতেও ছিলেন। সেসব অবশ্য অনেক দিন আগেকার কথা। এখন দেশের রাজনীতিটা আগাপাশতলা বদলে গেছে, এতটাই বদলে গেছে যে অমল বাগচি রাজনীতির মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না। তাই রাজনীতিতে আর কোনও উৎসাহও পান না। তাঁর পুরোনো দলটাও বহুদিন হল আর নেই। ফলে আজকালকার ছেলে ছোকরারা কেউ তাঁর কাছে আসে না। তবু তাঁর নামটা এখনও স্থানীয় মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। হয়ত এই কারণে যে, অমল বাগচি আদ্যোপান্ত একজন সৎ মানুষ ছিলেন, রাজনীতিবিদদের মধ্যে যেমনটা আজকাল খুব বেশি দেখা যায় না।

পঞ্চাননতলার মোড়ে পৌঁছে অমল বাগচির নাম বলতেই চায়ের দোকানে আড্ডারত দুটি যুবক সামনের একটা গলি দেখিয়ে দিল। সেই গলিটা ধরে মিনিট তিনেক চলার পর একটা বাঁকের মুখে অমল বাগচির বাড়ি। লাল রঙের পুরোনো দোতলা বাড়ি। তার গা ঘেঁসে একটা নতুন পাঁচতলা বাড়ি উঠেছে। আদিত্য আন্দাজ করল, নতুন বাড়িটা যেখানে উঠেছে সেখানে এক সময় কেয়াদের অংশটা ছিল।

বাড়ির সামনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে রোয়াক, রোয়াক পেরিয়ে বাড়ির সদর দরজা। বাড়ির প্ল্যানটা প্রাচীন যুগের, আজকের দিনে কেউ বাড়ির সামনে রোয়াক বানিয়ে জায়গা নষ্ট করে না। কেয়া নিশ্চয় বলে রেখেছিল হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসে আদিত্য আসছে। না হলে একজন বৃদ্ধ পরিচারক তার জন্যে রোয়াকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে কেন?

'আপনি ছোড়দির বন্ধু? কলকাতা থেকে আসছেন?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

আদিত্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগে তার টোটোর চালককে বলল, 'আমি এখানে কিছুক্ষণ থাকব। বেরোনোর আগে আপনাকে ফোন করে ডেকে নেবখ'ন।'

সদর দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা হাতের ঠেলায় খুলে বৃদ্ধ আদিত্যকে ভেতরে আসতে বলল। ভেতরে ঢুকেই বসার ঘর। খুব বড় নয়। একটা ভ্যাপসা পুরোনো গন্ধ ঘরটাতে ভাসছে। একদিকে একটা পুরোনো আমলের ফরাশ ঢাকা তক্তপোশ। তার ওপর যে চাদরটা পাতা রয়েছে সেটা, অনুমান করা যায়, এক সময় সাদাই ছিল, এখন বয়সের ভারে ধূসর হয়ে গেছে। এছাড়া ঘরে আসবাব বলতে দু-টো চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা মান্ধাতার আমলের দেরাজ। দেরাজের কাঠের পাল্লাগুলো বন্ধ, অতএব ভেতরে কী রয়েছে জানার উপায় নেই। ওপরে কয়েকটা কেষ্টনগরের পুতুল। গোটা তিনেক ফটোগ্রাফ। ফ্রেমে বাঁধানো ছুঁচের কাজ, তাতে লেখা 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'। বয়সের ভারে সকলেই মলিন হয়ে এসেছে। বসার ঘরটা খুব একটা ব্যবহার হয় না।

বৃদ্ধ পরিচারকটি বলল, 'কত্তা চানে গেছেন। একটু বসতে হবে।'

চেয়ার দু-টো এতই পুরোনো যে বসতে ভরসা হয় না। আদিত্য ভেবেচিন্তে তক্তপোশের ওপরেই বসল।

আদিত্য বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। কেয়াকে ছোড়দি বলা হচ্ছে কেন? নিশ্চয় এই কারণে যে কেয়ার জ্যাঠামশায়ের দুই মেয়ে কেয়ার থেকে বড় এবং তারা যথাক্রমে বড়দি ও মেজদি। আগে একান্নবর্তী পরিবারে এই রকমই হতো। ঘরে বই-পত্তর বিশেষ নেই যে উলটে পালটে দেখবে। টেবিলের নিচের তলায় যেখানে ম্যাগাজিন রাখার জায়গা সেখানে একটা খবর কাগজ রয়েছে। আদিত্য হাতে নিয়ে দেখল সেটা বছর চারেকের পুরোনো। তাতে অবশ্য আদিত্যর ভালই হল। পুরোনো খবরের কাগজ পড়তে আদিত্যর বেশ ভালই লাগে।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। আসলে বয়েস হয়েছে তো, আজকাল তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারি না। হলধর অনেক আগেই খবর দিয়েছে তুমি এসেছো।'

আদিত্য পুরোনো খবর কাগজটা পড়তে পড়তে আবার ঝিমোচ্ছিল, অমল বাগচির গলার আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। অমল বাগচিকে সে যতটা বৃদ্ধ কল্পনা করেছিল আসল মানুষটা ততটা বৃদ্ধ নন। মাথার চুল যদিও অধিকাংশই সাদা, দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা এখনও ঋজু, শিরদাঁড়াটা একেবারে সোজা রয়েছে। বস্তুত, আদিত্যর মনে হল, বাড়ি, বাড়ির মালিক, আসবাবপত্র, পরিচারক সব কিছুর মধ্যে বাড়ির মালিকই সব থেকে তরুণ।

'চল দুজনে আগে খেয়ে নিই। তারপর তোমার কথা শুনব।'

খাবার প্রস্তাব আসবে আদিত্য মোটেই আশা করেনি। কেয়া তার সম্বন্ধে কী বলেছে কে জানে? সে ভদ্রতা দেখিয়ে একটু আপত্তি জানাল। তবে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করল না। সে 'আপনাকে খুব অসুবিধেয় ফেললাম' এইটুকু বলে অমল বাগচির পেছন পেছন বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। একতলায় কোণার দিকে খাবার ঘর। মাটিতে দুটি আসন পাতা। আসনের সামনে কাঁসার থালায় ভাত বাড়া হয়েছে। পাশে কাঁসার বাটিতে ডাল, মাছের ঝোল, পাঁঠার মাংস। একটা ছোট্ট বাটিতে ঘি। থালায় বাড়া ভাতের পাশে পটোল ভাজা, কুমড়ো ভাজা, এক টুকরো গন্ধরাজ লেবু, একটা তন্বী কাঁচা লঙ্কা। দেখে আদিত্যর মনটা ভাল হয়ে গেল। সে আসনে বসতে বসতে আবার বলল, 'আপনাকে যে কী অসুবিধেয় ফেললাম।'

'ফের যদি অসুবিধে অসুবিধে বল, মাথায় গাঁট্টা মারব।' অমল বাগচি কপট ধমক লাগালেন। 'তুমি অপুর বন্ধু আর অপু হল এই বাড়ির ছোট মেয়ে, আমাদের সব থেকে আদরের। তোমার অযত্ন হলে অপু আমাকে আস্ত রাখবে নাকি? তাছাড়া অপু আমাকে বার তিনেক ফোন করে বলেছে তোমার যেন খাতির-যত্ন হয়।' অমল বাগচি হাসতে হাসতে আদিত্যর পাশে বসলেন।

'আমি তো কিছুই ব্যবস্থা করতে পারিনি। অপু এত দেরি করে বলল। আগে বললে তোমাকে গঙ্গার ইলিশ খাওয়াতে পারতাম।' বোঝাই যাচ্ছে অমল বাগচি কথা বলতে ভালবাসেন। খাওয়াতেও।

এর পরের পনের মিনিট আদিত্য চুপ করে খেয়ে গেল। কথা যা বলার অমল বাগচিই বলে গেলেন। তিনি জানালেন, আজ অনেকদিন পরে বাড়িতে মাংস রান্না হল। বামুনদিদি, যিনি সকালে রান্না করে চলে যান, আজ বেলায় এসে মাংস রান্না করেছেন। হলধর রান্না করতে জানে না। তবে চা-টা করতে পারে। আর রাত্তিরের রুটিটাও করে। তাছাড়া অবশ্য বাড়ির আর সব কাজ হলধরই করে।

'আপনি কি মোটামুটি বাড়িতেই থাকেন?' আদিত্য উঠতে উঠতে বলল।

'আরে বোসো, বোসো। উঠছ কোথায়? মুরশিদাবাদে এসে আম খাবে না?' অমল বাগচি আদিত্যর কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলেন। 'হলধর, এই হলধর। আম দে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে হলধর হাতে দুটি প্লেট নিয়ে হাজির। একটায় আম, অন্যটায় দুপিস বহরমপুরের বিখ্যাত ছানাবড়া। টেনিস বলের সাইজের।

'আপনি খাবেন না?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমার হাই সুগার। আম, মিষ্টি কোনওটাই আর চলে না। এখন লোককে খাইয়ে যেটুকু আনন্দ পাই।' আদিত্যর মনে হল অমল বাগচি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এটা রানিপসন্দ আম। বাজারে কিনতে পাবে না। মুরশিদাবাদের হেরিটেজ আম এটা।'

খাবার পরে অমল বাগচি বললেন, 'একটু বিশ্রাম করে নেবে নাকি? ওপরে সেই ব্যবস্থাও আছে। আমি আবার খাবার পরে আধঘণ্টা গড়িয়ে না নিলে পারি না।'

একে কাল রাত্তিরে ঘুম হয়নি, তার ওপর এই গুরুভোজন। আদিত্যর চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। সে দেখল ঘড়িতে একটা বেজেছে। আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়াই যায়।

'তোমার সঙ্গে অপুর কীভাবে জানাশোনা হল? তুমি কি অপুর সঙ্গে পড়তে? অপু আমাকে ফোন করে শুধু বলল, তুমি ওর খুব কাছের বন্ধু।' অমল বাগচি জিজ্ঞেস করলেন।

আদিত্য ভেবেছিল আধঘণ্টার বেশি ঘুমোবে না। ঘুমটা প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে। এখন তারা চা খাবে বলে দোতলার দালানে বেতের চেয়ারে বসে আছে।

'তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর তুললাম না। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ছিলে।'

'খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' আদিত্য লাজুক হেসে বলল। 'আসলে ভোরবেলায় ট্রেন ধরতে হবে এই টেনশনে কাল রাত্তিরে একদম ঘুম হয়নি।'

হলধর চা নিয়ে এসেছে। ঘড়িতে তিনটে পাঁচ।

'বললে না তো, অপুর সঙ্গে তোমার কীভাবে আলাপ?' অমল বাগচি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার সম্বন্ধে কেয়া কি কিছু বলেছে? বিশেষ করে আমার প্রফেশন সম্বন্ধে?' আদিত্য সাবধানী গলায় বলল।

'তেমন কিছু বলেনি। শুধু বলেছে তুমি হাবিবুর রহমানের ছেলে ফিরদৌসের ব্যাপারে জানতে চাও। কেন জানতে চাও তাও বলেনি। ফিরদৌসের ব্যাপারটা আমরা খবর কাগজে পড়েছি। ভেরি স্যাড। ফিরদৌসের বাবা হাবিবুর আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল।' অমল বাগচির মুখটা বেদনার্ত দেখাল।

আদিত্য কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'আমি পেশায় একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। ফিরদৌসের পিসি নুসরত বেগম আমার মক্কেল। তিনি ফিরদৌসের খুন হবার ব্যাপারটা

আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে বলেছেন।'

'তুমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা?' অমল বাগচির মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। 'বেসরকারি গোয়েন্দা?' ঠিক শুনেছেন কিনা যাচাই করার জন্যে তিনি কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ফিরদৌস রহমানের কেসটা ইনভেস্টিগেট করছি। কেয়া আর আমি একদম এক বয়সী, তবে সহপাঠী নই। কেয়া স্কটিশে ফিজিক্স পড়ত, আমি প্রেসিডেন্সিতে অঙ্ক। আমাদের একজন কমন বন্ধু ছিল, চন্দ্রলেখা সেন। কিছুদিন আগে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি সেই কেসটা ইনভেস্টিগেট করেছিলাম। সেই সূত্রে কেয়ার সঙ্গে আমার আলাপ হয়।'

'চন্দ্রলেখা সেন অন্তর্ধান রহস্য? এটার কথা তো মিডিয়াতে বিরাট করে বেরিয়েছিল। তোমার নামও বেরিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার নামটা প্রথম থেকেই আমার চেনা চেনা লাগছিল। তুমি তো বিখ্যাত লোক হে।' অমল বাগচির গলায় মুগ্ধতা।

'এই রকম বলবেন না জেঠু। আপনি যখন কেয়ার জেঠু আমারও জেঠু। আপনাকে মিথ্যে বলব না। সত্যি কথাটা হল, নানা কারণে বিএসসি পাশ করার পর আমার আর লেখাপড়া হয়নি। হরেক রকম কাজ করতে করতে পাকেচক্রে এই পেশায় এসে কোনওরকমে টিকে আছি। কেয়া সব জানে।'

'তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?'

এর পরের পনের মিনিট আদিত্যকে তার পরিবারের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানাতে হল। অমল বাগচি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলেন। অমল বাগচির প্রশ্নের সামনে আদিত্য ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছিল। সে বড় জমিদার বংশের ছেলে, তার ঠাকুরদাদা প্রখ্যাত ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন, বাবা ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মস্ত পৃষ্ঠপোষক। অথচ এখন অবস্থা গতিকে মহাত্মা গান্ধী রোডের কাছে একটা মেসে তাকে থাকতে হয়, পেটের দায়ে তাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয় এসব কথা কবুল করতে তার ভাল লাগে না। তবে আদিত্য খেয়াল করছিল অমল বাগচির চরিত্রে একটা স্নিগ্ধতা আছে, ফলে তার সামনে এসব কথা বলতে যতটা খারাপ লাগার কথা আদিত্যর ততটা খারাপ লাগছিল না।

সাড়ে তিনটে বেজে গেল অথচ এখনও কাজের কথা শুরুই হল না। সোয়া পাঁচটার হাজারদুয়ারিটা মনে হচ্ছে না ধরা যাবে। আদিত্য একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমি কি তাহলে এবার ফিরদৌস সম্পর্কে আমার প্রশ্নগুলো করতে পারি?'

'বল, বল কী জানতে চাও।'

'আমার একটাই প্রশ্ন। অল্প বয়েসে ফিরদৌস একটা চুরির মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার কোনও সাজা হয়নি। তার বাবা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এই চুরির মামলাটা সম্বন্ধে আপনার জানা আছে কি?'

'কেন জানি না, আমার মন বলছিল, তুমি এই প্রশ্নটাই করবে। তুমি ঠিকই বলেছ। ফিরদৌসের একটা গোপন ইতিহাস আছে যার কথা ওদের পরিবারের বাইরে খুব বেশি লোক জানে না। আমি জানি কারণ ফিরদৌসের বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। ব্যাপারটা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। ফিরদৌসের যখন পনেরো-ষোলো বছর বয়েস তখন পাড়ার একটি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে তার ভাব-ভালবাসা হয়। মেয়েটি ফিরদৌসেরই বয়সী, নাম জয়া, জয়া অধিকারী। এই সম্পর্কটা নিয়ে দুটি বাড়িতেই প্রবল আপত্তি ছিল, বিশেষ করে জয়াদের বাড়িতে। শোনা যায়, এই সময় বেশ কিছুদিন জয়াকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। সে যাই হোক, এই পর্যন্ত ঘটনাটা পাবলিক নলেজ, পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই জানা। বস্তুত সে সময় এটা নিয়ে স্থানীয় মহলে একটু হইচইও হয়েছিল। হবে নাই বা কেন? একে গল্পটা আঁসটে তার ওপর হাবিবুর রহমান বহরমপুরের নামকরা নেতা। ঘটনার পরের অংশটা অবশ্য ক্লাসিফায়েড।'

হলধর চায়ের খালি কাপগুলো নিতে ঘরে ঢুকেছে। বলল, 'রাত্তিরে কটা রুটি করব?'

'গোটা দশ-বারো করে রাখ।' অমল বাগচি বললেন। তারপর আদিত্যর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি রাত্তিরে কটা রুটি খাও?'

'রাত্তিরে? মানে আজ রাত্তিরেও আমি এখানে খাব?' আদিত্য অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অবাক।

'শুধু খাবে তাই নয়, রাত্তিরে থাকবেও। তারপর কাল সকালের ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরবে। কেন বুঝিয়ে বলছি। এখান থেকে তোমাকে জয়ার কাছে যেতে হবে। সেখানে কথা শেষ করে স্টেশনে ফিরতে ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। তখন আর ভাল কোনও ট্রেন নেই। অতএব তুমি জয়ার বাড়িতে কথা বলে সোজা আমার বাড়িতে ফিরছ। রাত্তিরে খাচ্ছ এবং থাকছ। বুঝতে পারলে?'

অমল বাগচি এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন এই ব্যবস্থাটা বহুদিন আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। আদিত্য আপত্তি করার কোনও সুযোগই পেল না। সে নিরীহভাবে বলল, 'রাত্তিরে আমি তিনটে রুটি খাই।'

'এবার ফিরদৌস-জয়া বৃত্তান্তের পরের অংশটা শোনো।' অমল বাগচি আবার বলতে আরম্ভ করলেন। 'ফিরদৌস আর জয়া ঠিক করল পালিয়ে গিয়ে বাড়ির অমতে বিয়ে করবে। আলাদা সংসার পাতবে। দুজনেরই তখন বছর কুড়ি বয়েস। মনে লাগামছাড়া প্রেম, তুলনায় সাধারণ বুদ্ধির প্রবল অভাব। তবে এটুকু তারা বুঝতে পেরেছিল যে আলাদা সংসার পাততে গেলে টাকা লাগবে। ফিরদৌস জয়াকে বলল, চিন্তা কোরো না, আমি টাকা জোগাড় করে ফেলব।

'ফিরদৌসের বাবার কাছে সেই সময় পার্টির কিছু টাকা থাকত। পার্টির তো নানা রকম টুকিটাকি খরচ থাকে, ওই টাকাটা থেকে সেইসব খরচ করা হত। পার্টির বড় কর্তারা জানতেন, হাবিবুরের কাছে টাকা থাকা মানে ব্যাঙ্কে টাকা থাকার থেকেও নিরাপদ। হাবিবুরের ইন্টিগ্রিটি ছিল ইম্পিকেবল। ফিরদৌস সেই পার্টির টাকা থেকে পঁচাশি হাজার টাকা সরিয়ে ফেলল। ঠিক কীভাবে টাকাটা সরিয়েছিল, আমার জানা নেই। আমাদের গল্পের জন্যে জানার প্রয়োজনও আছে বলে মনে হয় না।'

'তারপর?' আদিত্য প্রখর মনযোগ দিয়ে অমল বাগচির কথা শুনছে।

'তারপর আর খুব বেশি কিছু নেই। পালাতে গিয়ে ফিরদৌস-জয়া ধরা পড়ে গেল। জয়া অবশ্য জানত না ফিরদৌস তার বাবার টাকা চুরি করেছে। ফিরদৌস ও জয়া যে যার বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হল। টাকা চুরির ব্যাপারটা হাবিবুর অনেক মেহনত করে ধামাচাপা দিয়ে দিল। মেহনত করতে হল কারণ টাকাটা তো আর হাবিবুরের নিজের নয়, টাকাটা তার দলের। ফিরদৌসকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। সে সেখানে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করবে। জয়ার যাবার কোনও জায়গা ছিল না। সে বহরমপুরেই রয়ে গেল। এর কিছুদিন পরে একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়। অনেকে বলে ছেলের নৈতিক অধঃপতন হাবিবুরের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সে ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বলল, 'আপনি যখন আমাকে জয়া অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে বলছেন তখন ধরে নিচ্ছি শেষ দিন অব্দি ফিরদৌসের সঙ্গে জয়ার যোগাযোগ ছিল।'

'একেবারে ঠিক জায়গাটা ধরেছ। তুমি ভাল গোয়েন্দা বোঝা যাচ্ছে। আমার গল্পের শেষটা তাহলে বলি। ফিরদৌসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর জয়া আর বিয়ে করেনি। বহরমপুরেই থাকে। একটা ইস্কুলে পড়ায়। ফিরদৌস অবশ্য বিয়ে-টিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরেও সে জয়ার সঙ্গে একটা সম্পর্ক রেখে গেছে। এটা নৈতিক কিনা জানি না, কিন্তু যত বয়েস বাড়ছে তত মনে হয় নৈতিকতার বিচার একজন মানুষ করতে পারে না। একজনের কাছে যেটা অনৈতিক, অন্যজনের কাছে সেটা নৈতিক হতেই পারে। একটা সমাজের কাছে যা নৈতিক, অন্য কোনও সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা হয়তো ঘোর অনৈতিক। যাক সেসব কথা, তোমাকে জয়ার সঙ্গে দেখা করতে বলছি কারণ খুন হবার আগে ফিরদৌস হয়তো জয়াকে কিছু বলেছিল যেটা তোমার কাজে লাগতে পারে।'

'জয়া অধিকারী কত দূরে থাকেন?'

'কুঞ্জঘাটা বাজার বলে একটা জায়গা আছে। এখান থেকে গাড়িতে যেতে অন্তত আধঘন্টা লাগবে, রাস্তায় জ্যাম থাকলে আরও বেশি। কুঞ্জঘাটা বাজার পেরিয়ে আরও খানিকটা গঙ্গার দিকে এগোলে জয়ার বাড়ি। ওখানে ও একাই থাকে। ওর ইস্কুল ছুটি হয় সাড়ে তিনটেতে। এতক্ষণে ও নিশ্চয় বাড়ি চলে এসেছে। ওকে বলা আছে তুমি আসবে। তুমি রওনা হয়ে যাও। আর হ্যাঁ, হলধর বলল তুমি একটা টোটো ভাড়া করেছ। তোমার ড্রাইভারকে ফোন করে ডাক। আমি ওকে ডিরেকশনটা বলে দিচ্ছি।'

'আমি এখানে একাই থাকি। আমার বাবা-মা গত হয়েছেন। এক দাদা আছে, কলকাতায় থাকে। আমার সঙ্গে তার খুব যোগাযোগ নেই। ফিরদৌস আমার ...... বন্ধু ছিল, ... নিকটতম বন্ধু।' জয়া অধিকারী থামল। এরপর কী বলবে ভাবছে। তাকে দেখে মনে হয় তার ওপর দিয়ে সম্প্রতি একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড়ের প্রভাব এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আদিত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জয়া অধিকারীকে দেখছিল। চাপা রঙ, ছোটখাটো শরীর, বড়-বড় মমতা-মাখা চোখ। কেউ সুন্দরী বলবে না। কিন্তু মুখে একটা দুঃখের লাবণ্য আছে। অনেক দুঃখকষ্ট পেরিয়ে এলে যে বিষণ্ণ সৌন্দর্য আপনা থেকে মুখে ফুটে ওঠে, সেই লাবণ্য।

'আপনার সঙ্গে ফিরদৌসের কি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল?'

'ফোনে কথা হত।' জয়া অধিকারী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নিচু করে বলল, 'তাছাড়া মাসে অন্তত একবার ফিরদৌস এখানে আসত।'

'শেষ কবে ফিরদৌস এখানে এসেছিল?' আদিত্য মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'ঘটনাটা ঘটার দু-তিন দিন আগে ফিরদৌস আমার কাছে এসেছিল।' জয়ার গলায় কান্না জমে উঠছে। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আমি তারিখ মনে রাখতে পারি না।'

'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। আপনার ইচ্ছে না হলে উত্তর দেবেন না। আর আমার প্রশ্নটা যদি আপনাকে কোনওভাবে আঘাত করে, আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' আদিত্য সাবধানী গলায় বলল।

জয়া কোনও কথা বলল না। কিছুটা উদগ্রীব হয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে রইল।

'শেষ যেদিন ফিরদৌস এখানে এসেছিল, সে কি রাত্তিরটা এখানেই ছিল?' আদিত্য আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

জয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। বেশ কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে বলল, 'আমার এখানে এলে ফিরদৌস সাধারণত রাত্তিরটা থেকে যেত। সেদিনও রাত্তিরটা থেকে গেছিল।'

আদিত্য ভাবছিল। জয়া অধিকারীর বাড়িটা একটেরে। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। পাশেই গঙ্গা। আদিত্যর ড্রাইভার বলছিল, হাঁটাপথে বড়জোর তিন-চার মিনিট। ঘরে বসে আদিত্য নদীর হাওয়া টের পাচ্ছিল। সম্ভবত ইচ্ছে করেই জয়া অধিকারী লোকালয় থেকে একটু দূরে বাড়ি নিয়েছে। যাতে ফিরদৌসের সঙ্গে তার মেলামেশা নিয়ে আবার একটা স্থানীয় কথা চালাচালি শুরু না হয়।

'ফিরদৌস খুন হবার পর পুলিশ কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?'

'না, এখনও করেনি। হয়তো ফিরদৌসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা তারা জানে না। আমিও আগ বাড়িয়ে কিছু জানাতে চাইনি। তবে পুলিশ যদি আমার কাছে এসে কিছু জানতে চায়, আমি যেটুকু জানি অবশ্যই জানাব। পুলিশের সঙ্গে তো সহযোগিতা করতেই হবে। আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না, না। আমি পুলিশের লোক নই। আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। ফিরদৌসের কেসটা প্রাইভেটলি ইনভেস্টিগেট করছি। ফিরদৌসের পিসি আমাকে নিয়োগ করেছেন। অমল বাগচি আপনাকে বলেননি?'

'বলেছেন। অমলকাকা বললেন বলেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলাম। অমলকাকার কথা ফেলতে পারি না।'

'আচ্ছা, শেষ যেদিন ফিরদৌস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এল, ওর সঙ্গে কী কী লাগেজ ছিল আপনার মনে আছে?'

'লাগেজ!' জয়া অধিকারীকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। 'ঠিক মনে নেই তো। বোধহয় একটাই ব্যাগ ছিল।'

'কী রকম ব্যাগ? কত বড়?'

'ঠিক মনে নেই। ছোট ব্যাগই হবে। আসলে ফিরদৌসের রাত্তিরে পরার জামাকাপড় তো এখানেই দু-তিন প্রস্ত থাকে। সাবান, টুথব্রাশ সবই এখানে আছে। তাই কিছুই আনতে হয় না।'

'একটু কষ্ট করে মনে করুন না, ফিরদৌসের সঙ্গে কী রকম ব্যাগ ছিল। তদন্তের জন্যে এটা জানা আমার খুব দরকার।'

জয়া অধিকারী অনেকক্ষণ ধরে ভাবছে। আদিত্য কিছুক্ষণ জয়ার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর এদিক-ওদিক। টেবিলে চায়ের কাপ, আধ-খাওয়া চা, প্লেটে বিস্কুট। বাঁদিকের দেয়ালে পাশাপাশি তিনটে ছবি টাঙানো রয়েছে। জলরঙ। দেখে বোঝা যায় একই হাতে আঁকা। তিনটেই গঙ্গার ছবি।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। মনে পড়েছে।' জয়া অধিকারী হঠাৎ বলে উঠল। 'ফিরদৌসের একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ আছে। কাঁধে ঝোলানো যায়। ও ওটা নিয়েই এসেছিল। ওটা থেকে একটা পারফিউম বার করে ফিরদৌস আমাকে দিল। কলকাতা থেকে পারফিউমটা আমার জন্যে এনেছিল। তাই আমার মনে আছে। যতদূর মনে পড়ছে, ফিরদৌসের আর কোনও লাগেজ ছিল না।'

'ফিরদৌস কি আপনাকে কিছু রাখতে দিয়ে গিয়েছিল? মানে, শেষ যখন সে এখানে এসেছিল?'

'কই, না তো।' উত্তরটা দেবার আগে জয়া অধিকারী কি একটু চমকে উঠেছিল?

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব সুবিধে হল। আর একটা প্রশ্ন করব। এই বাড়িটা কি ভাড়া বাড়ি? নাকি আপনার নিজের?'

জয়া উত্তর দিতে ইতস্তত করছে। একটু সময় নিয়ে বলল, 'এটা ভাড়াবাড়ি নয়। বাড়িটা আমার নামে। পুরোনো বাড়ি কিনে সারিয়ে নিয়েছি। এটা কেনার সময় আমি কিছু টাকা দিয়েছিলাম। বেশির ভাগটাই কিন্তু ফিরদৌসের টাকা। বিশেষ করে বাড়ি সারানোটা পুরোটাই ওর টাকায় হয়েছিল। ও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটা সারিয়েছিল। না হলে আমি একা পারতাম না।'

'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।' আদিত্য উঠে দাঁড়াল। 'সাবধানে থাকবেন। আপনি একেবারে একা থাকেন তো, তার ওপর এই বাড়িটাও একেবারে আইসোলেটেড।'

'আমাকে আর কে কী করবে? আমার তো কোনও শত্রুও নেই।' জয়া নিস্পৃহ গলায় বলল।

'ধরে নিন, ফিরদৌসের শত্রুরা আপনারও শত্রু। যে কারণে ফিরদৌস খুন হয়েছিল ওই একই কারণে আপনারও বিপদ হতে পারে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। তাই বলছিলাম সাবধানে থাকবেন। সাবধানের মার নেই।'

জয়া চুপ করে রইল। সে আদিত্যকে গাড়ি অব্দি এগিয়ে দিচ্ছিল।

'আপনি বুঝি ছবি আঁকেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি স্কুলের ড্রয়িং দিদিমণি। বড় ক্লাশে আঁকা শেখাই। ছোট ক্লাসের বাচ্চাদের অবশ্য সবই পড়াতে হয়। আমাদের ছোট স্কুল তো। টিচার কম, তাই কাজের চাপটা একটু বেশি।'

'কোনও দরকার হলে আমাকে প্লিজ ফোন করবেন। আপনার নম্বরটা বলুন, আমি একটা মিসড কল দিচ্ছি।' আদিত্য গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল।

পশ্চিম দিকের আকাশে খানিকটা আলো এখনও রয়ে গেছে। আদিত্যর মনে হল জয়া অধিকারী কিছু একটা লুকিয়ে যাচ্ছে।

'চলুন একবার গঙ্গার ধারটা ঘুরে আসব। এত কাছে এসে গঙ্গাটা না দেখলে আফশোস থেকে যাবে।' আদিত্য টোটোতে উঠে ড্রাইভারকে বলল।

২

নূপুর মণ্ডল একটা মেল পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক। মেল-এ লিখেছে, সুমনা ঘোষালের ইন্টারভিউ-এর অডিওটা পাঠালাম। ফাইলটা এত বড় হয়ে গেল যে গুগল ড্রাইভ দিয়ে পাঠাতে হচ্ছে। লিঙ্কটাতে ক্লিক করলেই অডিওটা পেয়ে যাবে। অডিওটা থেকে আমি ট্রান্সক্রিপশান করছি। এখনও কাজটা শেষ হয়নি। দু-এক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। হলেই লেখাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তোমার তাড়াতাড়ি থাকতে পারে বলে অডিওটা আগেই পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের কম্পানি একটা বড় কাজ পেয়েছে। সেই কাজটা নিয়ে আমরা তিনজনেই বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সময় পেলেই ফোন করব।

বহরমপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথে আদিত্য মেলটা মোবাইলে দেখেছিল। কিন্তু ট্রেনে বসে অডিওটা খোলার প্রশ্নই ওঠে না। বিকেলে মেসে ফিরে সে ঠিক করল এখন একটা কিংবা দরকার পড়লে দুটো দিন আপিস না গিয়ে ঘরে বসেই অডিওটা শুনবে।

সন্ধের ঝোঁকে বলরাম চা এনে দিয়েছে। এমন সময় সশরীরে বিমল এসে হাজির।

'আপনার ফোনটা কিছুতেই পাচ্ছিলাম না স্যার। দুপুরে কতবার চেষ্টা করলাম। তাই নিজেই চলে এসেছি।' বিমল জানাল।

'ট্রেনে ছিলাম। তাই ফোনে পাওনি। মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চললে সিগনাল পাওয়া যায় না।'

'কোথায় গেছিলেন স্যার? আপনি তো সচরাচর কলকাতা ছেড়ে বেরুতে চান না।'

'বহরমপুর গেছিলাম। কাল ভোরে গেলাম। আজ বিকেলে ফিরলাম। কচুরি খাবে? তুমি খেলে আমিও দুটো খেতে পারি।'

খাওয়ার ব্যাপারে বিমল মুখ ফুটে হ্যাঁ বলতে এখনও লজ্জা পায়। তবে খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে চুপ করে থাকে। না বলে না।

আদিত্য বারান্দায় গিয়ে হাঁক পেড়ে ডাকল, 'বলরাম, এই বলরাম।'

আধঘণ্টা পরে, যখন কচুরি-জিলিপি খাওয়া হয়ে গেছে, বলরাম আর এক প্রস্ত চা ঢেলে দিয়ে চলে গেছে, তখন ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'তারপর বল বিমলবাবু, কী খবর আনলে?'

'খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি স্যার। যেটুকু জানতে পেরেছি, মনে হয়, সবই আপনার আগে থেকে জানা। তাও বলছি।'

'তুমি যেটুকু জানতে পেরেছ আমাকে বল। আমি তার থেকে আমার যেটা দরকার বেছে নেব।'

'বুটলেগার ক্লাবের সামনে তিন দিন চা-কফি বিক্রি করে মোটের ওপর কিছু জিনিস জানতে পেরেছি। আরও কয়েকটা দিন ওখানে থাকতে পারলে হয়তো আরও কিছু জানতে পারতাম। কিন্তু চতুর্থ দিন লোকাল মস্তানরা এসে আমাকে তুলে দিল। বলল, এখানে ব্যবসা করতে গেলে ওদের টাকা দিতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা। ওরা বলল, দশ হাজার। আমি বললাম অত টাকা আমি কোথায় পাব? ওরা বলল, তা হলে এখানে চা বিক্রি করার কথা ভুলে যা। আমি বললাম, হাজার পাঁচেকে হয় না? ওদের মধ্যে যেটা সর্দার গোছের সে আমার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলল, আমরা দরাদরি করি না। আজ এখান থেকে ফোট। কাল যদি দশ হাজার জোগাড় করতে পারিস তাহলে আসবি। না হলে আসার দরকার নেই। আমি আর ও ধার মাড়াইনি।'

'যাচ্চলে। বেমক্কা থাপ্পড় খেয়ে গেলে?'

'কিছুই বৃথা যায় না স্যার। থাপ্পড় খাওয়াটাও বৃথা যায়নি। কেন যায়নি পরে বলছি। তার আগে প্রথম থেকে বলি কী কী জানতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটাই বল।'

'ড্রাইভার আর সিকিউরিটিদের থেকে জানতে পারলাম ওই বুটলেগার নাইট ক্লাবের ব্যাবসা এখন ভাল যাচ্ছে না। ওখানে একজন ম্যানেজার ম্যাডাম ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে পলি ম্যাডাম বলেও ডাকত। কিছুদিন আগে ওই পলি ম্যাডাম তাঁর রাজারহাটের ফ্ল্যাটে খুন হন। ডাকাতরা তাঁকে মেরে টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। পলি ম্যাডাম ক্লাবটা খুব ভাল ম্যানেজ করতেন। উনি মারা যাবার পর ক্লাবটায় অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাস্টমাররা বিরক্ত হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।'

'তা ওই ম্যাডামের জায়গায় অন্য কাউকে নেওয়া হয়নি?'

'বোধহয় এখনও হয়নি। কেন হয়নি বলতে পারব না। তবে সবাই বলল, ক্লাবের মালিক পিটার অরোরার সঙ্গে ওই ম্যানেজার ম্যাডামের জোরদার ইস্ক চলছিল। রাজারহাটের ফ্ল্যাটটা মালিকই ম্যাডামকে ভাড়া করে দিয়েছিল। সেখানে মালিক ম্যাডামের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই রাত কাটাত।'

'আর কিছু জানতে পারলে?'

'হ্যাঁ স্যার। বলছি। আমাকে ওই থাপ্পড়টা মেরে তো মস্তানগুলো বাইক চেপে চলে গেল। আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালে হাত বুলোচ্ছি এমন সময় একটা সিকিউরিটি আমাকে বলল, এই মস্তানগুলো না খেতে পাওয়া কুত্তার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। না হলে তোমার গায়ে হাত তুলত না। তোমার কাছে টাকাও চাইত না। আমি বললাম, কেন? না খেতে পাওয়া কেন? সিকিউরিটি ছেলেটা ফিসফিস করে বলল, আগে এই নাইট ক্লাবের পেছনের দিকের একটা হলঘরে জুয়া খেলা হত। এই মস্তানগুলো সেই জুয়ার আড্ডাটা সামলাত। কেউ ঝামেলা করলে তাদের দু-চার ঘা দিয়ে বার করে দিত। কিন্তু কিছুদিন হল জুয়ার আড্ডাটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই মালিক মস্তানগুলোকেও বরখাস্ত করে দিয়েছে। আমি বললাম, জুয়ার আড্ডা বন্ধ হয়ে গেল কেন? সিকিউরিটি ছেলেটা বলল, সে আমি বলতে পারব না।'

আরও দু-চার কথার পর বিমল বিদায় নিল। ঘড়িতে সোয়া সাতটা বেজে গেছে। আদিত্য নূপুরের পাঠানো অডিওটা তার ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নিল।

আমার ছোটবেলা কেটেছিল উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর মোড় থেকে বিডন স্ট্রিট ধরে চিৎপুরের দিকে হাঁটলে মিনার্ভা থিয়েটার আর রবীন্দ্র কাননের মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা দোতলা বাড়িতে আমরা থাকতাম। বাড়িটা মিনার্ভা থিয়েটারের ফুটপাতে। আমার মা সুনয়না দেবী মিনার্ভায় নিয়মিত অভিনয় করতেন। আমার বড় হওয়া নাটকের পরিবেশে। শিশু শিল্পী হিসেবে, আট বছর বয়েসে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলিবাবা নাটকে স্টেজে প্রথম অভিনয় করি।

কেউ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বলরাম। আদিত্য অডিওটায় পজ দিয়ে বলরামের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'ম্যানেজারবাবু পাঠাল। বলল, তোমার নাকি এ-মাসের মেস ভাড়া বাকি আছে। আমার হাতে দিয়ে দিতে বলল।'

'ঠিক আছে। দিয়ে দিচ্ছি। একটু দাঁড়া।'

ভাগ্যিস আজই মেসে ঢোকার আগে এটিএম থেকে টাকা তুলেছিল আদিত্য। হোয়াট নট খুলে টাকা বার করে বলরামের হাতে দিয়ে বলল, 'আমাকে আজ একটু তড়কা-রুটি এনে দিবি? আজ আর মেসের রান্না খেতে ইচ্ছে করছে না। আজ তো নিরামিষের দিন।'

'আজ তড়কা-রুটি খেলে ঠকবে। ভানু ঠাকুর আজ ধোঁকার ডালনা বানিয়েছে। যা গন্ধ ছাড়ছিল না!' বলরাম দাঁত বার করে হাসল।

'হঠাৎ ধোঁকার ডালনা কেন? আগে তো কখনও করেনি।'

'তুমি তো মেসের কোনও খবরই রাখ না। আজ দুপুরে ম্যানেজারবাবুর ছেলে এয়েচে না? তাই পেশাল খাওয়া।'

'তাহলে তো এখন ক-টা দিন ভালমন্দ খাওয়া যাবে।'

'সে গুড়ে বালি। ছেলে কী একটা চাকরির পরীক্ষা দিতে এয়েচে। কাল দুপুরে পরীক্ষা দিয়েই দেশে ফিরে যাবে।'

'যাগগে। ধোঁকার ডালনাই সই। থাক, আজ আর তড়কা রুটি আনতে হবে না।'

বলরাম চলে যেতে আদিত্য সুমনা ঘোষালের অডিও ইন্টারভিউটা আবার চালিয়ে দিল। সুমনা ঘোষাল তার ছেলেবেলার কথা বলছে, মায়ের কথা বলছে, তাদের স্ট্রাগল-এর কথা বলছে। শুনতে শুনতে আদিত্যর মনে হচ্ছিল নূপুর বেশ প্রফেশানালি ইন্টারভিউটা নিয়েছে। আদিত্য উঠে গিয়ে কেটলিতে চায়ের জল গরম করতে দিল। সিগারেট ধরাল। সুমনা ঘোষাল সিনেমায় তার প্রথম অভিনয়ের কথা বলছে। এটাও শিশু শিল্পী হিসেবে। নূপুর খুব কায়দা করে সুমনা ঘোষালকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করল। সুমনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে আরম্ভ করেছে। আদিত্য কান খাড়া করে শুনছে।

বাবাকে আমার ভালই মনে আছে। আমার বাবার নাম অজয় ঘোষাল। নাটকের ডিরেক্টর। কালীঘাটের মন্দিরে বাবার সঙ্গে মার বিয়ে হয়েছিল। আমার খুব ছোটবেলায় বাবা আমাদের সঙ্গে ওই বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে থাকত। সেই সময়টা আমার খুব ভাল কেটেছিল। পরে জানতে পারলাম বাবার আর একটা পরিবার আছে। তারা বালিগঞ্জে থাকে। একদিন বাবা আমাদের ছেড়ে পাকাপাকিভাবে বালিগঞ্জে চলে গেল। আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। খুব খারাপ লেগেছিল। রাতদিন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতাম। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যেত। টের পেতাম আমাদের সংসারে টাকা পয়সার টান দেখা দিয়েছে। চলে যাবার পর প্রথম প্রথম বাবা প্রত্যেক সপ্তাহে আসত। তারপর আসা কমিয়ে দিল। টাকা রোজগারের জন্যে মা যাত্রায় অভিনয় শুরু করল। এর জন্যে মাকে দূরে দূরে অভিনয় করতে যেতে হত। বাড়ি ফিরতে রাত্তির হত। অনেক রাত্তিরে ফিরতেই পারত না। আমাকে বাড়িতে একা থাকতে হত। টাকা বাঁচানোর জন্যে মা রাতদিনের লোকটাকেও ছাড়িয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমি সিনেমায় আরও কাজ পেতে শুরু করেছি। শিশু থেকে কিশোরীর ভূমিকায়, কিশোরী থেকে তরুণী। ক্লাস এইটের পরে আর পড়াশোনা হল না। বিডন স্ট্রিট থেকে টালিগঞ্জে যাতায়াত করতে অসুবিধে হচ্ছিল। মা আর আমি মিলে টালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাট কিনলাম। ফ্ল্যাটটা খুব পয়া। হাসবেন না। ফিল্ম লাইনে আমরা অনেকেই পয়া-অপয়ায় খুব বিশ্বাস করি। সে যাই হোক, টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে উঠে যাবার কিছুদিন পরেই আমি পরপর কয়েকটা অফার পেলাম, তার মধ্যে একটা লিড রোলে। আরও কিছুদিনের মধ্যে আমার খানিকটা নাম হল। মা বলল, টালিগঞ্জের এই এঁদো ফ্ল্যাটটা আমার স্টেটাসের সঙ্গে বেমানান। আমি কিন্তু ওই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার পেড়াপেড়িতে নিউ আলিপুরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে যেতেই হল।

ফোন বাজছে। কেয়া। আদিত্য অডিওটা আবার পজে দিয়ে ফোনটা ধরল।

'সেই কখন ফোন করে বললে ট্রেনে উঠছ, তারপর আর সাড়াশব্দ নেই। কখন ফিরলে?' কেয়ার গলায় ঈষৎ উৎকণ্ঠা।

'বিকেলে ফিরেছি। ভাবলাম তোমাকে ফোন করি, তারপর মনে হলো তুমি নিশ্চয় ক্লাস নিচ্ছ। তাই আর তোমাকে বিরক্ত করলাম না। রাত্তিরের দিকে ফোন করতাম।'

'কেমন লাগল আমার জেঠুকে?' কেয়ার গলায় আর উৎকণ্ঠা নেই।

'চমৎকার মানুষ। আমাকে তো জামাই আদর করলেন।' কথাটা বলেই আদিত্য ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'মানে, বলতে চাইছি, উনি খুবই আদর-যত্ন করেছেন। সব থেকে বড় কথা, ওঁর ব্যবহারটা ভীষণ আন্তরিক। কাল দুপুরে খাবার পর ওখানেই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

'আমি জেঠুকে বলব জামাই খুশি হয়েছে।' কেয়া মজা করার গলায় বলল। আসলে সে নিজেই খুব খুশি হয়েছে। 'তোমার কাজ কিছু এগোল?'

'চমৎকার কাজ এগিয়েছে। তবে মন বলছে আর একবার বহরমপুরে যেতে হবে।'

'অবশ্যই আবার যেও। গেলে জেঠুর বাড়িতে নিশ্চয় যাবে। জেঠু খুব খুশি হবে।'

'তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কবে দেখা হবে?' আদিত্য খুব মৃদু গলায় বলল। কথাগুলো যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদিত্যর ভেতর থেকে উঠে এসেছে।

'কাল। বিকেল পাঁচটায় তোমাকে পাতিরামের স্টলের সামনে থেকে তুলে নেব। আজ মন দিয়ে কাজ কর। কেমন?' যেন এই সিদ্ধান্তের ওপর আর কোনও কথা হতে পারে না এমন ভঙ্গীতে কথাগুলো বলে কেয়া ফোনটা কেটে দিল।

আদিত্য ফোন রেখে আবার অডিওটা চালিয়ে দিল। কেয়ার সঙ্গে কথা বলার পর মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। সুমনা ঘোষাল তার কেরিয়ার নিয়ে কথা বলছে। কোন কোন ছবিতে অভিনয় করেছিল। কোনগুলো দর্শক নিয়েছিল, কোনগুলো নেয়নি। লম্বা ইন্টারভিউ। চলছে তো চলছেই। আদিত্য অর্ধেক শুনছে, অর্ধেক শুনছে না। আবার সিগারেট ধরাল। সুমনা তার মুম্বাই প্রবাসের কথা বলছে। তিন বছর সে সেখানে থেকে সিরিয়ালে কাজ করেছিল। আদিত্য এসব তথ্য জানে। ইন্টারভিউটা বেশ একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ, সম্ভবত একঘেঁয়েমিটা কাটানোর জন্যেই, নূপুর মণ্ডল জিজ্ঞেস করল, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কথা কিছু বলুন। আপনার তো একটি ছেলে আছে, তার কথা একটু বলবেন?

সুমনা : আমার ছেলেকে কেন টেনে আনছেন? তাকে এই ইন্টারভিউ থেকে বাদ দিন।

নূপুর : আপনি যদি বলেন অবশ্যই বাদ দেব। তবে কিনা আপনার জীবনের এই দিকটা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা তীব্র কৌতূহল আছে। আমি খোলাখুলি বলছি, আপনার ছেলের পিতৃ-পরিচয় নিয়ে মিডিয়াতে নানারকম গল্প বেরিয়েছে। যেমন অনেকে লিখেছেন, প্রোডিউসার রোহিত ধামানি আপনার ছেলের বাবা। আবার অনেকে লিখেছেন, আশিসকুমার বলে যে নায়কের বিপরীতে প্রথম কয়েকটা ছবিতে আপনি অভিনয় করেছিলেন, তিনিই আপনার সন্তানের পিতা। কিছু মনে করবেন না, কেউ কেউ আবার অত্যন্ত আপত্তিজনক ইঙ্গিত দিয়েছে। বলেছে, আপনি নিজেই নাকি নিশ্চিত নন কে আপনার ছেলের বাবা। এগুলো সবই হয়তো বানানো গল্প। কিন্তু এই বানানো গল্পগুলো অকারণে আপনার চরিত্রহনন করেছে। আপনি নিজেই যদি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেন, তাহলে আপনারই তো লাভ।

সুমনা : (উত্তেজিত গলায়) আমার লাভ-লোকসান দেখার ভার তো আপনাকে আমি দিইনি। ভাল করে শুনে রাখুন। আপনি যদি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো বাদ দিতে পারেন তা হলেই আমি আপনাকে ইন্টারভিউ দেব। না হলে নয়। এটা কি পরিষ্কার হল? আর আপনি ঠিক সেইটুকুই ছাপবেন যেটুকু আমি বলব। আপনি আগে আমাকে এই ইন্টারভিউ-এর একটা লিখিত কপি দেখিয়ে নেবেন। দেখে আমি তলায় সই করে দেব। আমি অনুমতি দিলে তবেই ছাপবেন। কোনও রকম চালাকি করবেন না। আপনাদের আমি ভালরকম চিনি।

নূপুর : (আত্মসমর্পণের গলায়) ম্যাডাম, আপনি যেমন বলবেন, আমি ঠিক তেমনভাবে আপনার ইন্টারভিউটা নেব। আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো বাদ দিতে চান আমি অবশ্যই বাদ দিয়ে দেব। আপনি প্লিজ আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি আসলে খুব বেশিদিন সাংবাদিকতা করছি না। বলতে গেলে এই ইন্টারভিউটাই আমার প্রথম বড় অ্যাসাইনমেন্ট। আমি যদি অভিজ্ঞতার অভাবে আপনাকে কোনওভাবে ভুল কিছু বলে থাকি আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিন। আমি তো আপনার থেকে কত ছোট। (নূপুরের গলাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছে)

অডিওটা চলছে, কিন্তু নূপুরের কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সাবাস, নূপুর, সাবাস। আদিত্য মনে মনে তারিফ না করে পারল না। কিন্তু ইন্টারভিউটা এখানেই শেষ হয়ে গেল নাকি? না, না, শেষ হয়নি। ওই আবার সুমনার গলা শোনা যাচ্ছে।

সুমনা : (ঈষৎ অপ্রস্তুত গলায়) ঠিক আছে, ঠিক আছে। কান্নাকাটি করার কিছু নেই। আসলে কথাটা কী জান? আমার ছেলের যিনি বাবা তাঁর সঙ্গে আমার এখনও ভালই যোগাযোগ আছে। কিন্তু তিনি নিজে থেকে যতদিন না আমার ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন, আমি নিজে থেকে তাঁর ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করব না। এটা আমার একটা অভিমানের জায়গা। বলতে পার, একটা চরম অপমানের জায়গাও বটে। তাই এটা নিয়ে কোনও পাবলিক স্টেটমেন্ট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে কথাগুলো তোমাকে বললাম এটা যেন কিছুতেই ছাপা না হয়।

আদিত্য ঘড়ি দেখল। ন-টা বাজে। বেশি দেরি করলে ধোঁকার ডালনা ফুরিয়ে যাবে। অডিওটা বন্ধ করে আদিত্য উঠে দাঁড়াল। বাকিটা পরে শুনলেও হবে।

৩

সাবিনা অঝোরে কাঁদছে। তার পিসি-শাশুড়ি নুসরত তাকে সামলাতে পারছে না। আদিত্য বোকা-বোকা মুখ করে বসে আছে। এই সব অবস্থায় সে বুঝে উঠতে পারে না কী করবে।

এটা একটা হোটেলের ঘর। হোটেলটা পার্ক সার্কাস কানেক্টারের দোরগোড়ায়, চার নম্বর ব্রিজের নিচে। নতুন হোটেল, ঘরগুলোও বেশ বড়। আদিত্য একটা সোফায় বসেছে, সাবিনা রাইটিং টেবিলের সংলগ্ন চেয়ারে, নুসরত বসেছেন আর একটু দূরে, একটা চামড়া দিয়ে মোড়া আরাম কেদারায়। সোনালি বেডকভার ঢাকা দেওয়া দুটি সিঙ্গল খাট, সোফা এবং আরাম কেদারার মাঝখানে আড়াল তৈরি করেছে। চেয়ার-টেবিলটা সোফার দিকে।

নুসরত কথা বলছিলেন। 'সাবিনাকে নিয়ে এক্ষুনি কলকাতায় আসার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কিছু টাকা পয়সার ক্লেম আছে যেগুলোর জন্যে সাবিনার সই দরকার। এল আই সি, কিছু কম্পানির স্টক, ফিক্সড ডিপোজিট। কাজগুলো হয়তো হালিশহরে বসেও করা যেত। তবে আমাদের এজেন্ট বলল, সাবিনা কলকাতায় এসে দু-একদিন থাকলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তাই সাবিনাকে নিয়ে চলে এলাম।'

'ভাল করেছেন। আমিও এই সুযোগে সাবিনা ম্যাডামকে দু-একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে নিতে পারব।'

'আমি একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছি। যে হোটেলটায় এখন আমরা রয়েছি সেটাতে কিছুদিন আগে সাবিনাকে নিয়ে ফিরদৌস কয়েকদিন কাটিয়েছিল। আমি তো সেটা জানতাম না। জানলে কিছুতেই এই হোটেলে উঠতাম না। এখানে আসার পর থেকে সাবিনা একেবারে হিস্টিরিক হয়ে গেছে। ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে। যত বলছি, চল অন্য কোনও হোটেলে চলে যাই, তাও কিছুতেই যাবে না। বলছে, এখানে ফিরদৌসের স্মৃতি রয়েছে। কী যে মুশকিলে পড়েছি।' নুসরতকে খানিকটা বিপন্ন দেখাল।

কলিং বেল বাজছে। আদিত্য উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল রুম সার্ভিসের ছেলেটা চা নিয়ে এসেছে। টি-কোজি ঢাকা টি-পটে চা। শুধু আদিত্যর জন্যে। মহিলারা কেউ চা খাবেন না।

'আমি ঢেলে দিচ্ছি।' নুসরত তাঁর চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করলেন।

'না, না। আমি ঢেলে নেব। আপনাকে উঠতে হবে না।' আদিত্য সন্ত্রস্ত হয়ে বলল। বলে সে নিজেই চা ঢালতে শুরু করল। ঢালতে ঢালতে তার মনে হল চা-টা আর একটু ভিজলে ভাল হত।

'সাবিনা ম্যাডাম, আমি আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। জাস্ট দু-তিনটে প্রশ্ন করব। কত তাড়াতাড়ি আমি আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারব সেটা অনেকটাই আপনার উত্তরের ওপর নির্ভর করবে।' আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল।

সাবিনা উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে রইল। তার চোখ দিয়ে এখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আদিত্যর মনে হল, যে সাবিনাকে সে দেখেছিল তার তুলনায় এই সাবিনা অর্ধেক হয়ে গেছে। চোখ দুটো বসে গেছে, গাল

দুটো ভাঙা, উসকো খুসকো চুল। সেই পুরোনো সাবিনাকে চেনাই যায় না। আদিত্য ভাবছিল, সাবিনার মতো সব মেয়ে স্বামীদের সঙ্গে এতটা জড়িয়ে থাকে না। চকিতে তার জয়া অধিকারীর বেদনাক্লিষ্ট মুখটা মনে পড়ে গেল। ফিরদৌস রহমান, সন্দেহ নেই, তার প্রেয়সীদের আকর্ষণ করতে পারত।

'আপনি ওকে প্রশ্ন করুন। ও উত্তর দেবে।' নুসরত বললেন।

'ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে যখন প্রথম কথা হয়েছিল, আপনি বলেছিলেন ফিরদৌস কোথায় আছে আপনি জানেন না। ফিরদৌসের কল লিস্ট থেকে এখন বোঝা যাচ্ছে সে যখন হোটেল সিতারায় লুকিয়ে ছিল তখন তার সঙ্গে আপনার নিয়মিত কথা হত। ফিরদৌস কি তখন আপনাকে বলেছিল কেন সে লুকিয়ে রয়েছে?'

সাবিনা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর প্রায় শোনা যায় না এমন একটা গলায় বলল, 'ফিরদৌসের সঙ্গে আমার কথা হত এটা সত্যি। কিন্তু ফিরদৌস তখন কোথায় থাকত সেটা সে আমাকে কখনও বলেনি। আমি বহুবার জিজ্ঞেস করেছি। ফিরদৌস বলেছে, আমার এবং তোমার সেফটির জন্যেই তোমার জানার দরকার নেই আমি কোথায় আছি। ফুফাজি ভাবছেন আমি টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছি। তাই তিনি আমাকে খুঁজছেন। খুঁজে পেলে কী করবেন আমি জানি না। হয়তো জানেই মেরে দেবেন। তুমি যদি জান আমি কোথায় লুকিয়ে আছি তা হলে চাপের মুখে তুমিই হয়তো সেটা ফুফাজিকে বলে দেবে। তার থেকে তোমার না জানাই ভাল আমি কোথায় আছি।'

'টাকাটা আসলে কে নিয়েছে সে-বিষয়ে ফিরদৌস কী বলত?'

'ফিরদৌস খুব জোর দিয়ে বলত টাকাটা বটুকবাবু চুরি করেছে। সে এই বিষয়ে প্রমাণ জোগাড় করছিল। চলে যাবার আগের দিনও তার সঙ্গে আমার কথা হয়। সে সেদিন বলেছিল সে যে নির্দোষ তার প্রমাণ সে প্রায় জোগাড় করে ফেলেছে।'

'ফিরদৌসের সঙ্গে আর কী কী বিষয় নিয়ে আপনার কথা হত?

'সাধারণ সাংসারিক কথা। মেয়েরা কেমন আছে? ফুফি কেমন আছে? আমি কেমন আছি? এইসব জিজ্ঞেস করত। বলত, একটু ধৈর্য ধর। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। কিছুই ঠিক হল না। আমার সব শেষ হয়ে গেল।' বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল সাবিনা খাতুন।

কথা বলার মতো অবস্থায় ফিরে আসতে সাবিনার খানিকটা সময় লেগে গেল। আদিত্য শান্তভাবে অপেক্ষা করছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে বলল, 'আপনাকে আর আমি বিরক্ত করব না। আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে শুধু একটা শেষ প্রশ্ন। এমন কি কিছু আছে যেটা আপনার মনে হচ্ছে আমাকে বলা দরকার? যেটা নিয়ে ফিরদৌসের সঙ্গে আপনার সেই সময় কথা হয়েছিল, যেটা হয়তো খুবই সামান্য কিছু, কিন্তু স্বাভাবিকের বাইরে? আমি কি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি?'

সাবিনা মুখ তুলে তাকাল। বলল, আপনি ঠিক কি জানতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। মিয়া-বিবির মধ্যে রোজ যেমন কথা হয় সেরকম কথাই তো হত। তবে একেবারে প্রথম দিকে একবার ফিরদৌস আমার কাছে একজনের ফোন নম্বর জানতে চেয়েছিল।'

'কার ফোন নম্বর?'

'জয়দেব বলে একটা ছেলের। সে কম্পিউটার সারাই করে। কলকাতায় থাকে। মনে হয়, ফিরদৌসের ল্যাপটপটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'ফিরদৌসের কাছে জয়দেবের ফোন নম্বরটা ছিল না?'

'দুটো নতুন মোবাইলের কোনওটাতেই ছিল না। হয়তো পুরোনো মোবাইলটাতে ছিল, কিন্তু সেই মোবাইলটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। খোলাই যায় না।'

'তারপর?'

'নম্বরটা শেষ পর্যন্ত আমার একটা পুরোনো অ্যাডড্রেস বইতে পাওয়া গেল। আমি অ্যাডড্রেস বই থেকে ফিরদৌসকে ফোন নম্বরটা জানিয়ে দিলাম।'

'যদি খুব অসুবিধে না হয়, আমাকে জয়দেবের ফোন নম্বরটা জানাতে পারবেন?'

'না, না। অসুবিধের কী আছে। অ্যাডড্রেস বইটা তো আমার ব্যাগেই আছে। আমি এক্ষুনি দেখে বলে দিচ্ছি।'

সাবিনা তার ব্যাগের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কোথায় গেল ব্যাগটা? সাবিনা উঠে গিয়ে ক্লজেটের পাল্লাটা সরাল। সাবিনার ব্যাগটা ওখানে আর একটা বড় নীল ব্যাগের ওপর রাখা রয়েছে। আদিত্য বড় নীল ব্যাগটার দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে।

'ওই বড় নীল ব্যাগটা কি ফিরদৌসের?' আদিত্য খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

'কোন ব্যাগটা? ওই নীল ব্যাগটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা ফিরদৌসের। লাস্ট ক্রিসমাসে ওটা ফিরদৌস কুমুদিনী থেকে গিফট পেয়েছিল।' সাবিনা স্বাভাবিক গলায় বলল। তারপর একটু থেমে বলল, 'জয়দেবের ফোন নম্বরটা পেয়েছি। আপনি সেভ করে নিন।'

সাবিনাদের সঙ্গে কথা বলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে আদিত্য খানিকক্ষণ ভাবল কোনদিকে যাবে। আসার সময় এসপ্ল্যানেডে ব্রেক জার্নি করে এসেছিল। তখন তাড়া ছিল বলে সামনে যা পেয়েছে উঠে পড়েছে। এখন আর ভিড় বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ট্র্যামে উঠলে কেমন হয়? আজকাল ট্র্যামের রুটগুলো অনেক বদলে গেছে। নতুন রুটগুলোর খবর আদিত্য রাখে না। আগে একটা কুড়ি নম্বর ট্র্যাম ছিল, চার নম্বর ব্রিজ থেকে একটু এগিয়ে আমির আলি এভিনিউ থেকে ধরা যেত। সেই ট্র্যামটা শেয়ালদা ফ্লাইওভারের ওপর থেকে বাঁদিকে বেঁকে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে হাওড়ার দিকে চলে যেত। সেটা পেলে আদিত্যর খুব সুবিধে হয়। আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে নামলে সেখান থেকে আদিত্যর মেস দু-মিনিটের হাঁটা পথ। কুড়ি নম্বর ট্র্যামের জন্য চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আদিত্য হাঁটতে হাঁটতে পার্ক সার্কাস ট্র্যাম ডিপোর সামনে দিয়ে আমির আলি এভিনিউতে এসে পড়ল।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর একটা ট্র্যাম এল বটে কিন্তু সেটার নম্বর ২৬/১৭। এরকম নম্বরের ট্র্যাম আদিত্য আগে দেখেনি। কন্ডাকটারকে জিজ্ঞেস করে জানল ট্র্যামটা শেয়ালদা ফ্লাইওভার দিয়ে সোজা মানিকতলার দিকে চলে যাবে। মানিকতলার মোড় থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে কাঁকুড়গাছি পেরিয়ে বিধাননগর তার অন্তিম গন্তব্য। ট্র্যামটা বেশ ফাঁকা। আদিত্য লাফ দিয়ে ট্র্যামে উঠে পড়ল।

জানলার ধারে সিট। অলস চোখে কলকাতা দর্শনের এমন সুযোগ আর হয় না। মল্লিকবাজার, এলিয়ট রোডের মোড়, নোনাপুকুর ডিপো পেরিয়ে গেল ট্র্যাম। এন্টালির বাজার আসবে আসবে। অনেক দিন এসব চত্বরে ঘোরা হয়নি। আদিত্য উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তা দেখছিল। অবশ্য ওপর ওপর অলস চোখে রাস্তা দেখলেও আসলে কিন্তু আদিত্য গভীরভাবে চিন্তা করছিল। কুমুদিনীর রহস্যটা একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। তবে এখনও দু-একটা অস্বচ্ছ জায়গা রয়েছে। সেগুলো ঘষে মেজে স্বচ্ছ করতে হবে।

এন্টালি মার্কেট পেরোনোর আগেই একটা ফোন এল। সোমেন মুখুটি।

'কেমন আছেন? আপনার তদন্ত কেমন চলছে?' আদিত্য ফোন তুলে জিজ্ঞেস করল।

'ভাল আছি স্যার। তদন্তে খানিকটা এগিয়েছি, আবার কিছু কাজ বাকিও আছে। আপনাকে জানাব বলে ফোন করলাম। দু-মিনিট সময় হবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন। ট্র্যামে বসে আছি। ট্র্যামটা এখনও চলছে তবে একটু পরেই মনে হয় মৌলালির ট্র্যাফিক লাইটে আটকে যাবে। অতএব হাতে অনেক সময়। আপনি বলুন।'

'কয়েকটা জিনিস বুঝতে পেরেছি। এটা এখন পরিষ্কার যে কুড়ি লক্ষ ডলার শিবেন মাইতি বলে কুমুদিনীর এজেন্ট আত্মসাৎ করেছে। ফিরদৌস, গোবিন্দ আর শিবেন এই তিনজন এজেন্ট মিলে টাকাটা সরিয়েছিল।

শিবেন অন্য দু-জনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিজেই পুরো টাকাটা গাপ করেছে। খুন দুটো অবশ্য শিবেন নিজের হাতে করেনি, কোনও সুপারি কিলারকে দিয়ে করিয়েছে। আমি কুড়ি লক্ষ ডলারের ট্রেলটা মোটামুটি ধরতে পেরেছি। শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটে একটা দোকান আছে যারা হাওয়ালা বাজারে ডলার কেনাবেচা করে। আমি জানতে পেরেছি তাদের হাত দিয়েই ডলারটা বিক্রি হয়েছে। আমি দোকানের মালিককে এখনও অ্যারেস্ট করিনি কারণ ওকে ধরলে শিবেন সাবধান হয়ে যাবে। আসল কথা হল, শিবেনকে এখনও ধরতে পারিনি। সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

ট্র্যামটা সত্যিই মোলালির ট্র্যাফিক লাইটে আটকে গেছে।

'আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন। কোনও প্রশংসাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়।' আদিত্য উচ্ছ্বসিত গলায় বলল। 'আপনি কলকাতায় কবে আসছেন?'

'আমি আর দিন দুয়েক পরে কলকাতায় ফিরছি। তার মধ্যে যদি শিবেন মাইতিকে ধরে ফেলতে পারি তো ভাল। না হলে আবার নর্থ বেঙ্গলে আসতে হবে।'

'আমার সমস্ত শুভেচ্ছা আপনার সঙ্গে রইল। খুনি ধরা পড়ে গেলে আমার মাথার ওপর থেকেও একটা বিরাট বোঝা নেমে যাবে। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করি আপনি খুব তাড়াতাড়ি সফল হয়ে ফিরে আসুন।' আদিত্য যথাসম্ভব আন্তরিকভাবে বলল।

আরও আধঘণ্টা পরে আদিত্য যখন ট্র্যাম থেকে নেমে মেসের দিকে হাঁটছে তখন আবার একটা ফোন। এবার নূপুর মণ্ডল।

'আদিত্যদা, ইন্টারভিউটা লিখে, সুমনা ঘোষালকে দিয়ে সই করিয়ে, তোমাকে একটা স্ক্যান কপি মেল করে দিয়েছি। অরিজিনালটা আমার কাছে আছে। তুমি চাইলে পাঠিয়ে দেব। সুমনা ঘোষাল যেগুলো বাদ দিতে বলেছিল সেগুলো কিন্তু এই লেখাটাতে নেই।'

'ইন্টারভিউটা ভীষণ ভাল নিয়েছ। বোঝাই যাচ্ছে না এটা তোমার নেওয়া প্রথম ইন্টারভিউ। আমি কিন্তু এটা ছাপাবার ব্যবস্থা করছি।'

'কোথায় ছাপাবে?'

'সেটা তোমায় ভাবতে হবে না। আমার অনেক সাংবাদিক বন্ধু আছে। তাদের কাউকে বলব।'

'ইন্টারভিউটা সত্যি সত্যি ছাপা হলে আমাকে একটু জানিও। আমি সুমনা ঘোষালকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। খুব খুশি হবে। কদিন ইন্টারভিউ নিয়ে ভদ্রমহিলার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে।'

'তোমার কম্পানি কেমন চলছে?'

'ভাল চলছে, আদিত্যদা। কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ছে।'

'তাহলে আর তোমাকে আমার কাজ করতে বলে বিব্রত করব না। তুমি ভাল করে তোমার নিজের কাজটা কর। ভাল থেক।'

আদিত্য মোবাইলটা বন্ধ করে দেখল সে তার মেসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

৪

'চাকি বলছি স্যার। দু-মিনিট কথা বলা যাবে?'

'নিশ্চয়, বলুন।'

'আমি ওই কম্পিউটারগুলো দেখছিলাম, ওই যেগুলো কুমুদিনী থেকে সিজ করে আনা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝেছি। তা কিছু পেলেন?'

'ওপর ওপর কুমুদিনীর ব্যবসা হল শেয়ার বাজারের দালালি। পাঁচটা কম্পিউটারে শেয়ার কেনাবেচার তথ্য রয়েছে। পার্টিদের নামও রয়েছে, মানে যাদের হয়ে কুমুদিনী শেয়ার কেনাবেচা করেছে। আমি সেই

কেনাবেচাগুলো স্টাডি করছিলাম।'

'বেশ। তারপর?'

'দেখলাম মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বলে একটা কম্পানির হয়ে কুমুদিনী প্রচুর শেয়ার কেনাবেচা করেছে। অন্য পার্টিদের হয়ে ট্র্যাঞ্জ্যাকশনগুলো যেখানে হাজার বা দু-একটা ক্ষেত্রে বড় জোর লাখের অঙ্কে, সেখানে মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট-এর কেনাবেচাগুলো সব সময় কোটির অঙ্কে। নাম্বার অফ ট্র্যাঞ্জ্যাকশনও অনেক বেশি। ব্যাপারটা সন্দেহজনক লাগছে। তাই ভাবছি আজ দুপুরে মহাদেব কম্পানিতে একবার ইনভেস্টিগেশনে যাব। আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে ইন্টারেস্টেড হবেন স্যার?'

'অবশ্যই ইন্টারেস্টেড হব। অবশ্যই ইন্টারেস্টেড হব। আপনি কি যাবার পথে আমাকে আমার আপিস থেকে তুলে নিতে পারবেন?'

'ঠিকানাটা স্যার এজরা স্ট্রিটের। যায়গাটা খুব ঘিঞ্জি। ওখানে গাড়ি নিয়ে যাবার থেকে হেঁটে যাওয়াই সুবিধে হবে স্যার।'

'ঠিক আছে। আমিই তাহলে লালবাজারে চলে যাব। ওখান থেকে হেঁটে এজরা স্ট্রিট খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। কখন যাব?'

'আপনি দুপুর একটা নাগাদ আসতে পারবেন স্যার? মেন গেটে পৌঁছে আমাকে একটা ফোন করে দিলে আমি নিচে নেমে আসব। আপনাকে আর কষ্ট করে ওপরে উঠতে হবে না।'

'ওকে। সেটাই তাহলে ঠিক রইল।'

ফোনটা রেখে আদিত্য সিগারেট ধরাল। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানি কি সেইসব প্রশ্নের কোনওটার উত্তর দিতে পারবে?

রাধাবাজারের ঘড়ি-পট্টি পেরিয়ে আদিত্যরা যখন এজরা স্ট্রিটের ইলেকট্রিকাল গুডস-এর চত্বরে পৌঁছল তখন প্রায় দেড়টা বাজে। ঠিকানাটা একটা পাঁচতলা আপিস-বাড়ির। ঢোকার মুখে দেয়ালে লেটারবক্সের আধিক্য দেখে মনে হল বাড়িটায় অন্তত শ'খানেক আপিস আছে। এই ই-মেল, এস এম এস-এর যুগে চিঠিপত্তর খুব বেশি আসে না। তাই লেটারবক্সগুলো চিঠি বহন করার পরিবর্তে সাইনবোর্ডের কাজ করছে। বাড়িতে ঢোকার মুখে দেয়ালটা ভেঙে গিয়ে ইট বেরিয়ে পড়েছে। ঢুকলেই একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। পুরোনো চুন-সুরকির ওপর শ্যাওলা জমলে যেমন গন্ধ হয়। একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে গিয়েও চাকির ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর দ্বিগুণ দ্রুততায় বেরিয়ে গেল রাস্তায়। সিঁড়ির হাতলটা এখনও নড়বড় করছে, লোকটা তাতে ভর দিয়ে নামছিল নিশ্চয়। এমন হাতলে ভর করে সিঁড়ি ভাঙতে ভরসা হয় না। এরকম একটা বাড়িতে যে কম্পানির আপিস তারা কোটি-কোটি টাকার ট্র্যাঞ্জাকশন করে কী করে?

লেটারবক্সের জঙ্গল থেকে মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানির নামটা খুঁজে পাওয়া বোধহয় মহাদেবেরও অসাধ্য। চাকি এবং আদিত্য সেই অসাধ্যসাধনে লিপ্ত হয়েছে। ধারে কাছে এখন আর কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করা যাবে। সিঁড়ি দিয়েও কেউ ওঠানামা করছে না। মিনিট পাঁচেক গোরু-খোঁজা খোঁজার পর আদিত্য হাল ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল। আর প্রায় ঠিক তখনই চাকি, আর্কিমিডিসের 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলার ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'এই যে, পেয়ে গেছি স্যার। একেবারে ধারের দিকে ছিল বলে চোখে পড়ছিল না।'

মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানির আপিসটা সেকেন্ড ফ্লোর অর্থাৎ তিনতলায়। পুরোনো আমলের বাড়ি, তাই তিনতলাটা এখনকার বাড়ির পাঁচতলার সমান। আজকাল বেশি সিঁড়ি ভাঙতে গেলে আদিত্য বেশ হাঁপিয়ে ওঠে। আর তখনই তার সিগারেট ছাড়ার কথা মনে হয়। তারপর অবশ্য সব ভুলে যায়।

সিঁড়িটা নোংরা। কোনাগুলো পানের পিকে লাল হয়ে আছে। আরও ওপরে অসংখ্য পায়রার বাসা। তাদের বর্জ্য সিঁড়ির দেয়ালে, মেঝেতে, ঘুলঘুলির গায়ে জমে পাথর হয়ে রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে

আদিত্যর গা ঘিনঘিন করছিল।
মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানির লেটারবক্সটা যেমন এক কোণে লুকোনো, তেমনি আপিসটাও। এবারেও সেটা চাকিই খুঁজে বার করল। আপিস বলতে সরু এক চিলতে ঘর। একটা অল্পবয়সী ছেলে একটা ল্যাপটপ খুলে কাজ করছিল, পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।
'এটা মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানির অফিস?' চাকি ধমকের সুরে প্রশ্ন করল।
'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী ব্যাপার স্যার?' ছেলেটার গলাটা কাঁপছে।
ঘরে আরও দু-সেট চেয়ার-টেবিল রয়েছে। কোনওটাতেই লোক নেই। একটা টেবিলের ওপর কিছু কাগজপত্র, একটা ফাইল। অন্য টেবিলটার ওপরে একটা ডেস্কটপ। সেটা বন্ধ।
চাকি ছেলেটার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'এই চেয়ার-টেবিলগুলো ফাঁকা রয়েছে কেন? এখানে লোক নেই?'
'একজন আজ আসেনি। আর একজন কাজে বেরিয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে।'
'এখানে কী কাজ হয়?' এবার আদিত্য জিজ্ঞেস করল।
'এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের কাজ স্যার। অনেক ছোট ছোট কম্পানি আমাদের থ্রু দিয়ে ইমপোর্ট করে, এক্সপোর্টও করে। আমরা তাদের সাহায্য করি।'
'কী ইমপোর্ট করে?'
'নানা ধরনের জিনিস। যেমন ধরুন ইলেকট্রিকাল গুডস। এই যে এজরা স্ট্রিটে দেখছেন এত রকমের ইলেকট্রিকাল গ্যাজেট বিক্রি হচ্ছে এর অধিকাংশই চাইনিস। যারা এগুলো বিক্রি করছে তারা তো এই জিনিসগুলো চায়না থেকে ইমপোর্ট করছে। আমরা এইরকম কিছু ইমপোর্টারকে সাহায্য করি। অ্যাডভাইস দিই কোথা থেকে মাল কিনতে হবে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।' আদিত্যর সঙ্গে কথা বলে ছেলেটার ভয় যেন কেটে যাচ্ছে।
'আর এক্সপোর্ট?' এবার চাকির গলা।
'ব্যাপারটা ওই একই রকম। ধরুন কেউ অ্যামেরিকায় ছোটখাটো চামড়ার জিনিস এক্সপোর্ট করবে। আমরা তাকে খদ্দেরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই।'
'এত কিছু আপনারা এইটুকু একটা আপিসে বসে করেন?' চাকির প্রশ্ন।
'আমাদের কাজের জন্যে খুব বেশি জায়গা লাগে না স্যার। একটা-দুটো কম্পিউটার আর ভাল ইন্টারনেট কানেকশান থাকলেই হয়।'
'আপনাদের এই কম্পানির মালিক কোথায়? আপনি তো মনে হচ্ছে এখানে চাকরি করেন।' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।
'হ্যাঁ স্যার। আমরা তিনজন এখানে চাকরি করি। মালিক খুব বেশি এখানে আসে না। দরকার পড়লে আমাদের ডেকে পাঠায়। মালিকের আরেকটা অফিস আছে।'
'মালিকের নাম আর অফিসের ঠিকানাটা বলুন। আর ফোন নাম্বারটা।' চাকি ধমক লাগাল।
'স্যার, মালিককে না জিজ্ঞেস করে নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিলে মালিক খুব রাগ করবে। আমার চাকরিটাও চলে যেতে পারে স্যার।'
চাকি কিছু বলল না। শুধু ঠান্ডা চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই হিমশীতল দৃষ্টি দেখে ছেলেটা যা বোঝার বুঝে নিল। টেবিলের ওপর থেকে একটা চিরকুট নিয়ে একটা নাম আর ঠিকানা লিখল। তারপর পকেট থেকে মোবাইল বার করে দেখে দেখে ফোন নম্বরটাও লিখল।
'আপনার নাম কী?' চিরকুটটা পকেটে পুরতে পুরতে চাকি বলল।
'সুপ্রতিম, স্যার। সুপ্রতিম জানা।'

'শুনুন সুপ্রতিমবাবু। এই মহাদেব কম্পানির অফিসটা আমরা সিল করে দেব। আমি লালবাজারে ফোন করে আরও ফোর্স পাঠাতে বলছি। তারা এসে সিল করার কাজটা করবে। আপনাকে উইটনেস থাকতে হবে। আর আপনার মালিকের সঙ্গে আমরাই যোগাযোগ করে নেব।'

রাত্তিরে অমিতাভ-রত্নার বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল আদিত্যর। উইকএন্ড। রত্না অনেকবার করে রাত্তিরটা থেকে যেতে বলেছে। মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ঝামেলা চুকিয়ে সে যখন অমিতাভদের বাড়ি পৌঁছল তখন প্রায় আটটা বাজে। সদর দরজায় বেল বাজানোর আগেই বাইরে থেকে শুনতে পেল অমিতাভর বসার ঘরে অপরিচিত গলায় কে যেন কথা বলছে।

'আয়, আয়। এত দেরি করলি কেন? আমরা তোকে বাদ দিয়েই চা খেয়ে নিলাম।' অমিতাভ দরজা খুলে বলল।

আদিত্য দেখল বসার ঘরে অমিতাভ এবং রত্না ছাড়া আরও দুজন সোফায় পাশাপাশি বসে আছে। আদিত্যর মনে হল এরা স্বামী-স্ত্রী।

'আলাপ করিয়ে দিই। ডাক্তার নীলাদ্রি দত্ত, আমার ইস্কুলের বন্ধু। আর নীলাদ্রির স্ত্রী ডাক্তার অনসূয়া দত্ত। আর এ হল আমার আর রত্নার কলেজের বন্ধু আদিত্য মজুমদার।' অমিতাভ বসল। আদিত্য তখনও দাঁড়িয়ে।

'আমি আদিত্যর জন্যে চা নিয়ে আসি। কিছু খাবি?' শেষ কথাটা রত্না আদিত্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, এখন কিছু খাব না। আর চা করার ঝামেলায় না গিয়ে তুই বরং এক কাপ কফি খাওয়া। তোদের সেই কলম্বিয়ান কফি। ওটা তো ইন্সট্যান্ট কফি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।' আদিত্য এবার বসে পড়ল। নীলাদ্রি নামটা তার মনে পড়েছে। সেই পেডিএট্রিশিয়ান যে বটুক সামন্তর ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে।

'ক্লাস ফাইভ অব্দি নীলাদ্রি ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। পাশাপাশি বসতাম। টিফিনে একসঙ্গে খেলতাম। তারপর হঠাৎ বিচ্ছেদ। ক্লাস ফাইভের শেষ দিকে নীলাদ্রির বাবা বদলি হয়ে গেলেন। তুই কি ফাইভের অ্যানুয়ালটা দিয়েছিলি?' অমিতাভ নীলাদ্রিকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। অ্যানুয়ালটা দিয়েই চলে গিয়েছিলাম। তোর সঙ্গে দেখাও করে যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম যাবার আগে তোর ঠিকানাটা নিয়ে নেব। সেটাও হয়ে ওঠেনি। বাবা মধ্যপ্রদেশের ভূপালে বদলি হয়ে গেলেন। সেখান থেকে পুনে। পুনে থেকে আবার কলকাতা। ফিরে এসে অন্য স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখান থেকেই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলাম। তারপর আর জি কর থেকে মেডিকাল।' নীলাদ্রি থামল।

নীলাদ্রির স্ত্রী অনসূয়া বলল, 'আপনার সঙ্গে নীলাদ্রির যে আবার যোগাযোগ হল সেটাও আশ্চর্যভাবে। সারা সপ্তাহ আমরা দুজনেই খুব ব্যস্ত থাকি, দু-জনের প্রায় দেখাই হয় না। শুধু উইকএন্ডটা আমাদের নিজস্ব। সেই দিনটাও একটা উইকএন্ড ছিল। আমরা বাড়িতে বসে এক সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। এটা আমাদের কাছে বিরাট লাক্সারি। সাধারণ কথাবার্তাই বলছিলাম। সামনে টিভিটা খোলা ছিল। আমরা কেউই খুব একটা টিভি দেখি না। তাই, নেহাত ভাগ্যবশতই বলব, টিভিটা খোলা ছিল। কলকাতার হেরিটেজ বিল্ডিংগুলো নিয়ে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল। কয়েকজন হিস্টোরিয়ান বিল্ডিংগুলোর হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ নীলাদ্রি বলে উঠল, দ্যাখো, দ্যাখো। এই ভদ্রলোককে ঠিক আমার ছোটবেলার বন্ধু অমিতাভর মতো দেখতে।'

'অমিতাভর চেহারাটা কিন্তু একদম পাল্টায়নি। ছোটবেলার সেই শুগার বেবি ভাবটা এখনও মুখে রয়ে গেছে। তাই আপনি চিনতে পারলেন।' রত্না হাসতে হাসতে বলল।

'সেটা ঠিক। কিন্তু সেদিন টিভির প্রোগ্রামটা তো শেষ হয়ে গেল, হিস্টোরিয়ানদের নামগুলো আমারা জানতে পারলাম না। বোধহয় গোড়াতেই বলে দিয়েছিল, আমরা খেয়াল করিনি। ভাগ্যক্রমে, ওই চ্যানেলের

একটি রিপোর্টারের বাচ্চা আমার পেশেন্ট। তাকে ফোন করে কনফার্মড হলাম যে ওটা আমার ছোটবেলার বন্ধু অমিতাভ মিত্রই বটে। ওই রিপোর্টার ছেলেটিই অমিতাভর ফোন নম্বরটা জোগাড় করে দিল।' নীলাদ্রি দত্ত থামল।

'এত বছর পরে নীলাদ্রি যখন ফোন করল তখন প্রথমে বলল, আপনি কি অমিতাভ মিত্র? আমি হ্যাঁ বলতে ও বলল, আমাকে চিনতে পারছ? আমি নীলাদ্রি দত্ত, তোমার সঙ্গে পড়তাম। আমি যেই বললাম, অবশ্যই চিনতে পারছি, ও বলল, আমি এখন পিজিতে আছি। একদিন তোর সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুব ভাল হয়। এত দ্রুত আপনি থেকে তুই-এর ট্রাঞ্জিশানটা খুব মজার।' অমিতাভ বলল। তারপর একটু থেমে বলল, 'নীলাদ্রি তুই তো বাচ্চাদের ডাক্তার। তুই কি ডাঃ সামন্ত বলে কাউকে চিনিস যিনি বাচ্চাদের ডাক্তার, বর্ধমান মেডিকাল কলেজে আছেন?'

'ডাঃ শুভঙ্কর সামন্ত।' আদিত্য এতক্ষণ বাদে মুখ খুলল।

নীলাদ্রি দত্ত একটু অবাক হয়ে আদিত্যর দিকে তাকাল। তারপর অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, শুভঙ্কর। হ্যাঁ, তাকে চিনি বইকি। শুভঙ্কর আমার সব থেকে ভাল ছাত্র। বারো বছরের টিচিং কেরিয়ারে আমি যত ছাত্র পড়িয়েছি তার মধ্যে বেস্ট। কিন্তু তাকে তোর কেন দরকার? কাউকে দেখাতে হবে?'

'দরকারটা আসলে আমার।' আদিত্য যথাসম্ভব কাঁচুমাচু হয়ে বলল। 'কারণটাও একটু অদ্ভুত। কাউকে দেখাব বলে ডাঃ সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি না। একটা খুন এবং টাকা চুরির মামলায় ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর বাবা সত্যজিৎ সামন্ত জড়িয়ে পড়েছেন। সেই সূত্রে ডাঃ সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। অমিতাভ আপনাকে এখনও আমার আসল পরিচয়টা দেয়নি। তাই আমি নিজেই নিজের পরিচয়টা দিচ্ছি। আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। আমি সত্যজিৎ সামন্তর কেসটা ইনভেস্টিগেট করছি।'

আগের তুলনায় আদিত্য এখন অনেক পোড়-খাওয়া হয়েছে। নিজের গোয়েন্দা পরিচয়টা দিতে সে আজকাল আর সংকোচ বোধ করে না। কিন্তু এক সঙ্গে এতগুলো তথ্যের চাপে ডাঃ নীলাদ্রি দত্ত যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। তার স্ত্রীর অবস্থাও অথৈবচ। সেই বিভ্রান্ত অবস্থা থেকে প্রথমে বেরিয়ে এসে ডাঃ অনসূয়া দত্ত বলল, 'যাঃ কী বলছেন। বেসরকারি গোয়েন্দা আবার হয় নাকি?'

আদিত্য ভাবছিল বলবে, 'নাই যদি হবে তা হলে হলো কী করে?'

কিন্তু এটা রসিকতার সময় নয়। তাই সে কাতরভাবে বলল, 'বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, ওটাই আমার জীবিকা।'

নীলাদ্রি দত্ত খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে। সে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে সাবধানি গলায় বলল, 'আমাকে ঠিক কী করতে বলছেন?'

'যদি শুভঙ্কর সামন্তর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারেন তা হলে আমার খুব উপকার হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার থেকেও বেশি উপকার হয় ডাঃ সামন্তের নিজের। আমার উপকারের কারণটা অবভিয়াস। ডাঃ সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমার তদন্তটা এগোতে পারবে। ডাঃ সামন্তর কেন উপকার হবে, বলছি। দেখুন, আজ না হোক তো কাল এই কেসটার সূত্রে পুলিশ ডাঃ সামন্তর কাছে পৌঁছে যাবেই। সেটা ওঁর রেপিউটেশনের পক্ষে ভাল হবে না। ডাঃ সামন্তর কাছে পুলিশ এসেছে এই খবরটা ডিসটর্টেড হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি যদি পুলিশের আগে পৌঁছতে পারি তাহলে কিছু ব্যাপারে আমি ওঁকে সাবধান করে দিতে পারব। হয়তো পুলিশকেও বোঝাতে পারব যে শুভঙ্কর সামন্তর সঙ্গে দেখা করে বিশেষ লাভ নেই। অমিতাভ জানে, পুলিশের সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্য আছে।'

অমিতাভ ঘাড় নাড়ল। নীলাদ্রি দত্ত ভাবছে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বলল, 'দেখুন শুভঙ্কর আমার সব থেকে ভাল ছাত্র নিশ্চয়, কিন্তু মানুষ হিসেবে ও একটু ডিফিকাল্ট। কিছু ব্যাপারে ও হুইমসিকাল, আনস্ক্রুপুলাস, আনঅর্থডক্স, অসামাজিক। ওর স্বভাবটা রীতিমতো রুক্ষ। রুগির বাবা-মায়ের সঙ্গে ওর ব্যবহার নিয়ে অনেক কমপ্লেন আছে। নেহাত ডাক্তার হিসেবে আউটস্ট্যান্ডিং বলে লোকে ওর সমস্ত দোষ

মেনে নেয়। আমি যত দূর জানি ওর বাবার সঙ্গে ওর এবং ওর মায়ের খুব একটা সম্পর্ক নেই। সম্ভবত ছোট থেকেই শুভঙ্কর মামারবাড়িতে মানুষ। ওর কথা শুনে মনে হয় নিজের বাবাকে ও ঘৃণা করে। এই অবস্থায় ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে কিনা জানি না।'

'দেখুন, শুভঙ্করবাবু যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে না চান তা হলে তো কিছু করার নেই। সেক্ষেত্রে আমি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে পুলিশ থাকলে উনি দেখা করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু আমি সে ভাবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই না। আপনি যদি ওঁকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন তা হলে উনি হয়ত রাজি হয়ে যেতে পারেন।'

'আমি ওকে বুঝিয়ে বলব। আসলে, যতই ওর দোষ থাকুক ওর প্রতি আমাদের, মানে অনসূয়ার আর আমার, একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। আমরা চাই ওর ভাল হোক।'

নবম পরিচ্ছেদ

১

ট্রেনে বর্ধমানে গিয়ে সেদিনই অনায়াসে ফিরে আসা যায়। আদিত্যরই কয়েকজন বন্ধু আছে যারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় এবং সপ্তাহে তিন বার কলকাতা থেকে বর্ধমান গিয়ে ক্লাস নিয়ে আবার সেদিনই ফিরে আসে। কিন্তু ডাঃ শুভঙ্কর সামন্ত আদিত্যকে সময় দিয়েছে রাত্তির সাড়ে নটায়। ডাক্তারদের সময় দেওয়া তো। সাড়ে নটা বলে অনায়াসে সাড়ে দশটা অব্দি বসিয়ে রাখতে পারে। অত রাত্তিরে আদিত্য ফিরবে কী করে? তাই সাত-পাঁচ ভেবে আদিত্য একটা গাড়ি ভাড়া করে ফেলল। সঙ্গে গাড়ি থাকলে ফেরাটা সমস্যা হবে না। তবে রাত্তিরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাকদের কনভয় বেরোয়। একবার একটা কনভয়ের পেছনে আটকে গেলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ বাড়ি থেকে রওনা হয়ে গেল আদিত্য। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার একাধিক কারণ। একে তো ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর বাড়ি ও চেম্বার খুঁজে বার করার জন্য কিছুটা সময় হাতে রাখা প্রয়োজন। তার ওপর রত্না বারবার বলে দিয়েছে বর্ধমান শহরে গেলে ওখানকার গণেশের দোকান থেকে সীতাভোগ-মিহিদানা আনতে হবে। দু-রকম সীতাভোগ-মিহিদানা নাকি পাওয়া যায়। ঘি এবং এমনি। ঘি-এর দাম বেশি, এবং রত্না স্পষ্ট করে দিয়েছে সেটাই আনতে হবে। রত্নার কথা অমান্য করা অসম্ভব। তাই সেসব কাজের জন্যেও খানিকটা সময় হাতে রাখা দরকার। তাছাড়া যাবার পথে শক্তিগড়ে থেমে ল্যাংচা কেনারও ইচ্ছে আছে।

ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর বাড়ি এবং চেম্বারটা তারাবাগ পোস্টাপিসের কাছে। বাড়ির পাশেই চেম্বার। জায়গাটা কৃষ্ণসায়র থেকে খুব দূরে নয়। দিনের বেলা হলে কৃষ্ণসায়র পার্কে খানিকটা সময় কাটানো যেত, কিন্তু সন্ধেবেলা সেটা নিশ্চয় বন্ধ থাকবে।

কলকাতার রাস্তায় বেশ জ্যাম। দ্বিতীয় সেতু পেরিয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে অব্দি পৌঁছতেই অনেকটা সময় লেগে গেল। আদিত্য মনে মনে ভাবছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ভালই করেছে। আজকাল রাস্তাঘাটের ওপর একেবারেই ভরসা করা যায় না। সাঁতরাগাছিতে পৌঁছে আবার জ্যাম। ব্রিজ সারাই হচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। আধঘণ্টা হয়ে গেল। যানজট কাটিয়ে গাড়ি যখন ডানকুনি পৌঁছেচে তখন আদিত্যর হাতে আর পৌনে দু-ঘণ্টা বাকি।

'আমাকে সাড়ে নটার মধ্যে তারাবাগ পোস্টাপিসের কাছে পৌঁছতে হবে। তার আগে শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা কিনব, বর্ধমানে ঢুকে গণেশ সুইটস থেকে সীতাভোগ-মিহিদানা কিনব। এত কিছু করতে পারব?'

'দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ফাঁকা পেলে সব কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু লরির জাম থাকলে কিছুই বলা যায় না।' ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতে জানাল।

এটা সেই গাড়ি যেটা কেয়া মাঝে মাঝে ভাড়া করে। ড্রাইভারও একই। গাড়িটা কেয়াই ভাড়া করিয়ে দিয়েছে। সৌভাগ্যবশত, আদিত্যরা যেদিকে যাচ্ছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের সেদিকটা একেবারে ফাঁকা। কিন্তু উল্টোদিকে সারি সারি কলকাতাগামী ট্রাক জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আদিত্য শিউরে উঠল। ফেরার সময় রাস্তার এরকম অবস্থা থাকলে কপালে দুঃখ আছে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ড্রাইভার একশ' কিলোমিটার স্পিড তুলে দিয়েছে। গাড়ি যখন শক্তিগড়ে তখন আদিত্যর ঘড়িতে আটটা চল্লিশ। ল্যাংচা কিনে, সীতাভোগ-মিহিদানা কিনে সে ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর বাড়িতে পৌঁছল সাড়ে নটা বাজার মিনিট ছয়েক আগে।

ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর বসতবাড়িটা একতলা। হাল ফ্যাসানের বাড়ি, দেখে মনে হয়, খুব বেশিদিন তৈরি হয়নি। বাড়ির গায়ে শুভঙ্কর সামন্তর নাম লেখা। পাশে আর একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তার একতলাটা মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে, সেখানেই ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর চেম্বার। তার ওপরে, দোতলা থেকে পাঁচতলা অব্দি, বাকি বাড়ির কঙ্কালটুকু খাড়া করা হয়েছে মাত্র। একতলায় ঢোকার মুখে একটা অস্থায়ী সাইনবোর্ড। তাতে লেখা 'কুমুদিনী শিশু চিকিৎসালয়, তারাবাগ, বর্ধমান।'

শুভঙ্কর সামন্ত বলেছিল রাত্তির সাড়ে নটা নাগাদ তার চেম্বারে চলে আসতে। সাড়ে নটা বাজতে আর সামান্য কয়েক মিনিট বাকি, কিন্তু এখনও চেম্বারে ভিড় উপচে পড়ছে। আদিত্য হিসেব করে দেখল, ডাক্তারবাবুর ছাড়া পেতে পেতে এখনও অন্তত এক ঘণ্টা। সে ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি খেয়ে আসুন। আমাকে এখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হবে মনে হচ্ছে।'

একতলায় ঢুকেই একটা রিসেপশন। আদিত্য ঢুকতেই রিসেপশনের মেয়েটি তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আমি কাউকে দেখাতে আসিনি। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার অন্য একটা দরকার আছে। উনি আমাকে সাড়ে নটার সময় আসতে বলেছিলেন।' আদিত্য বিনীতভাবে জানাল।

'মেডিক্যাল রেপ্রেসেন্টেটিভ? নটার সময় কিন্তু ওরা অনেকে ঢুকেছিলেন। এখন আর কোনও রেপ্রেসেন্টেটিভ স্যার অ্যালাউ করবেন না। আপনি ঠিক সময় এলেন না কেন?'

'না, না। আমি মেডিক্যাল রেপ্রেসেন্টেটিভ নই। দেখুন আমার হাতে ব্যাগ ট্যাগ কিচ্ছু নেই।' আদিত্য তার খালি হাত দুটো দেখিয়ে খানিকটা হাস্যকরভাবে নিজের কথাটা প্রমাণ করতে চাইল। তারপর নিজের হাবভাবে নিজেই লজ্জা পেয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'আমার দরকারটা ব্যক্তিগত। আপনি আমার নামটা ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বললেই উনি বুঝতে পারবেন।'

'ঠিক আছে। আপনার নামটা এই স্লিপটায় লিখে দিন। আমি ডাক্তারবাবুকে দিয়ে আসছি।'

আদিত্য স্লিপে নিজের নাম এবং রেফারেন্স হিসেবে ডাঃ নীলাদ্রি দত্তর নাম লিখে টেবিলের ওপর রাখার পরেও রিসেপশানিস্ট মহিলা আদিত্যকে এবং তার লেখা স্লিপটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনেকক্ষণ মোবাইলে কথা বলে গেলেন। মিনিট পাঁচেক এইভাবে কেটে যাবার পর ভদ্রমহিলা স্লিপটা নিয়ে ঢুকে গেলেন ডাক্তারবাবুর খাস কামরায়। একটু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'স্যার আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। একটু বসতে হবে। রুগি দেখা শেষ হলে স্যার আপনাকে ডেকে নেবেন।'

'আমি কি তাহলে একটু চা খেয়ে আসতে পারি?'

'ঠিক আছে। ঘুরে আসুন।' ভদ্রমহিলা চারদিকে তাকিয়ে ঘরে অপেক্ষমাণ রুগির সংখ্যাটা একবার জরিপ করে নিলেন। তারপর বললেন, 'আধঘণ্টার বেশি দেরি করবেন না।'

আসার পথে আদিত্য খেয়াল করেছিল এই গলিটার মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে। খাপরার চাল, দরমা দিয়ে ঘেরা রাস্তার চায়ের দোকান। আদিত্যর পক্ষে আপাতত ওই যথেষ্ট। তবে গাড়িতে আসার সময় চায়ের দোকানটাকে যতটা কাছে মনে হয়েছিল, হাঁটতে গিয়ে দেখল মোটেই ততটা কাছে নয়।

দোকানে আরও দু-চারজন চা খাচ্ছে।

'ডাক্তারবাবুর চেম্বারে কি রোজই এরকম ভিড় থাকে?' আদিত্য চায়ে চুমুক দিয়ে দোকানিকে জিজ্ঞেস করল।

'কোন ডাক্তারবাবু? এই গলির মধ্যে তিনজন ডাক্তার।' চা-ওলা ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল। যেন বলতে চায় তাদের এই মহল্লায় অভিজাত ব্যক্তিদের ছড়াছড়ি।

'ওই ডাক্তার সামন্ত। যিনি বাচ্চাদের ডাক্তার।' আদিত্য নিরীহ গলায় বলল।

'ভদ্রলোককে নতুন পেয়ে গুপ্পি মারছ কেন, কানুদা?' চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই একজন খদ্দেরের গলা শোনা গেল এক কোনা থেকে। 'এই পাড়ায় ডাক্তার বলতে তো ওই শুভঙ্কর সামন্তই। অন্য দু-জন যাদের কথা বলছ

তাদের একজন তো হোমোপাখি আর আরেকজন এতই বুড়ো যে নিজেই চোখে দেখতে পায় না।'

'তুই জানিস ভট্টাচাজ্জি ডাক্তারের কত রুগি হয়?' কানু নামক চা-ওলা হার মানার লোক নয়।

'আরে ছাড়, ছাড়। হোমোপাখির আবার রুগি। দশ টাকার ভিজিট আর দশ টাকার ওষুধে হয়ে যায় বলে কিছু মুটে-মজুর ওখানে ভিড় করে। তোমাদের ভট্টাচাজ্জি কোনও দিন রোগ সারাতে পেরেছে?'

'ভট্টাচাজ্জি ডাক্তারের ওপর বীরুর খুব রাগ। এত রাগ কেন রে বীরু?' আরেকজন আলোচনায় যোগ দিয়েছে।

এরপর কিছুক্ষণ ভট্টাচাজ্জি ডাক্তারের দোষগুণ নিয়ে প্রবল তর্কাতর্কি চলল। দোকানের অন্য চা-পায়ীরা সকলেই তর্কে যোগ দিয়েছে। আদিত্যর অস্তিত্ব তারা ভুলেই গেছে মনে হয়। তর্কের শব্দমাত্রা যখন একটু কমেছে এবং গলা ফাটিয়ে চেঁচানোর পর সকলেই একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, তখন আদিত্য সুযোগ বুঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'এখানে কি একটা ছোটদের নার্সিং হোম হচ্ছে?' প্রশ্নটা বিশেষ কারও উদ্দেশে নয়, যে উত্তর দেবে তার উদ্দেশে।

'হচ্ছে তো। দেখলেন না সাইন বোর্ড? আপনি তো ডাঃ সামন্তর চেম্বারেই গিয়েছিলেন।' কানু চা-ওলা বলল।

'দেখলাম তো। দেখলাম, শুধু একতলাটা তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আমিও কিন্তু দেখছি নার্সিং হোম তৈরির কাজ একমাসের ওপর বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।' বীরু বিস্কুটে কামড় দিয়ে বলল।

'এই সময় কাজটা এগিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এর পর তো বৃষ্টি নেমে যাবে।' কানু বিজ্ঞের মতো বলল।

শুভঙ্কর সামন্তর চেম্বারে ফিরে আসার পর আদিত্যকে আরও আধঘণ্টা বসে থাকতে হল। দিনের শেষ রুগিটি দেখে তাকে বকতে বকতে শুভঙ্কর নিজেই তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। মাঝারি গড়ন, মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রঙ ফরসার দিকে। মনে হয় শুভঙ্কর সামন্ত তার মায়ের রঙ পেয়েছে। তবে মুখাবয়বে বটুক সামন্তর ছাপ আছে।

শেষ রুগিটি একটি মেয়ে, বয়েস এক বছরের নিচে। আপাতত সে তার বাবার কোলে রয়েছে। পিছনে বাচ্চার মা। আদিত্য শুনতে পেল বাচ্চার মাকে শুভঙ্কর বলছে, 'বলিহারি আপনাদের আদিখ্যেতা। বাচ্চার দাঁত উঠছে না বলে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন। কখনও শুনেছেন, কোনও বাচ্চার দাঁত উঠলই না? আমি কোনও ওষুধ দেব না। দাঁত আপনা-আপনি উঠবে।'

বাচ্চার মা বোধহয় মিনমিন করে কিছু একটা বলতে গেল।

শুভঙ্কর আবার ধমক লাগাল, 'বলছি তো ওষুধ দেব না। বাড়ি চলে যান।' এবার গলা বেশ উঁচু পর্দায়।

বাবা-মা বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর শুভঙ্কর সামন্ত আদিত্যকে খেয়াল করল। তাকে বসে থাকতে দেখে রুক্ষভাবে বলল, 'আপনি ধরে নিচ্ছি আদিত্য মজুমদার। আপনাকে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। কাল খুব ভোরে আমাকে উঠতে হবে।' তারপর আদিত্যকে শুনিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'যত্ত সব উটকো ঝামেলা।'

কথা বলতে বলতে শুভঙ্কর ডাক্তার একটু এগিয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে রিসেপশনের মেয়েটিকে বলল, 'তুমি বাড়ি চলে যাও। কাল কখন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছ?'

'বিকেল তিনটে থেকে স্যার। তাছাড়া কাল তো পোলিও খাওয়ানোর দিন।'

'তুমি তাহলে আড়াইটের সময় এসে চেম্বার খুলো।'

মেয়েটি বেরিয়ে যাবার পর ফাঁকা ঘরে আদিত্য আর শুভঙ্কর সামন্ত।

'বলুন। চটপট বলে ফেলুন কী বলবেন।' শুভঙ্কর সামন্ত আদিত্যর সামনে এসে বসল।

'আপনার সময় বেশি নেব না। সারাদিন কাজ করে আপনি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত।' আদিত্য বিনীতভাবে শুরু করতে যাচ্ছিল।

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শুভঙ্কর সামন্ত বলে উঠল, 'ওসব ফালতু শান্তিপুরী ভদ্রতা-টদ্রতাগুলো কাটান। চটপট বলে ফেলুন কী বলবেন।'

অপমানে আদিত্যর কানদুটো গরম হয়ে গিয়েছিল। তবু সে মাথা ঠান্ডা রেখে শান্তভাবে বলল, 'আমার দুটো প্রশ্ন। এক, আপনার বাবা সত্যজিৎ সামন্তর সঙ্গে আপনার কতটা যোগাযোগ আছে? মানে, কত ফ্রিকোয়েন্টলি আপনার বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়, এবং শেষ কবে তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল? দু-নম্বর প্রশ্ন, আপনি যে এই নার্সিং হোমটা বানাচ্ছেন সেটা কি আপনার বাবা ফাইনান্স করছেন?'

প্রশ্নগুলো শুনতে শুনতে শুভঙ্কর সামন্তর মুখের অভিব্যক্তিটা বদলে যাচ্ছিল। এবার সে গলা তুলে বলে উঠল, 'আপনাকে আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব আপনি ভাবলেন কী করে? আপনি কে যে আপনাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে? আপনি কে, অ্যাঁ? কোন লাটের বাঁট? অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। এবার আপনি কেটে পড়ুন। নাহলে আমার সিকিউরিটিকে ডেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব। আমার সিকিউরিটি কিন্তু আমার মতো এত কথা বলে না। প্রথমেই হাত চালিয়ে দেয়। সো গেট লস্ট।'

আদিত্য যেখানে বসে ছিল, কিছুক্ষণ সেখানেই স্থিরভাবে বসে থেকে খুব ঠান্ডা চোখে শুভঙ্কর সামন্তর দিকে সে তাকিয়ে রইল। তাকে একটুও বিচলিত না দেখে শুভঙ্কর সামন্ত কিছুটা থমকে গেছে। তাছাড়া আদিত্যর চোখের দৃষ্টিতেও কিছু একটা ছিল যা শুভঙ্কর সামন্তকে চিন্তায় ফেলছিল।

'আজ আমি যাচ্ছি।' আদিত্য খুব থেমে থেমে বলল। 'এর পরে পুলিশের সঙ্গে আসব। সেদিন কিন্তু অন্য ভাষায় কথা বলব। হয়ত সেই ভাষাটা আপনি আরও সহজে বুঝতে পারবেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। আপনার বাবা চোরাই কারবার করে গ্রেপ্তার হয়ে আপাতত জামিনে মুক্ত আছে। তার চোরা কারবারের টাকায় আপনি নার্সিং হোম করছেন। পুলিশ আপনাকে ছাড়বে না। কোমরে দড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম। আপনার দুর্ভাগ্য আপনি সেটা বুঝলেন না। যাই হোক আমার প্রশ্ন দুটোর উত্তর আমি খানিকটা পেয়ে গেলাম। বাকি উত্তরের জন্যে মনে হচ্ছে আবার খুব শিগগির আসতে হবে। নমস্কার।' খুব ঠান্ডা গলায় কথাগুলো বলে আদিত্য উঠে দাঁড়াল।

সাফারি সুট পরা বলিষ্ঠ একটা লোক ঘরে ঢুকেছে। শুভঙ্কর সামন্তর সিকিউরিটি। আদিত্য শরীরটাকে টানটান করে রেখে দরজার দিকে হাঁটছে। বলা যায় না, লোকটা আক্রমণ করতে পারে। শুভঙ্কর সামন্ত তার সিকিউরিটিকে কিছু একটা ইশারা করল। লোকটা আদিত্যকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে আদিত্য একবার পেছন ফিরে শুভঙ্কর সামন্তর দিকে তাকাল। আদিত্যর মনে হল, শুভঙ্কর সামন্ত ভয় পেয়েছে। বেশ ভয় পেয়েছে।

২

মোবাইল বাজার শব্দে আদিত্যর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম চোখে দেখল ঘড়িতে বেলা পৌনে এগারোটা। গতকাল রাত্তিরে বর্ধমান থেকে ফিরতে প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছিল, ঘুম আসতে আসতে চারটে। এমনিতে অত দেরি করে ফেরার কথা নয়। কিন্তু একে তো রাস্তায় ট্রাকদের কনভয়, তার ওপর ডিনার খাবার জন্য পথে থামতে হয়েছিল। হাইওয়ের ধারে ধাবার তেল-মশলাদার তড়কা-রুটি এবং তার সঙ্গে অনিয়মিত ঘুম, দুই মিলিয়ে, আদিত্য টের পেল, তার চোঁয়া ঢেঁকুর ভাঙছে।

মোবাইলে একটা অচেনা নম্বর বাজছে। আদিত্য ঘুম জড়ানো গলায় 'হ্যালো' বলতে ওপার থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি কি আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছি?'

গলার স্বরটা আদিত্যর সামান্য চেনা-চেনা লাগছে। সে বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমার নাম সুমনা ঘোষাল। একবার খুব অল্প সময়ের জন্যে আমার বন্ধু সত্যজিৎ সামন্তর ভাবানীপুরের বাড়িতে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আপনার কি মনে আছে?' সেদিনের সেই ঔদ্ধত্যের

ছিটেফোঁটাও সুমনা ঘোষালের গলায় আজ নেই।

'আপনাকে আমার খুব ভালই মনে আছে। তাছাড়া ম্যাডাম, আপনি তো একজন সেলিব্রিটি। আপনাকে ভুলব কী করে?' আদিত্য নিজের গলাটাকে যথাসম্ভব সরল রাখার চেষ্টা করল, পাছে সুমনা ঘোষাল মনে করে সে ঠাট্টা করছে।

'আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার।' সুমনার গলাটা আকুল শোনাল। 'খুব বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করছি। কোথায় গেলে আপনার সঙ্গে গোপনে কথা বলা যেতে পারে?'

'আপনি আমার অফিসে চলে আসতেই পারেন।' আদিত্য সতর্কভাবে বলল। 'তবে আপনাকে যদি কেউ চিনে ফেলে তাহলে ব্যাপারটা আর গোপন থাকবে না। সেক্ষেত্রে আপনার কথাগুলো যদি বটুকবাবুর সামনে বলা চলে তাহলে আমিই বরং বটুকবাবুর বাড়ি চলে যেতে পারি। কথা হচ্ছে, বটুকবাবুর সাক্ষাতে কথাগুলো বলা চলবে কি?'

'খুব ভালই চলবে। বটুকই তো আপনাকে ফোন করতে বলল। ও সবটাই জানে। আপনি কখন আসতে পারবেন?'

'ধরুন এই বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ। তবে একটা শর্ত। বটুকবাবুকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। বটুকবাবু যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন, এটুকু আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। সেটা আপনি পারবেন তো?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে বটুককে রাজি করাতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু সে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে কিনা সেটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে। আপনি বটুকবাবুর সঙ্গে আমার কথা বলিয়ে দিলেই হবে। আমি তাহলে সাড়ে চারটে নাগাদ চলে আসছি।'

কয়েকদিন হল দুর্দান্ত গরম পড়েছে। মেট্রোর ঠান্ডা ভূগর্ভ থেকে ওপরে উঠতেই আদিত্য টের পেল বিধাতা পুরুষ এই শহরে আর একটা হিট-ওয়েভ আমদানির পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছেন। সাধারণত কলকাতার গরমে যে প্যাচপ্যাচে ভাবটা থাকে এখন সেটাও নেই। তার বদলে এই বিকেল চারটেতেও সূর্যের শুষ্ক আগুন চারদিক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। এই সময় জগুবাবুর বাজারের বাইরে একটু একটু করে তরিতরকারির দোকান বসে যায়। আজ এখনও বসেনি। নিশ্চয় গরমের কারণে। আদিত্য জগুবাবুর বাজারের পাশের রাস্তাটা ধরে পদ্মপুকুরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

বলরাম মল্লিকের আদি মিষ্টির দোকানটা বাঁ হাতে রেখে আদিত্য খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। সোমেন মুখুটি ফোন করছে।

'ফিরে এসেছেন? নাকি উত্তরবঙ্গ থেকে বলছেন?' আদিত্য ফোনটা ধরে বলল।

'গতকাল ভোরবেলা ফিরেছি। ফিরেই লালবাজার গেছিলাম। তারপর কাজে এমন আটকে পড়লাম যে সারাদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

'তা তো হবেই। এত দিন ছিলেন না। নিশ্চয় অনেক কাজ জমে গিয়েছিল।'

'কিছু কাজ তো জমেই ছিল। কিন্তু সেটা কথা নয়। বলার কথা হল, অবশেষে সেই শিবেন মাইতিকে ধরতে পেরেছি। ব্যাটাচ্ছেলে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে বসেছিল। কোচবিহারের ইন্টিরিয়ারে। খুব দৌড় করিয়েছে। যাই হোক ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। একটা প্রাথমিক ইন্টারোগেশান হয়ে গেছে। আজ বিকেল থেকে আসল ইন্টারোগেশান শুরু করব। আপনি কি আসতে পারবেন?'

'আজ বোধহয় আমার হয়ে উঠবে না। একটা অন্য কাজে যাচ্ছি। আপনি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিন। আমি পরে আপনার কাছ থেকে জেনে নেব কী হল।'

'ঠিক আছে। কিছু বার করতে পারলেই আমি আপনাকে জানাব।' সোমেন মুখুটি ফোন রেখে দিল।

আদিত্যর মনে হল সে জিজ্ঞাসাবাদের সময় না থাকতে পারাতে সোমেন মুখুটি মনে মনে খুশিই হয়েছে। তাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। এই কেসটা সে নিজের মতো করে একরকমভাবে তৈরি করছে। চিন্তাভাবনা, দৌড়দৌড়ি সব তার একার। তাই অন্য কাউকে সে তার কৃতিত্বের ভাগ দিতে চায় না। নেহাত গৌতমের মতো একজন খুব সিনিয়ার অফিসার নির্দেশ দিয়েছে বলে মুখুটি মাঝে মাঝে আদিত্যকে কেসটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে রাখছে।

আদিত্য যখন বটুক সামন্তর বাড়ির সামনে পৌঁছল তখন সে প্রায় হাঁপাচ্ছে। প্রবল গরমে অতটা হাঁটার ফলে তার রীতিমতো অসুস্থ লাগছিল। লোহার গেট দিয়ে ঢুকে আদিত্য দেখল হণ্ডা অ্যাকর্ডটা ঠিক আগের দিনের মতো ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গ্যারেজের ভেতরে বা বাইরে বড় বি এম ডাবলুটা কোথাও নেই।

মিনিট দশেক পরে বটুকবাবুর বসার ঘরে বসে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'এবার বলুন কী আপনার সমস্যা।'

কথাটা সুমনা ঘোষালের উদ্দেশে বলা হলেও তার উত্তর দিলেন বটুক সামন্ত।

'মিতুল ওর সমস্যাটা বলার আগে আমি একটু বলে নিই। সমস্যাটা ওর ছেলে রনিকে নিয়ে। রনি একটা পুলিশি ঝামেলায় পড়তে পারে। আপনি বলেছিলেন আপনার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ভাল। তাই মনে হল এই ব্যাপারে আপনি হয়তো রনিকে একটু সাহায্য করতে পারেন। আপনার যা ন্যায্য পারিশ্রমিক সেটা আমরা অবশ্যই দেব।' বটুকবাবু চুপ করলেন।

'আগে সমস্যাটা শুনি। তারপর বলতে পারব সুমনা ম্যাডামের ছেলেকে আমি হেল্প করতে পারব কিনা। আর পারিশ্রমিক নেবার প্রশ্নটা তো উঠছেই না। রনি যদি কোনও অন্যায় করে থাকে তাহলে তো তাকে পুলিশ ধরবেই। সেক্ষেত্রে আমি যদি আমার ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে রনিকে ছাড়িয়ে আনি তাহলে তো সেটা ঘুষ নেওয়া হয়ে যাবে। আমি প্রথমেই বলে রাখি, আমি ঘুষ নিয়ে অন্যায় কাজ করি না।' আদিত্যর গলাটা একটু উত্তেজিত শোনাল।

'রনি কোনও অন্যায় কাজ করেনি। ওর মতো শান্ত ছেলের পক্ষে এমন কোনও অন্যায় করা সম্ভব নয় যাতে ওকে পুলিশে ধরতে পারে। ভাগ্য খারাপ বলে একটা বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।' সুমনা ঘোষাল তার সপ্তকে গলা তুলে বললেন।

'ম্যাডাম, আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। রনি যদি কোনও অন্যায় না করে থাকে তাহলে কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। পুলিশও নয়। কিন্তু সবার আগে পুরো ব্যাপারটা আমাকে বলুন।'

সুমনা ঘোষাল চুপ করে রইলেন। মনে হয় তিনি নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছেন। আদিত্যর মনে হল সুমনার চেহারায় একটা আশঙ্কার ছায়া পড়েছে। দু-ঢোঁক জল খেয়ে সুমনা ঘোষাল বলতে শুরু করলেন।

'আমার ছেলে রনি, যার ভাল নাম রণপ্রিয়, স্কুল পাস করার পরে বি কম পড়েছিল। আজকাল তো শুধু বি কম পাশ করে চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় না, তাই ওকে ব্যাঙ্গালোরে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট পড়ালাম। শুনেছিলাম এটা পাস করলে নাকি হোটেলে বা হাসপাতালে চাকরি পাওয়া যায়। চাকরি একটা পেয়েও গেল রনি। এখানে নয়। নয়ডার একটা নতুন হোটেলে। সেখান থেকেই ওর দুর্ভাগ্যের শুরু।'

সুমনা ঘোষাল থামল। আরও একঢোঁক জল খেল। তারপর আবার বলতে লাগল।

'চাকরিটা রনির প্রথম থেকেই সুট করেনি। নতুন হোটেল, কর্মচারীর সংখ্যা কম, তাই উদয়াস্ত খাটতে হতো। ফিক্সড অফিস আওয়ার বলতে কিছু নেই। হোটেল সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারে থাকে, যখন তখন কাজে ডাক পড়ে। অত পরিশ্রম করে রনির শরীরটা ভেঙে পড়তে শুরু করল। কিন্তু আসল সমস্যা সেটা নয়। যে হোটেলে রনি চাকরি করত সেখানে একটি বাঙালি মেয়েও কাজ করত। রনির সঙ্গে তার ভাব-ভালবাসা হয়। সম্পর্কটা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। এতটাই যে, ওরা ঠিক করল বিয়ে করবে। ওই হোটেলের চাকরিটা

মেয়েটাও আর করে উঠতে পারছিল না। ওরা দুজনেই মনস্থ করল কলকাতায় ফিরে আসবে। চাকরি খুঁজবে। চাকরি পেলে বিয়ে।'

গল্পটা আদিত্যর চেনা লাগছিল। কোথায় যেন অন্যভাবে শুনেছে। সে বলল, 'তারপর?'

'আমি রনিকে কলকাতায় একটা চাকরি জোগাড় করে দিলাম। রোহিত ধামানি আমার অনেক দিনের পরিচিত। ওদের ব্যানারে আমি অনেকগুলো ছবি করেছি। ধামানি সাহেবকে বলতে উনি ওঁদের প্রোডাকশান ইউনিটেই রনির একটা চাকরি করে দিলেন। রনি এখনও সেখানেই আছে। ভাল কাজ দেখিয়ে উন্নতিও করেছে। প্রোডাকশান ম্যানেজার হয়েছে। বটুকের এক বন্ধুর কম্পানিতে মেয়েটিরও একটা চাকরি হয়ে গেল।'

'মেয়েটির নাম কি পল্লবী ভদ্র?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। হ্যাঁ, মেয়েটির নাম পল্লবী ভদ্র। কিন্তু আপনি বুঝলে কী করে?' সুমনা ঘোষালকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত দেখাল।

'আন্দাজ করলাম। বলতে পারেন এডুকেটেড গেস। আমাদের প্রফেশনে কিছুটা খোঁজ খবর তো রাখতেই হয় ম্যাডাম। তার ভিত্তিতে অনুমান করলাম। তবে আপনার ছেলে রনি ঘোষালই যে পল্লবী ভদ্রর প্রাক্তন প্রেমিক সে খবরটা আগে জানতাম না। সম্ভবত পুলিশও জানে না। আমি যতদূর জানি, কিছুদিন আগেও তারা পল্লবী ভদ্রর প্রাক্তন প্রেমিককে ট্রেস করার চেষ্টা করছিল।'

'এইখানেই আমাদের সমস্যা। আপনি যখন এত খবর রাখেন তখন এটাও নিশ্চয় জানেন যে পল্লবীর সঙ্গে রনির সম্পর্কটা পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছিল। পল্লবী তার বসের সঙ্গে রাত কাটাত। ফলে রনির সঙ্গে পল্লবীর আর কোনও যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু টেলিভিশনে যখন রনি দেখল পল্লবী খুন হয়েছে তখন সে আমাকে বলল যে সে পুলিশের কাছে গিয়ে পল্লবীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা জানিয়ে দেবে। আমি ওকে ভীষণভাবে বারণ করলাম। আমার মনে হলো এসব পুলিশি ঝামেলায় নিজের থেকে জড়িয়ে পড়ার কোনও মানেই হয় না। তারপর যত দিন গেছে, তত কেসটা নিয়ে হইচই বেড়েছে আর ততই রনির পক্ষে পুলিশের কাছে যাওয়াটা শক্ত হয়ে গেছে। দেরি করে পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ তো বলবেই এতদিন আসেননি কেন? এ-নিয়ে রোজ রাত্তিরে রনির সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি হত। রনি পুলিশের কাছে যাবেই, আর আমিও যেতে দেব না। শেষে, আমাকে না বলে, গতকাল লালবাজারে গিয়ে রনি পল্লবীর সঙ্গে তার পুরোনো সম্পর্কের কথা বলে এসেছে। পুলিশ বড় করে ইন্টারোগেশনের জন্যে রনিকে আবার ডাকবে বলেছে। কেসটা হ্যান্ডেল করছেন ইন্সপেক্টার সোমেন মুখুটি। রনি আমাকে বলেছে, একে সঙ্গে নিয়েই আপনি ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন।'

'আপনি আমাকে ঠিক কী করতে বলছেন?'

'দেখুন আমার ছেলেকে আমার থেকে বেশি কেউ চেনে না। ও অত্যন্ত নিরীহ, ভিতু একজন মানুষ। হয়তো কিছুটা ইন্ট্রোভার্ট। কিন্তু খুন করা দূরে থাক, কাউকে একটা চড় মারাও ওর পক্ষে অসম্ভব। মুশকিল হল, পুলিশ তো এখন বলতেই পারে ও প্রতিহিংসাবশত পল্লবীকে খুন করেছে। দেখুন, কিছুদিন হল আর একটি মেয়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছে। হয়তো কিছুদিন পরে ওরা বিয়েও করবে। এই অবস্থায় রনি হঠাৎ পল্লবীকে খুন করতে যাবে কেন? ও তো পল্লবীকে ভুলেই গিয়েছিল। এই ব্যাপারটা আপনি পুলিশকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, প্লিজ?'

'ঠিক আছে। আমি যতটুকু পারি সোমেন মুখুটিকে বুঝিয়ে বলব। তবে পুলিশের ব্যাপার তো। কতটা বোঝাতে পারব জানি না। এদের মাথায় একটা কিছু ঢুকে গেলে আর বেরতেই চায় না। যাই হোক, আমি চেষ্টা করব। আশা করি, খুনের দিন রাত্তিরবেলা রনি যে অন্য কোথাও ছিল সেটা সে প্রমাণ করতে পারবে।'

'রনি বলছে খুনের রাত্তিরে ও বাড়িতেই ছিল। সন্ধ্যাদি, মানে ওর কাজের মাসি, যে ওকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, সে সাক্ষী আছে।'

'ঠিক আছে। দেখছি কী করা যায়।' আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বটুকবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার কি আমি আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আমি তাহলে চলে যাচ্ছি। তোমরা কথা বল।' সুমনা ঘোষাল উঠে দাঁড়াল।

'না, না। তুমি থাক।' বটুক সামন্ত সুমনার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিল।

আদিত্য দেখল খানিকটা উদগ্রীব হয়ে বটুক সামন্ত তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ধীরে ধীরে বলল, 'আমার তিনটে প্রশ্ন। ফিরদৌসের খুনের কেসটা সলভ করার ব্যাপারে পুলিশ আমার সাহায্য চেয়েছে। সেই কারণে প্রশ্নগুলো করছি। হয়ত পুলিশ অলরেডি আপনাকে প্রশ্নগুলো করেছে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার উত্তরগুলো আর একবার কষ্ট করে আমাকে জানাতে অনুরোধ করব।'

বটুক সামন্ত কথা বলছে না। স্থির দৃষ্টিতে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমার প্রথম প্রশ্ন মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানি নিয়ে। এরা আপনাদের মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকার শেয়ার কেনাবেচা করেছে। অথচ ওদের অফিসটা দেখে মনে হল না ওদের অত টাকা লেনদেন করার ক্ষমতা আছে। আপনার কখনও মনে হয়নি যে ওদের টাকাটা সৎ পথে আসে না?'

'দেখুন এই ধরনের একটা প্রশ্ন পুলিশও আমাকে করেছিল। তাদের যেটা বলেছি আপনাকে আবার সেটা বলছি। আমার কম্পানি কুমুদিনী বিত্ত নিগম একটা শেয়ার ব্রোকার ফার্ম। মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট আমাদের সব থেকে বড় ক্লায়েন্ট। শেয়ার ব্রোকার হিসেবে আমরা কখনই জানতে চাইব না মহাদেব কম্পানির টাকাটা এক নম্বরি না দুনম্বরি। ওটা আমাদের এক্তিয়ারেই পড়ে না। পুলিশ সরাসরি ওদের জিজ্ঞেস করে দেখুক না ওদের টাকাটা কোথা থেকে আসছে?' বটুকবাবুর আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে।

'ঠিক আছে। আমার পরের প্রশ্নে আসি। আপনি প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেন আপনার ধারণা কুড়ি কোটি টাকাটা ফিরদৌসই সরিয়েছিল। তারপর হয়ত কেউ চোরের ওপর বাটপারি করেছে। তাই তো?'

'একদমই তাই। আমি এখনও বিশ্বাস করি টাকাটা প্রথম ফিরদৌসই সরিয়েছিল।'

'সেক্ষেত্রে আপনার কাছে জানতে চাইব বহরমপুরে ফিরদৌসের এক পুরোনো বান্ধবী আছে এটা কি আপনি জানেন? বান্ধবীর নাম জয়া অধিকারী। ইস্কুলে আঁকা শেখায়। কুঞ্জঘাটা বাজার পেরিয়ে গঙ্গার কাছে বাড়ি। আপনি চেনেন একে? ফিরদৌস হয়তো টাকাটা এর বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

আদিত্যর কথাগুলো শুনতে শুনতে বটুক সামন্তর মুখটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সে বলল, 'ফিরদৌসের যে এরকম একজন বান্ধবী আছে আমি জানতামই না। পুলিশও জানত বলে মনে হয় না।' বলতে বলতে বটুক সামন্ত নিজেকে সামলে নিল। 'মানে, পুলিশ জানলে নিশ্চয় আমাকেও জিজ্ঞেস করত।'

'আমি আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করব।' বটুক সামন্তকে একটু জিরোবার সময় দিয়ে আদিত্য বলল। 'আপনার ছেলে ডাঃ শুভঙ্কর সামন্ত তার বাড়ির পাশে যে নার্সিং হোমটা করছে সেটা কি আপনার টাকায় করছে? নার্সিং হোমের নাম 'কুমুদিনী শিশু চিকিৎসালয়'। আপনার কম্পানির সঙ্গে নামে মিল আছে। তাই এই প্রশ্নটা আপনাকে করছি।'

বটুক সামন্তর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। সে কেটে কেটে বলল, 'ওই নার্সিং হোমটা অবশ্যই আমি আমার ছেলেকে করে দিচ্ছি। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কেন, তাহলে বলব, ওই আমার একমাত্র ওয়ারিশ। আমার যা কিছু আছে সব ওর প্রাপ্য। ওর প্রতি বাবার দায়িত্ব আমি পালন করিনি। তাই এখন সেই ভুল শুধরে নিচ্ছি। এটা নিয়ে আপনার কিছু বলার আছে?'

'না, না। আমার কেন বলার থাকবে? আপনার টাকা আপনি যাকে খুশি দেবেন। এটা তো আপনার অধিকার। তবে কিনা যদি কখনও প্রমাণিত হয় আপনার টাকাটা আইনের পথে উপার্জন করা হয়নি, তাহলে কিন্তু শুভঙ্করবাবুও বিপদে পড়বেন।'

' বটুকের এইসব ব্যক্তিগত কথার মধ্যে আমি প্রথম থেকেই থাকতে চাইনি।' সুমনা ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'আমি ওপরে যাচ্ছি।'

'না, না। আপনি থাকুন। আমার কথা বলা হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।' এবার আদিত্যও উঠে দাঁড়াল।

বাইরে এসে আদিত্য টের পেল সারাদিন পুড়িয়ে দেওয়া গরমের পর একটা ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে। হয়তো ঝড় উঠবে। দৈবী করুণা। সত্যিই গরমে আর পারা যাচ্ছিল না।

মেট্রোতে ওঠার আগে আদিত্য বিমলকে ফোন করল। বলল, 'এক্ষুনি ফোন করে বল তুমি কিছুদিন ডিউটিতে যেতে পারবে না। আর আমার মেসে একবার সাতটা নাগাদ আসতে হবে। খুব দরকারি কয়েকটা কাজ আছে।'

বিমলের সঙ্গে কথা বলার পর গৌতমকে ফোন করে আদিত্য কিছুক্ষণ কথা বলল।

৩

সোমেন মুখুটি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আদিত্য তার কাছে গিয়ে দ্যাখে সোমেনের মৃদু নাক ডাকছে। একটু আগে বিমলের সঙ্গে কথা বলার পর আদিত্য ঠিক করে রেখেছিল আটটা নাগাদ একবার লালবাজারে গিয়ে দেখবে শিবেন মাইতির ইন্টারোগেশন কতটা এগোল। রনি ঘোষালের ব্যাপারটাও তখন জেনে নেওয়া যাবে। সোমেনকে ফোন করতে সে বলল চলে আসুন।

তারপর গৌতমের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।

মনে হয় গত কয়েকদিন সোমেনের খুব খাটনি গেছে। তার ওপর এই ইন্টারোগেশন। এখন খুব ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে দেখলে যে কারও মায়া লাগবে। আদিত্য খুব মৃদু স্বরে ডাকল, 'সোমেনবাবু, ও সোমেনবাবু।'

আদিত্যর গলা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল সোমেন মুখুটি। একটু লজ্জা পেল। ঘুমের ঘোরে তার ডানদিকের গাল বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়েছে।

'এত টায়ার্ড ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি।' সোমেন রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বলল। 'আসলে শিবেন মাইতিকে এতক্ষণ জেরা করছিলাম। খুব ধকল গেছে। ওরও, আমারও। ব্যাটাচ্ছেলে সব দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। একটু থার্ড ডিগ্রি দিতে হল। কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না। এখন শুধু ওকে ইন্টারোগেট করার স্টেটমেন্টটা তৈরি করে ওকে চার্জশিট দিতে হবে। ততদিন ব্যাটা জেলে থাকুক।' সোমেনের মুখে একটা ক্লান্ত পরিতৃপ্তির হাসি দেখতে পেল আদিত্য।

'তাহলে তো কেসটা সলভডই হয়ে গেল। আপনি যেরকম ভেবেছিলেন সেরকমই দাঁড়াল তাহলে?' আদিত্য নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল।

'তাই তো মনে হচ্ছে। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ওপর কুড়ি লক্ষ ডলার ফিরদৌসের গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে সরে যায়। কিছুদিনের জন্য সেটা সিতারা হোটেলে ফিরদোসের কাছে ছিল। পরে ফিরদৌসকে খুন করে গোবিন্দ এবং শিবেন টাকাটা সরিয়ে ফেলে। শুধু খালি ব্যাগটা সিতারা হোটেলে ফেলে রেখে যায়। তারপর গোবিন্দকে খুন করে শিবেন টাকাটা হাতিয়ে নর্থ বেঙ্গল পালায়। ডলারগুলো বাইরে পাচার করে দেয়। শিবেন সবটাই স্বীকার করেছে। ডলার পাচারের ট্রেলটা খানিকটা ধরতে পেরেছি, যদিও টাকাটা এখনও উদ্ধার করতে পারিনি।'

'শিবেন মাইতির সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আসলে জেরার পর শিবেন সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। আমার মনে হয় সেখান থেকে দু-একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। আমি তখন আপনাকে খবর দেব, কেমন?'

'ঠিক আছে। আমি না হয় দু-চারদিন পরেই শিবেনের সঙ্গে কথা বলব। কেসটা তো সলভড হয়েই গেছে। আসলে, আমি আর একটা অন্য কারণে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম। শুনলাম, পল্লবী ভদ্রর মার্ডার কেসের ব্যাপারে রনি ঘোষাল বলে একটি ছেলে আপনার কাছে কিছু স্বীকারোক্তি করেছে। রনি ঘোষালের মা বলছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ। ব্যাপারটা আপনার কীরকম মনে হচ্ছে?'

'ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে আমারও প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ছেলেটি নির্দোষ। শুধু পুলিশি ঝামেলা এড়াতে এতদিন চুপ করে ছিল। তবে খুনের কেস তো। পুলিশ খুব সহজে ওকে ছাড়বে না। বিশেষ করে সল্ট লেকের পুলিশ, যারা মেন ইনভেস্টিগেশনটা করছে। মনে হয়, সল্ট লেকের পুলিশ শিগগির ওকে ডেকে পাঠাবে। দেখা যাক কী হয়।'

'রনির মা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমি কি তাঁকে বলব তাঁর ছেলের কোনও ভয় নেই?'

'এক্ষুনি কিছু বলবেন না। সল্ট লেকের পুলিশ কীভাবে জিনিসটা হ্যান্ডেল করে আগে দেখে নিই।'

সোমেন মুখুটির সঙ্গে কথা বলে আদিত্য যখন উঠে পড়ল তখন প্রায় নটা বাজে। গৌতম বলেছিল, সে রাত্তির অব্দি অফিসে থাকবে। আদিত্যর জন্যে অপেক্ষা করবে। মুখুটির সঙ্গে কথা বলে আদিত্য যেন সোজা তার ঘরে চলে আসে।

করিডোরটা ফাঁকা, শুধু গৌতমের ঘরের সামনে একজন প্লেন ড্রেসের অ্যাটেনডেন্ট বসে আছে। আদিত্য নিজের নাম বলতে সসম্ভ্রমে ভেতরে নিয়ে গেল।

'আয়, আয়। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিনার এসে যাচ্ছে। ডিনার খাবি তো?'

'তুই খাওয়ালে অবশ্যই খাব। সত্যি বলতে কী বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কোথা থেকে ডিনার আনতে দিয়েছিস?'

'রয়েল থেকে। সিমপ্ল খাবার। রুমালি রুটি, চাঁপ আর ফিরনি।'

'চিকেন না মাটন?'

'আরে মাটন, মাটন। চিকেন খেতে যাব কোন দুঃখে? বাড়িতে চিকেন খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু মালিনী কিছুতেই বাড়িতে মাটন ঢোকাবে না। মাটন খেলেই নাকি সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।'

মিনিট দশেকের মধ্যে খাবার হাজির। কিঞ্চিৎ গুরুভোজন হয়ে গেল। খাবার শেষ করে আদিত্য কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'এখানে বারান্দা-টারান্দা কিছু আছে? খাবার পরে একটা সিগারেট তো না খেলেই নয়।'

'বারান্দা অব্দি যাবার দরকার নেই। এখন এখানে কেউ আছে বলে মনে হয় না। তুই এখানেই ধরা। শুধু জানলাটা খুলে দে। আর আমাকেও একটা সিগারেট দে।'

'তুই ছেড়ে দিয়েছিলি না?' আদিত্য প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে বলল।

'রোজই তো ছেড়ে দিই। পরের সিগারেটটা খাওয়া অব্দি ছেড়ে দিই।' গৌতম হাসল।

কথাটা কে যেন একটা বলেছিল। মার্ক টোয়েন নাকি অন্য কেউ? আদিত্যর ঠিক মনে পড়ল না।

এর পরের এক-দেড় ঘণ্টা গৌতমের সঙ্গে কথাবার্তা চলল। গৌতম যখন আদিত্যকে মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন রাত্তির সাড়ে এগারোটা। কাল অনেক কাজ। জাল গুটিয়ে আসছে।

৪

কলকাতা থেকে বহরমপুর গাড়িতে যেতে পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়। তার থেকে ভোরের হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসটা ধরাই সুবিধেজনক। ঘুমোতে ঘুমোতে চলে যাওয়া যাবে। আদিত্যর খুব তাড়াতাড়ি বহরমপুর পৌঁছনো দরকার। তার মন বলছে, কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্যের যবনিকাপাত খুব শিগগির ঘটতে চলেছে। কিন্তু ঠিক কবে সেটা ঘটবে আদিত্য এখনও জানে না। তবে সে নিশ্চিত এই যবনিকাপাতের শুরুটা

বহরমপুরে হতে চলেছে। এই ব্যাপারে তাকে গৌতম ও বিমলের কাছ থেকে কিছু সিগনালের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর সিগনাল পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়তে হবে। যেহেতু তার মনে হচ্ছে এবারের রঙ্গমঞ্চটা বহরমপুরে, তাই সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। নাটকের কুশীলবদের সম্বন্ধে তার ধারণা এখন মোটামুটি পরিষ্কার।

এগারোটায় বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে পৌঁছে গেল ট্রেনটা। মোটামুটি ঘটনাবিহীন ভ্রমণ। অবশ্য ঘটনা ঘটলেও আদিত্যর টের পাওয়ার কথা নয়। ট্রেন শেয়ালদা ছাড়ার পর থেকেই সে একটানা ঘুমিয়েছে। এমনকি চা খেতেও ওঠেনি। ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাসটা সে বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছে ঘুমটা নিজের থেকেই ভেঙে গেল। স্টেশনের বাইরে এসে আদিত্য দেখল সেই আগের বারের ছেলেটি টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্যর সঙ্গে অবশ্য কাল রাত্তিরেই তার কথা হয়ে গিয়েছিল।

একটা হোটেলে ঘর ঠিক করা আছে। গৌতমই ঠিক করে দিয়েছে। গৌতমের পিএ ট্রেনের টিকিটের সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ভাউচারটাও মেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হোটেলটা ভালই। গঙ্গার ধারে। একতলায় রেস্টোরেন্ট। আদিত্যর ঘরটা তিনতলায়। তার ওপরে মনে হয় আরও দুটো তলা আছে। আদিত্য ঘরে ব্যাগটা রেখে চা খাবার মতলবে নেমে এসে রেস্টোরেন্টে ঢুকে দেখল এর মধ্যেই লাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে। মেরুন রঙের উর্দিপরা বেয়ারা সবিনয়ে জানাল আবার সেই তিনটের পরে রেস্টোরেন্টে চা পাওয়া যাবে। তবে আদিত্য যদি সত্যিই এখন চা খেতে চায় তাহলে ঘর থেকে ফোন করে রুম সার্ভিসে চা আনিয়ে নিতে পারে। রুম সার্ভিসের ফোন নম্বর ঘরেই পাওয়া যাবে।

আদিত্য রেস্তরেন্ট থেকে বেরিয়ে রিসেপশানের সামনে দাঁড়াল। সে ঠিক করতে পারছিল না ঘরে ফিরে রুম সার্ভিসে চা আনিয়ে নেবে নাকি হোটেল থেকে বেরিয়ে দু-পা হেঁটে গিয়ে দেখবে রাস্তায় চায়ের দোকান-টোকান কিছু আছে কিনা। আদিত্য হঠাৎ খেয়াল করল রিসেপশানের মেয়েটি তার খাতাপত্রের থেকে চোখ তুলে আদিত্যর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'বহরমপুরের আশেপাশে সাইট সিয়িং-এর কোনও গাইড বা লিটরেচার পাওয়া যাবে?' আদিত্য মেয়েটির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য জিজ্ঞেস করল।

'যাবে।' আদিত্যর হাতে ব্রোশিয়োর জাতীয় কিছু কাগজ তুলে দিল মেয়েটি।

'আচ্ছা, কুঞ্জঘাটা বাজার বলে এখানে একটা জায়গা আছে না?'

'আছে।' আদিত্য বুঝল রিসেপশানের মেয়েটি অতীব স্বল্পভাষী।

'এখান থেকে কতদূর?'

'হাঁটলে মিনিট দশেক।'

'হোটেল থেকে বেরিয়ে কোন দিকে হাঁটব?'

'হোটেল থেকে বেরিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম সরণী ধরে উত্তর দিকে যাবেন। মানে, হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে। মিনিট ছ-সাত হাঁটার পর ডান দিকে ঢুকতে হবে। রাস্তায় জিজ্ঞেস করলেই লোকে বলে দেবে।' মেয়েটি মাথা নিচু করে আবার খাতাপত্রে মন দিল। তার ভাব দেখে মনে হল অনেকটা কথা তার খরচ হয়ে গেছে। আর কথা খরচ করতে সে রাজি নয়।

'ধন্যবাদ।' আদিত্য লিফটের দিকে হাঁটা লাগাল। সে ঠিক করে নিয়েছে রুম সার্ভিসে চা আনিয়ে খাবে। যা রোদ্দুর তাতে এখন বাইরে বেরোলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

ঘরে গিয়ে প্রথমে খুব ভাল করে চান করল আদিত্য। চান করার পর বেশ খিদে পেয়ে গেল তার। এখন আর চা খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিচে যেতেও ইচ্ছে করছে না। সে রুম সার্ভিসে লাঞ্চ অর্ডার দিল ভাত, ডাল, আলুভাজা, চিকেন কারি।

গৌতম কিছু দরকারি কথা মেসেজ করে জানিয়েছে। মিটিং-এ আছে তাই ফোন করতে পারছে না। খেতে খেতে আদিত্য খুব মন দিয়ে গৌতমের মেসেজটা পড়ল। তারপর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ট্রে সমেত এঁটো

প্লেট-ডিসগুলো ঘরের বাইরে বার করে রাখল। তার আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে কেউ বেল বাজিয়ে বিরক্ত করুক সে চায় না।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়েছিল, মোবাইল বাজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। বিমল ফোন করছে।

'স্যার, আমি কেয়া বাগচি ম্যাডাম আর রত্নাবলী মিত্র ম্যাডামের বাড়িতে কাল রাত্তিরেই মিষ্টি পৌঁছে দিয়েছি। দুজন ম্যাডামের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। বলেছি, আপনি মিষ্টি পাঠিয়েছেন। আর বলেছি, আপনি কলকাতার বাইরে গেছেন বলে নিজে আসতে পারলেন না। আর, আমরাও বাড়ির সকলে মিষ্টি খেয়েছি। অপূর্ব মিষ্টি স্যার। বিশেষ করে ওই সীতাভোগটা।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে যে আসল কাজটা দিয়েছিলাম, সেটা কিছু এগিয়েছে?'

'একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছি স্যার। আপনি যাঁর কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে সেই ভোরবেলা থেকে এঁটুলি পোকার মতো লেগে আছি। তিনি এখন লিন্ডসে স্ট্রিটে একটা হোটেলে এসেছেন। নাম হোটেল ক্রসরোড। ভেতরে ঢুকেছেন। আমি বাইরে রাস্তার চায়ের দোকানে বসে আপনাকে ফোন করছি।'

'কেমন হোটেল?'

'মাঝারি ধরনের হোটেল স্যার। প্রচুর সাহেব মেম আসে।'

'আর কিছু লক্ষ করলে?'

'সকালে উনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরলেন। তারপর সিঙ্গুরের কাছে একটা বাড়ির সামনে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামলেন। তখন ওঁর হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল। আধঘণ্টা বাড়ির ভেতরে কাটিয়ে যখন আবার গাড়িতে এসে উঠলেন তখন ব্রিফকেসটা আর ওঁর হাতে ছিল না।'

'এটা কখন ঘটল? মানে কটা নাগাদ?'

'এই ধরুন সকাল আটটা নাগাদ।'

'তারপর?'

'তারপর উনি বাড়ি ফিরে এলেন। দুপুর বারোটা নাগাদ আবার বেরিয়ে এই হোটেলে এলেন।'

'ঠিক আছে। তুমি নজর রেখে যাও। আর সিঙ্গুরের বাড়িটা চিনতে পারবে তো?'

'নিশ্চয় পারব স্যার।'

আদিত্য ফোন কেটে দিয়ে দেখল রত্না মেসেজ করেছে 'দারুণ মিষ্টি। উইকএন্ডে আসতে পারবি?'

আদিত্যর মনে হচ্ছে যা ঘটার আজ রাত্তিরেই ঘটে যাবে। হয়তো একটু বেশি রাত্তিরে। গৌতমের পাঠানো মেসেজে একটা ফোন নম্বর ছিল। আদিত্য নম্বরটা ডায়াল করল। ওদিক থেকে 'হ্যালো' কথাটা ভেসে আসার পর সে বলল, 'আমি কি ইন্সপেক্টার ওয়াসিম মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলছি?'

'ওয়াসিম মণ্ডল বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। লালবাজারের মেসেজ পেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা ফোর্স নিয়ে রেডি। সকাল থেকে দুজন আর্মড পুলিশ প্লেন ড্রেসে বাড়ির বাইরে পাহারায় আছে। আপনি এখন কোথায়?'

'আমি বহরমপুরে পৌঁছে গেছি। একটা হোটেলে আছি। গঙ্গার ধারে হোটেল। নাম হোটেল ভাগীরথী। আমার হোটেল থেকে জয়া অধিকারীর বাড়ি গাড়িতে কয়েক মিনিট। জয়া অধিকারী সাধারণত পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। আমি তার পরে পরেই ওখানে পৌঁছে যাব। আমার সঙ্গে ওঁর কথা হয়ে গেছে।'

'আমি তাহলে ফোর্স নিয়ে কখন পৌঁছব?'

'আমার মনে হয়, রাত্তির নটার আগে কিছু ঘটবে না। আপনি সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছে গেলেই হবে।'

'ঠিক আছে। তাহলে তখন দেখা হবে। নমস্কার।'

ফোনটা কেটে দিয়ে আদিত্য একটা মেসেজ করল। মেসেজটা পাঠাতে না পাঠাতেই কেয়ার ফোন।

'ব্যাপারটা কী? যার তার হাত দিয়ে মিষ্টি পাঠিয়ে নিজে উধাও হয়ে গেলে। কোথায় যাচ্ছ, কবে ফিরছ কিচ্ছু বলার দরকার নেই?'

কেয়া রেগে গেছে। সাধারণত এত রাগে না। 'আমি তোমার বাড়ির খুব কাছে রয়েছি।' আদিত্য মিনমিনে গলায় বলল।

'আমার বাড়ির কাছে? কোথায়? শ্যামবাজারে?'

কেয়া যেন ধরেই নিয়েছে শ্যামবাজার ছাড়া কারও কোনও যাবার জায়গা থাকতেই পারে না।

'না, না। সে বাড়ি নয়। তোমার আসল বাড়ি। আমি এখন বহরমপুরে।'

'বহরমপুরে!' কেয়া যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না আদিত্য হঠাৎ বহরমপুর চলে যেতে পারে। তার রাগটা এখন বিস্ময়ে বদলে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড পরে কথাটা হজম হবার পর কেয়া বলল, 'আমাকে বললে না কেন? জেঠুকে বলে রাখতাম। জেঠু খুব খুশি হত। আগের বার তুমি যখন গিয়েছিলে, জেঠু তোমার খুব প্রশংসা করছিল।'

'আরে না না। এবার খুব দরকারি একটা কাজে এসেছি। হঠাৎ চলে আসতে হল, তাই তোমাকে বলে আসতে পারলাম না। এদিকে মিষ্টিগুলো রেখে দিলে খারাপ হয়ে যাবে। আমার তো ফ্রিজও নেই। তাই বিমলের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।'

'ফিরবে কবে?'

'মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরেই কাজটা হয়ে যাবে। তাহলে কাল ফিরে আসব।'

'ফিরে এসেই ফোন করবে কিন্তু।'

আদিত্য প্যান্ট-জামা পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছে। একটু পরেই বেরতে হবে। পাঁচটা বাজতে অবশ্য দেরি আছে। পথে না হয় কোথাও চা খেয়ে নেওয়া যাবে। তাতেও কিছুটা সময় যাবে। রোদ্দুরটা একটু কমেছে। আদিত্য জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল আকাশের এক দিকে মেঘ জমছে।

কেউ ঘরের কলিং বেলটা বাজাচ্ছে। বেয়ারা এঁটো বাসন নিতে ফিরে এল নাকি? কিন্তু তা কী করে হবে? এঁটো বাসনপত্র তো দরজার বাইরেই রাখা আছে। আদিত্য খুব সন্তর্পণে দরজা অব্দি গিয়ে কী-হোল দিয়ে দেখল অচেনা একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য খানিকক্ষণ খুব নিবিষ্ট মনে লোকটাকে লক্ষ করল। লোকটাকে একটু অসহিষ্ণু মনে হচ্ছে। এর মধ্যেই দুবার বেল বাজাল সে। সামান্য শব্দ পেয়ে লিফটের দিকে তাকাল। বোধহয় কেউ আসছে কিনা বোঝার জন্যে। আদিত্য তার গলাটাকে ঘুম জড়িত করে বলল, 'কেএএএ?'

লোকটা বাইরে থেকে বলল, 'থানা থেকে আসছি। একটা চিঠি আছে।'

'একটু দাঁড়ান। খুলছি।' আদিত্যর গলাটা যেন এখনও ঘুমে জড়িয়ে আছে।

আদিত্য কী-হোল দিয়ে লোকটাকে লক্ষ করে যাচ্ছে। লোকটার হাতে কোনও চিঠি দেখা যাচ্ছে না। হয়ত চিঠিটা পকেটে আছে। লোকটা বারবার প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছে। আদিত্য এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে এই লোকটা থানা থেকে আসছে না। যতই প্লেনড্রেসে থাকুক, পুলিশ দেখলে আদিত্য ঠিক বুঝতে পারে।

হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এল আদিত্য। আদিত্যকে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখে লোকটা হকচকিয়ে গেছে। বেরিয়ে এসে আদিত্য বলল, 'কোথায় চিঠি?'

লোকটা সম্ভবত চিঠিটা বার করার জন্যে প্যান্টের পাশ পকেটে হাত ঢোকাল। এই পকেটটাতেই সে বারবার হাত ঢোকাচ্ছিল। সে যখন পকেট থেকে হাতটা ধীরে ধীরে বার করে আনছে আদিত্য দেখতে পেল তার হাতের মধ্যে একটা ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল রয়েছে। সেটা এতই ছোট যে প্রায় তালুর ভেতরে এঁটে যায়।

আদিত্য খানিকটা তৈরি ছিল। সে লোকটার পিস্তল সুদ্ধু হাতটা লক্ষ করে লাথি চালাল। বোধহয় বন্দুক বার করার সময় লোকটা তার মাথাটাকে একটু নামিয়েছিল তাই লাথিটা লক্ষভ্রষ্ট হয়ে লোকটার চিবুকে গিয়ে

লাগল। কারণ যাই হোক, লাথিটা সপাটে লোকটার চিবুকে লাগার ফলে সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল। কিন্তু আদিত্য লক্ষ করল অটোমেটিকটা এখনও তার হাতে ধরা আছে। আদিত্য এঁকেবেঁকে সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগাল। সিঁড়ি অব্দি পৌঁছনোর আগেই আদিত্য টের পেল লোকটা দু-বার গুলি চালিয়েছে। বন্দুকে নিশ্চয় সাইলেন্সার লাগানো আছে, তেমন শব্দ হল না। একটা গুলি সিঁড়ির হাতলে এসে লাগল, আর একটা সিঁড়ি সংলগ্ন জানলার কাঁচে। কাঁচটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। লোকটা দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ির দিকে আসছে। আদিত্য চেষ্টা করছে কত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে দোতলায় লুকিয়ে পড়া যায়। আদিত্য সিঁড়ির মাঝপথে, লোকটা প্রায় সিঁড়ির মুখে পৌঁছে গেছে, বন্দুক তুলে আদিত্যর দিকে স্থির নিশানা করছে, এবার আর সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে চায় না, এমন সময় পরপর দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেল আদিত্য। এবারের আওয়াজটা চারতলা থেকে এসেছে। দুটো গুলিই লোকটার গায়ে লেগেছে। লোকটা তিনতলার সিঁড়ির মুখে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হাতের অটোমেটিকটা দূরে ছিটকে গেছে।

চারতলার সিঁড়ি দিয়ে রিভলভর হাতে একজন নেমে আসছে। আদিত্য তাকে চেনে। পুলিশ ইন্সপেক্টার সুদর্শন শিকদার।

'ভাগ্যিস সময় মতো আমাকে মেসেজ করে দিয়েছিলেন। না হলে পৌঁছতেই পারতাম না।' শিকদার তার সার্ভিস রিভলভরটা হোলস্টারে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল।

'আপনি সময় মতো না এলে আমার আজ এখানেই ইতি হয়ে যেত।' আদিত্য তখনও হাঁপাচ্ছে।

লোকটি মারা গিয়েছিল। একটা গুলি তার হাতে লেগেছে, আর একটা ঘাড়ে। দ্বিতীয় গুলিটাই মৃত্যু ঘটিয়েছে। একটু পরে খবর পেয়ে ওয়াসিম মণ্ডল তাঁর দলবল নিয়ে এসে পৌঁছল। সে এবং তার দলের কয়েকজন মৃত লোকটিকে দেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলেছে। লোকটা মুরশিদাবাদ জেলার একজন কুখ্যাত সুপারি কিলার। পুলিশ অনেকগুলো কেস-এ একে খুঁজছিল।

পুলিশ যখন ডেডবডি গাড়িতে তুলছে তখন আস্তে আস্তে আদিত্যর মাথাটা আবার কাজ করতে শুরু করেছে। সে হঠাৎ উপলব্ধি করল জয়া অধিকারী ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে। কথাটা ভেবেই তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। সে শিকদার এবং ওয়াসিম মণ্ডলকে বলল, 'আমাদের এই মুহূর্তে জয়া অধিকারীর বাড়ি পৌঁছনো দরকার।'

'এক্ষুনি পৌঁছতে হবে? তবে আপনি যে বললেন রাত ন-টার আগে সেখানে কিছু ঘটবে না?' ওয়াসিম মণ্ডল বেশ অবাক হয়েছে।

'আমি ভুল করেছিলাম। সম্পূর্ণ ভুল করেছিলাম। এবং এই ভুলের জন্য যদি জয়া অধিকারীর কিছু একটা হয়ে যায় আমি নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারব না।' আদিত্যর গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছিল।

শিকদার এবং ওয়াসিম মণ্ডল তখনও বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে।

আদিত্য বলল, 'আমি একদম নিশ্চিত যে আমার ওপর আক্রমণের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি বলে আমাকে খতম করে দেওয়া। আর দুই, পুলিশের নজর আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে জয়া অধিকারীর বাড়িতে হামলা করা। জয়া অধিকারীর ওপর এদের আলাদা করে কোনও রাগ নেই। এদের আসল উদ্দেশ্য জয়া অধিকারীর বাড়িতে যে জিনিসটা লুকোনো আছে, যেটা ফিরদৌস ওখানে লুকিয়ে রেখে গেছে, সেটি হস্তগত করা। বোধহয় জয়া অধিকারী জানে জিনিসটা ঠিক কোথায় লুকোনো আছে। তাই তার ওপর অত্যাচার হতে পারে। প্লিজ তাড়াতাড়ি চলুন।'

জয়া অধিকারীর বাড়ি যতটা তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যাবে মনে হয়েছিল ততটা তাড়াতাড়ি পৌঁছনো গেল না। একে মোটরের রাস্তাটা ঘুরপথে, তার ওপর বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। গাড়িতে না গিয়ে হেঁটে চলে গেলে বোধহয় এর থেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেত।

জয়া অধিকারীর বাড়ির রাস্তাটা অবশ্য সেই রকমই নির্জন। কাছে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির সদর দরজাটা হাট করে খোলা। ঢুকেই বসার ঘর। সেটা আদিত্য যেমন দেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। আরও ভেতরে ঢুকে একটা শোবার ঘর। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। সমস্ত আসবাব ঠিকঠাক রয়েছে। শুধু আলমারির পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। আলমারির ড্রয়ারটাও খোলা। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ড্রয়ারের মধ্যে কিছু একটা ছিল যেটা নিয়ে আততায়ী চম্পট দিয়েছে।

আর বিছানার ওপরে রক্তাক্ত, অচৈতন্য অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে জয়া অধিকারী। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। ঠোঁট ফেটে গেছে। কপালের একদিক দিয়েও রক্ত ঝরছে।

আদিত্য জয়া অধিকারীর একটা হাত তুলে নিয়ে পালসটা অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর উজ্জ্বল মুখে বলল, 'দেহে এখনও প্রাণ আছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে।'

আধঘণ্টা পরে যখন অ্যাম্বুলেন্স এসে জয়া অধিকারীকে নিয়ে চলে গেছে তখন ওয়াসিম মণ্ডল বলল, 'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। যে বা যারা এসেছিল তারা কোন দিক দিয়ে এল? বাড়ির সামনে তো সারাদিন পুলিশের পাহারা ছিল।'

'আমার বিশ্বাস একজনই এসেছিল। সে এসেছিল গঙ্গা পেরিয়ে, ফেরিঘাট হয়ে। এই বাড়িতে সে পেছন দিক দিয়ে ঢুকেছিল। তাই পুলিশ তাকে দেখতে পায়নি। বাড়িতে ঢুকে সে জয়ার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। যে মুহূর্তে জয়া বাড়িতে ঢোকে সেই মুহূর্তে সে জয়াকে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে যায়। ফিরদৌসের রেখে যাওয়া জিনিসটা কোথায় আছে জানার জন্যে সে জয়ার ওপর অত্যাচার শুরু করে। জয়া খুব বেশি অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। তাড়াতাড়ি বলে দিয়েছে জিনিসটা কোথায় আছে। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। খুব বেশিক্ষণ অত্যাচার সহ্য করতে হলে জয়া অধিকারী মরেই যেত।' কথাগুলো বলে আদিত্য সিগারেট ধরাল।

দশম পরিচ্ছেদ

১

গঙ্গার ধারে একটা নতুন রেস্টোরেন্ট হয়েছে। কিছুদিন আগে অমিতাভদের সঙ্গে আদিত্য একবার সেখানে গিয়েছিল। খাবারটা বেশ ভাল। মূলত কন্টিনেন্টাল, কয়েকটা ভারতীয় পদও পাওয়া যায়। দাম একটু বেশি, তবে নমাসে ছমাসে এলে গায়ে লাগে না। এখানকার খাবার খেয়ে পুরোনো স্কাইরুমের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, আর তখনই আদিত্য ঠিক করেছিল কেয়াকে নিয়ে একদিন এখানে আসতে হবে।

বহরমপুর থেকে ফেরার পথে আদিত্য লালগোলা ধরেছে। ট্রেনে ফিরতে ফিরতে বারবার কেয়ার কথা মনে হচ্ছিল। সম্পর্কটা আর এভাবে ভাসতে দেওয়া যায় না। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে। গতকাল সে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। তার পেশায় এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। কেয়াকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা কি ঠিক হবে? যদি ঠিক না হয় তাহলে এখনই তার উচিত কেয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা শেষ করে দেওয়া। কিন্তু তার আগে কেয়াকে নিয়ে ওই নতুন রেস্টোরেন্টটাতে যেতেই হবে।

পলাশি থেকে অনেকগুলো কলেজের ছেলেমেয়ে উঠল। ওরা আদিত্যর কাছেই বসেছে। আড়ি পেতে ওদের কথা শুনতে আদিত্যর বেশ লাগছিল। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা সামান্য কারণে প্রাণ খুলে হাসতে পারে, যেটা আদিত্য আর পারে না। কথাটা ভেবে আদিত্যর একটু বিষণ্ণও লাগছিল। ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা কৃষ্ণনগরে নেমে যেতে ট্রেনটা ফাঁকা হয়ে গেল। আর আদিত্যও ঘুমিয়ে পড়ল।

আদিত্য যখন মেসে পৌঁছল তখন খাবার ঘর দুপুরের খাওয়ার জন্য আর খোলা নেই। শেয়ালদায় নেমে আদিত্য ভেবেছিল জোরে পা চালিয়ে হাঁটলে লাঞ্চ বন্ধ হবার আগে পৌঁছে যেতে পারবে। অল্পের জন্যে সেটা হল না। আজকাল বোধহয় উইকডেগুলোতে একটু আগেই এরা দুপুরের খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে।

আদিত্যর ভাগ্য ভাল বলরামকে দেখতে পেয়ে গেল।

'টোস্ট-মামলেট নিয়ে আসতে পারবি? দুটো মাখন-মরিচ টোস্ট আর একটা ডবল ডিমের মামলেট। আর চা। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। খুব খিদে পেয়ে গেছে।'

'আমাকে একটা ফোন করে দিলে পারতে। আমি খাবার রেখে দিতাম। রাত্তিরে তো ফেরনি দেখলাম। কোথায় গেছিলে?'

'বহরমপুর গেছিলাম। শেয়ালদায় নেমে ভাবলাম ঠিক পৌঁছে যাব। আজকাল আগে আগে খাবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে কেন রে?'

'কেন আবার? ম্যানেজারবাবুর হুকুম। সকালে ভাত ডাল তরকারি বাঁচলে বিকেলে চালিয়ে দেওয়া যায়। যা পুকুর চুরি চলছে।'

'তুই আগে খাবারটা নিয়ে আয়। খেয়ে নিয়ে তারপর চান করতে ঢুকব।'

আদিত্য ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ফ্যান চালিয়ে বসল। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বিছানায় লম্বা হল। ঘড়িটা দেখে নিয়ে কেয়ার ফোনটা লাগাল। কেয়ার ইস্কুলে এখন টিফিন চলার কথা।

'কলকাতায় ফিরেছ?'

'ফিরেছি।'

'কখন ফিরলে?'

'এই কিছুক্ষণ আগে। মেসে ফিরে ফোন করছি।'

'লাঞ্চ খেয়েছ?'

'মেসে ফিরে দেখলাম লাঞ্চ বন্ধ হয়ে গেছে। বলরামকে টোস্ট-অমলেট আনতে দিয়েছি।'

'টোস্ট-অমলেট খেলে পেট ভরে? সকালে কটায় বেরিয়েছ?'

'বেশ ভোরে বেরিয়েছি। শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে। শোনো, আজ সন্ধেবেলা দেখা করতে পারবে? আজ তো বুধবার, তোমার টিউশানি নেই।'

কেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দ্বিধা-জড়ানো গলায় বলল, 'আমাদের ইস্কুলের শকুন্তলাদির সঙ্গে আজ একটু সিটি সেন্টারে যাব বলেছিলাম। অনেকদিন ধরে বলে রেখেছে। কাল আর পরশু তো সন্ধেবেলা পড়ানো আছে। শনিবার দেখা করবে?'

'ঠিক আছে। শনিবারই দেখা হবে তাহলে। যদি বেঁচে থাকি।'

'ও আবার কী কথা? হঠাৎ কী হয়েছে তোমার?'

আদিত্য বলতে চেয়েছিল, 'কেয়া, কাল আমি একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। তাই তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

কিন্তু সেসব না বলে সে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি। এমনি মজা করে বললাম। তুমি আজ ঘুরে এস। শনিবার দেখা হবে। তার আগে ফোন করে নেব।'

আদিত্য ফোন কেটে দিয়ে দেখল বলরাম খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিমল ফোন করল খাওয়া শেষ হবার আরও মিনিট পনেরো বাদে।

'তুমি এখন কোথায়?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে লেগে আছি স্যার। উনি আজ আবার সিঙ্গুরের ওই বাড়িটায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ছিল। একটু আগে একটা সুটকেস নিয়ে আবার ওই হোটেলটায় এসেছিলেন।'

'কত বড় সুটকেস?'

'কালো রঙের বড় একটা সুটকেস। ওই যেরকম সুটকেস নিয়ে লোকে বেড়াতে যায়।'

'তারপর?'

'আমি বাইরে ভাড়া গাড়িটায় বসে অপেক্ষা করলাম। উনি কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। এবার কিন্তু হাতে সেই সুটকেসটা আর নেই।'

'তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে উনি বিভিন্ন জায়গায় রকমারি ব্যাগ-সুটকেস পৌঁছে দেবার কাজ নিয়েছেন।'

'তাই হবে স্যার। আমি তো তাই দেখছি।'

'শোনো, তুমি লোকটাকে চোখে চোখে রাখ। তারপর আমাকে রাত্তিরের দিকে ফোন কোরো।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'তুমি কাজ থেকে কতদিনের ছুটি নিয়েছ?'

'আপাতত তিনদিনের ছুটি নিয়েছি স্যার। কাল পর্যন্ত ছুটিতে আছি।'

'ঠিক আছে। হয়তো কালই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। নাহলে আর বড় জোর দু-তিন দিন। তাহলে রাত্তিরে আমাকে ফোন কোরো, কেমন?'

বিমলের ফোনটা কেটে দিয়ে এবার গৌতমকে ফোন করল আদিত্য। প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথা বলল। একটা যুদ্ধের ছক তৈরি হচ্ছে। কাল থেকে যুদ্ধ শুরু হবে।

'এই হেমন্তটা শোন। খুব রেয়ার। নিখিল ব্যানার্জী, বাহাদুর খান ডুয়েট। ১৯৬১ সালে বেনারসে বাজিয়েছিল। হেমন্ত-এর পরে মানঝ খাম্বাজ। ইউ-টিউবে খানিকটা আছে। পুরোটা নেই। বহু কষ্টে এক বন্ধুর

পরিচিতের কাছ থেকে পুরোটা জোগাড় করেছি। ভদ্রলোকের বাড়ি বেনারসে। বিএইচইউ-তে ইতিহাস পড়ান। এই পিসটা ওর বাবার কালেকশান থেকে উদ্ধার করলাম।' অমিতাভর গলায় প্রবল উৎসাহ। 'এরপর রবিশঙ্করের দুটো হেমন্ত শোনাব। একটা আরলি ফিফটিস আর একটা সিক্সটিসের মাঝামাঝি। শুনলেই দুটোর মধ্যে তফাতটা বুঝতে পারবি।'

কেয়ার সঙ্গে দেখা হল না বলে আদিত্যর মেজাজটা খারাপ হয়ে ছিল। মন ভাল করতে অমিতাভদের বাড়ি চলে এসেছে। ভালই হল। সন্ধেটা আড্ডা দিয়ে গান শুনে কেটে যাবে।

'এই আদিত্য। তুই কিন্তু রাত্তিরে খেয়ে যাবি।' রত্না রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল।

নিখিল ব্যানার্জী খরজের তারে সুর লাগিয়েছেন। বাহাদুর খাঁ তার ওপরের সপ্তকে সঙ্গ দিচ্ছেন।

'আমাকে আজ তাড়াতাড়ি উঠতে হবে রে। কাল সকালে কাজ আছে।' আদিত্য গলা তুলে বলল।

'ঠিক আছে। নটার মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ ধরে বাজনা চলছে। অমিতাভ, আদিত্য দুজনেই চুপ করে শুনছে। হঠাৎ একটা দরকারি কথা মনে পড়ে যাওয়াতে অমিতাভ বলে উঠল, 'দাঁড়া। তোকে একটা কথা বলার ছিল। এখনই বলে দিই। পরে ভুলে যাব। বাজনাটা একটু বন্ধ করছি। আদিত্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। খুব দরকারি কথা না হলে তো অমিতাভ বাজনা থামায় না।

'সেদিন তোর সঙ্গে আমার পুরোনো বন্ধু নীলাদ্রির আলাপ করিয়ে দিলাম মনে আছে?' অমিতাভ বাজনাটা পজে দিতে দিতে বলল।

'হ্যাঁ, মনে আছে। তার কী হয়েছে?'

'তার কিছু হয়নি, সে বহাল তবিয়তেই আছে। কিন্তু তার ছাত্র, শুভঙ্কর সামন্ত বলে সেই বর্ধমানের ডাক্তার, সে হঠাৎ রুগি, হাসপাতাল সব ফেলে উধাও হয়ে গেছে। তুই তার সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই সে উধাও। শুভঙ্কর ওই অঞ্চলের খুব নির্ভরযোগ্য একজন বাচ্চাদের ডাক্তার। খুব দুর্মুখ, কিন্তু ভাল ডাক্তার বলে সকলেই সেসব মেনে নেয়। সে হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা খুব বিপদে পড়ে গেছে। নীলাদ্রিই তো তোকে তার কাছে পাঠিয়েছিল। তুই কি তাকে কিছু বলেচিস যাতে সে ভয় পেয়ে যেতে পারে? নীলাদ্রি খুব উতলা হয়ে আমাকে ফোন করেছিল।'

'আরে না না। আমি তাকে তেমন কিছু বলিনি। বরং সে-ই আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে বলেছিল। আসলে আমি তো শুভঙ্কর সামন্তকে সাহায্য করতেই গিয়েছিলাম। লোকটা সেটা বুঝতেই চাইল না। ওর বাবার দু-নম্বরি টাকায় ও একটা নার্সিং হোম বানাচ্ছে। ওর হাবেভাবে মনে হল, টাকাটা কোথা থেকে আসছে সেটা নিয়ে ওর কোনও মাথাব্যথা নেই। যেহেতু নার্সিং হোম বানানোর উদ্দেশ্যটা মহৎ তাই টাকার সোর্সটা নিয়ে ভাবতে ও রাজি নয়। কিন্তু এন্ড দিয়ে তো মিনস জাসটিফাই করা যায় না। সেটাই ওকে বলতে গেছিলাম, কিন্তু ও এমন তেড়ে উঠল যে আমারও রাগ হয়ে গেল। আমি ওকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে চলে এলাম। এখন তুই বলছিস লোকটা গা ঢাকা দিয়ে আছে। তার মানে হয় লোকটা খুব ভিতু আর না হয় গভীর কোনও গণ্ডগোলের সঙ্গে ওর যোগ আছে। যাই হোক, মনে হচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যে এই কেসটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। তখন ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তর আসল চেহারাটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। তুই এইটুকু তোর বন্ধুকে বলে দিতে পারিস।'

অমিতাভ আবার বাজনাটা চালিয়ে দিয়েছে। হেমন্ত-এর আলাপ-জোড়-ঝালা শেষ হয়ে সবে মানঝ খাম্বাজ শুরু হয়েছে এমন সময় গৌতমের ফোন।

'লোকটা নিজে এসে হোটেল থেকে ওটা কালেক্ট করে নিয়েছে। আজ রাত্তিরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। কাল কিন্তু তোকে আমি সকাল সকাল তুলে নেব।'

'এই একটু পরেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ছি।' আদিত্য বলার সাহস পেল না সে এখন অমিতাভদের বাড়িতে।

রাত্তিরে আদিত্য যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রায় এগারোটা বাজে। বাড়িতে ঢোকার ঠিক আগে বিমল ফোন করল।

'লোকটা একজন মহিলাকে নিয়ে বাইপাসে একটা পাঁচতারা হোটেলে এসেছিল স্যার। বোধহয় ওর বান্ধবী। একটু আগে বান্ধবীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে লোকটা বাড়ি ফিরে গেছে।'

'ঠিক আছে। তুমি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।'

২

এত সকালে আদিত্য কখনও লালবাজারে আসেনি। গৌতম তাকে নিয়ে যখন লালবাজারে ঢুকল তখন সবে ছটা বেজেছে। গৌতমের ঘরের সামনে একজন বেয়ারা অত সকালেও বসেছিল। সম্ভবত সে জানত সাহেব সকাল সকাল আসবে। গৌতম তাকে দেখতে পেয়ে আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি, না কফি?' তারপর নিজেই বলল, 'এখন কফিই হোক। ঘুমটা কাটবে। পরে চা খাব।'

গৌতমের ঘরের একদিকে বেশ আরামদায়ক একটা সোফা সেট আছে। গৌতম বলল, 'তুই আরাম করে সোফায় বোস। আমি আমার টেবিলে বসে কয়েকটা ফাইল দেখে নিই। কাল বিকেলেই ফাইলগুলো ছেড়ে দেবার কথা ছিল, হয়ে ওঠেনি।'

আদিত্য বসে বসে ভাবছিল। এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের করণীয় আর কিছু নেই। সিঙ্গুরের সেই বাড়িটায় পুলিশ রেড করতে গেছে। বাড়িটা চিনিয়ে দেবার জন্য বিমল গেছে পুলিশের সঙ্গে। তারা যখন লালবাজারে ঢুকছিল তখন খবর এল পুলিশ সদ্য সিঙ্গুরে পৌঁছেচে। কফি এল। তার সঙ্গে চারটে খবর কাগজ। আদিত্য একটা ইংরেজি কাগজ তুলে হেডলাইনগুলোতে চোখ বোলাচ্ছে এমন সময় গৌতম তার কফির কাপটা নিয়ে সোফায় এসে বসল।

'মালিনী কেমন আছে রে? অনেকদিন দেখা হয়নি।'

'এমনিতে ঠিকঠাকই আছে, তবে কাজের খুব চাপ। আজকাল কর্পোরেট সেক্টরের মতো সরকারি চাকরিতেও টার্গেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুখে থাকা শক্ত।'

'মেয়ের তো এইট হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। বুঝতে পারি আজকাল মেয়ের নিজস্ব জগৎ হয়েছে। আমরা সেখানে ঢুকতেই পারি না।' গৌতমের গলাটা বিষণ্ণ শোনাল।

গৌতমের ফোনটা বেজে উঠেছে। গৌতম ফোনটা রিসিভ করে স্পিকার মোডে দিয়ে দিল যাতে আদিত্যও শুনতে পায়।

'সিঙ্গুর থেকে ইন্সপেক্টার প্রদীপ রাহা বলছি স্যার। আমি এখানে চার্জে আছি।'

'হ্যাঁ, বলুন কী হল?' গৌতমের গলায় উৎকণ্ঠা।

'অপরেশন শেষ হয়ে গেছে স্যার। বাবলু মণ্ডল ক্যাপচার্ড হয়েছে। তবে সিরিয়াসলি ইনজিয়োর্ড। বাঁচার আশা কম। তিন চারটে জায়গায় গুলি লেগেছে। প্রফিউস ব্লিডিং হচ্ছে। আমরা ওকে যত তাড়াতাড়ি পারি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমাদের কেউ জখম হয়নি তো?'

'হয়েছে স্যার। দুজন এ এস আই জখম হয়েছে। রাণা বাগ আর সলমন আলি। তার মধ্যে সলমনের আঘাতটা বেশ সিরিয়াস। পাঁজরায় গুলি লেগেছে স্যার। হার্টে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত। আমরা ওদের দুজনকেও হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। এই বাবলু মণ্ডল ভীষণ খতরনাক ক্রিমিনাল স্যার। পুলিশ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ওপেন করেছে। অত তাড়াতাড়ি বন্দুক বার করবে বুঝতে পারিনি। রাণা আর সলমন সামনে ছিল, তাই জখম হয়েছে।'

'বাড়িটা থেকে কিছু পাওয়া গেল?'

'প্রচুর ক্যাশ পাওয়া গেছে স্যার। এখনও কাউন্ট করা হয়নি, তবে ওপর ওপর দেখে মনে হল ষাট-সত্তর লাখ হবে। চারটে ফায়ার আর্ম পাওয়া গেছে। দুটো চাইনিজ নাইন এম এম পিস্তল, একটা টেলিস্কোপ লাগানো জার্মান রাইফেল আর একটা দিশি ওয়ান শটার। আর তিনটে মোবাইল পাওয়া গেছে।'

'ভেরি গুড। আপনার অপারেশন সাকসেসফুল। কনগ্র্যাচুলেশনস।'

'থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার।'

'ঠিক আছে। আপনারা আহতদের নিয়ে হাসপাতালে যান। ওখানে পৌঁছে একটা খবর দেবেন।'

'স্যার।'

ফোনের কানেকশনটা অফ করে গৌতম আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ি?'

'আরও দুটো খবর আসা তো বাকি রয়ে গেল।' আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল, 'চল, বেরিয়েই পড়ি। পথে যেতে যেতে মনে হয় খবর এসে যাবে। সব থেকে টাফ অপরেশনটাই তো হয়ে গেল। আমি ভাবিনি এত সহজে হয়ে যাবে।'

গৌতমের গাড়িটা যখন এসপ্লানেড পেরোচ্ছে শিকদারের ফোন এল।

'জাহাঙ্গির খান অ্যারেস্টেড হয়েছে স্যার। একটু রেজিস্ট করছিল। তবে লোকটা সত্যিই ইনভ্যালিড। তাই কোনও অসুবিধে হয়নি। আমরা ওকে নিয়ে লালবাজারে আসছি।'

'ওকে। ওয়েল ডান। চলে আসুন।'

গৌতম ফোনটা পকেটে পুরে আদিত্যকে জাহাঙ্গির খান অ্যারেস্ট হবার খবরটা সবে দিয়েছে, আবার ফোন এল। এবার ইন্সপেকটার চাকি। গৌতম ফোনটাকে স্পিকার মোডে দিয়ে দিয়েছে।

'অ্যারেস্ট হয়ে গেছে স্যার। কোনও ঝামেলা করেনি। শুধু বারবার বলছে, আমি নির্দোষ। আমাকে মিছিমিছি আপনারা হ্যারাস করছেন।'

'ঠিক আছে, আপনি ওকে নিয়ে লালবাজারে চলে আসুন। আমরা একটু পরে পৌঁছচ্ছি। ওর মোবাইলগুলো সিজ করেছেন তো?'

'করেছি স্যার। দুটো মোবাইল পাওয়া গেছে।'

'ঠিক আছে। চলে আসুন।'

সোয়া সাতটা নাগাদ আদিত্য আর গৌতমকে নিয়ে গৌতমের গাড়িটা বটুকবাবুর গেটের সামনে দাঁড়াল। পেছনে আর একটা পুলিশের গাড়ি, তাতে দুজন মহিলা পুলিশও আছে।

আদিত্য লক্ষ করল আজও বি এম ডাবলুটা জায়গায় নেই, শুধু হন্ডা অ্যাকর্ডটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই উর্দিপরা বেয়ারাটাই দরজা খুলল। অতগুলো পুলিশ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

'বটুকবাবুকে খবর দাও। বাড়ি সার্চ করা হবে।'

খবর দিতে হল না। বটুকবাবু নিজেই নিচে নেমে এসেছেন। তাঁর পেছন পেছন সুমনা ঘোষাল।

'মিঃ সত্যজিৎ সামন্ত, আপনার বাড়ি সার্চ করা হবে। আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে।' গৌতম পুলিশি গাম্ভীর্য নিয়ে বলল। 'আমি অ্যাডিশানাল পুলিশ কমিশানার গৌতম দাশগুপ্ত আর ইনি আমার বন্ধু আদিত্য মজুমদার, কুমুদিনীর কেসটাতে আমাদের সাহায্য করছেন। আদিত্যর সঙ্গে বোধহয় আপনাদের আগেই পরিচয় হয়েছে।'

'আপনারা কিছুদিন আগেই তো সার্চ করলেন। কিছুই তখন পাওয়া যায়নি। আবার কেন সার্চ করবেন? পুলিশ কিন্তু বারবার এইভাবে নিরপরাধ নাগরিকদের উত্যক্ত করতে পারে না।' বটুকবাবুর গলায় অসীম বিরক্তি। সেটা আসল না বানানো বোঝা গেল না।

'আপনি নিরপরাধ কিনা ভবিষ্যৎ বিচার করবে। আপাতত আমাদের কাজ করতে দিন। আমার অফিসাররা যতক্ষণ বাড়িটা সার্চ করবে ততক্ষণ আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে এখানে বসছি। আপনাদের দু-জনের সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে। আপনারা দুজনেও প্লিজ বসুন।' কথাগুলো বলে গৌতম বসে পড়ল। তার দেখাদেখি আদিত্যও।

একটু ইতস্তত করে বটুকবাবু বসল বটে কিন্তু সুমনা ঘোষাল দাঁড়িয়েই রইল। কয়েকবার অনুরোধ করেও তাকে বসানো গেল না। সুমনা ঘোষালের মুখে পরিষ্কার একটা আশঙ্কা ফুটে উঠেছে।

'মিঃ সামন্ত, আপনাকে প্রথমেই জানাই কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্য আমরা সমাধান করে ফেলেছি। এই কঠিন কাজটা অবশ্য মূলত করেছে আমার বন্ধু আদিত্য মজুমদার। আমরা তাকে সাধ্যমত সাহায্য করেছি। আমরা ঠিক কী জানতে পেরেছি সেটা আমরা আপনাদের জানাতে চাই। সেটা জানলে আপনারা বুঝতে পারবেন কেন আবার আমরা আপনার বাড়িটা সার্চ করতে এসেছি।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি বলছেন, কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্য আপনারা সমাধান করে ফেলেছেন। রহস্যটা কী সেটা প্রথমে বোঝা দরকার। আমি একটা ফিনানশিয়াল কম্পানি চালাই। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই পুলিশ এসে আমার অফিস সিল করে দিল। আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিল। আমাকে এবং আমার অফিসারদের ধরে নিয়ে গেল। কেন এরকম করল, সেটাই তো আমার কাছে সব থেকে বড় রহস্য। এই রহস্যের উত্তর কি আপনারা দেবেন?'

'নিশ্চয় দেব, বটুকবাবু। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কয়েকটা রহস্যের উত্তর আমাদের পেতে হবে। জাহাঙ্গির খানের পাঠানো কুড়ি কোটি টাকা কোথায় গেল? জাহাঙ্গির খান হঠাৎ ইউ এস ডলারে টাকাটা পাঠাল কেন? নাকি জাহাঙ্গির খান আসলে কোনও টাকাই পাঠায়নি? আপনার কর্মচারি ফিরদৌস রহমানকে কে খুন করল? কেন খুন করল? গোবিন্দ রায়কেই বা কে খুন করল? আপনি হয়তো জানেন না, আপনার অফিসের লুকোনো সেফ থেকে পুলিশ এক কোটি টাকা ক্যাশ উদ্ধার করেছে। টাকাটা ওখানে কে রাখল? ইন ফ্যাক্ট, আপনার ক্লায়েন্ট পিটার অরোরার নাইটক্লাবে পল্লবী বলে যে মেয়েটি কাজ করত তার খুন হওয়ার সঙ্গেও কুমুদিনী রহস্যের গভীর যোগ আছে। অতএব সেই রহস্যটাও ভেদ করা দরকার। আর একটা প্রশ্ন। মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানি আপনাদের মারফত কোটি কোটি টাকা লেনদেন করত কেন? অন্য কোনও কম্পানি তো তার ধারেকাছেও লেনদেন করত না। সৌভাগ্যবশত, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই আমরা পেয়েছি। একটাই প্যাটার্ন। একটাই গল্প। সেটা বুঝতে পারলে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আপনি ও শ্রীমতী ঘোষাল একটু মন দিয়ে শুনুন। গল্পটা আদিত্য আপনাদের বলবে।' গৌতম থামল। আদিত্যর দিকে তাকাল। বটুক সামন্ত নিশ্চুপ। সুমনা ঘোষাল বটুকবাবুর পাশে বসে পড়েছে।

'আপনাদের গল্প শোনার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। চল মিতুল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি। আপনাদের কাজ হয়ে গেলে দয়া করে আমাদের জানাবেন।' বটুকবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমরা আপনাদের গল্প শোনার জন্য বাধ্য করতে পারি না। তবে একটা কৌতূহল হচ্ছে। বটুকবাবু আপনার বি এম ডাবলু গাড়িটা কোথায় গেল? ওটাকে কিছুদিন হল দেখছি না।' আদিত্য ঠান্ডা গলায় বলল।

'ওটা বিক্রি করে দিয়েছি। আমার ব্যবসাপত্র তো আপনারা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার সংসার চলবে কী করে?' বটুকবাবুর গলায় তিক্ততা।

'গাড়িটার যা দাম আপনার সংসার চালাতে অত টাকা লাগার কথা নয়। আমাদের খবর, কোনও কারণে আপনার হঠাৎ অনেক টাকার দরকার হয়েছিল এবং সেই জন্য আপনি গাড়িটা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। একই কারণে শুভঙ্কর সামন্তর নার্সিং হোম তৈরির জন্যেও কিছুদিন যাবত আপনি টাকা দিতে পারছিলেন না।'

'আপনারা তো সবই জানেন দেখছি। তাহলে আর আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?' বটুকবাবু বেশ রেগে গেছেন।

'ওই একটু মিলিয়ে নিচ্ছিলাম আর কি।' গৌতম ঠাট্টার সুরে বলল।

'শুনুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য নই। আগে আমি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলব। চল মিতুল, আমরা ওপরে যাই। আপনাদের সার্চ করা হয়ে গেলে দয়া করে আমাদের জানাবেন।'

বটুকবাবু সুমনা ঘোষালকে নিয়ে ওপরে উঠে যাবার পর আদিত্য আর গৌতম চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। গৌতমের সঙ্গীরা বাড়ি তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজি করছে।

আদিত্য সিগারেট ধরিয়েছে। গৌতম বলল, 'আমাকে একটা দে। ভীষণ টেনশান হচ্ছে। জিনিসটা না পাওয়া গেলে কিন্তু কোনও কেস দাঁড়াবে না।'

প্রায় পৌনে দু-ঘণ্টা কেটে গেল। সার্চ পার্টির লোকজন নিচে নেমে এসেছে। ক্রমাগত সিগারেট টেনে আদিত্যর অসুস্থ লাগছে। মাথা নিচু করে বসে আছে গৌতম।

সুমনা ঘোষালকে নিয়ে বটুকবাবু আবার নিচে নেমে এসেছেন। মুখে মুচকি মুচকি বিজয়ীর হাসি।

'এত খোঁজাখুঁজি করেও তো কিছু পেলেন না। এবার তাহলে আপনারা আসুন, না কী? আমরা স্নান খাওয়া-দাওয়া করি। ব্যবসার কাজে আমাকে একটু বেরোতেও হবে।' বটুকবাবু গৌতমের দিকে তাকিয়ে মোলায়েম গলায় বললেন।

গৌতম আদিত্যর দিকে তাকাল। আদিত্য বটুকবাবুর কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বটুকবাবুকে বলল, 'বটুকবাবু, আপনি কি জানেন আপনার ছেলেকে পুলিশ অ্যারেস্ট রেখেছে। আপনি খবর পেয়েছেন কি?'

'শুভঙ্করকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে? কখন? আজ সকালেই তো ওর সঙ্গে কথা হল। শুভঙ্করকে পুলিশ হঠাৎ অ্যারেস্ট করবে কেন?' বটুকবাবুকে একই সঙ্গে বিভ্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন দেখাল।

'না, না। ডাঃ শুভঙ্কর সামন্তকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেনি। পুলিশ জানেও না তিনি কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছেন। জানতে চায়ও না। কিন্তু উনি ছাড়া আপনার আরও তো ছেলে আছে, বটুকবাবু?'

কথাটা বলে আদিত্য আড়চোখে সুমনা ঘোষালের দিকে তাকাল। সুমনা বটুকবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

'শুভঙ্কর ছাড়া আমার আর কোনও ছেলে নেই। শুভঙ্কর আমার একমাত্র সন্তান।' বটুকবাবু দৃঢ় গলায় বললেন।

আদিত্য দেখল সুমনার চোখে বিদ্যুৎ জমা হচ্ছে।

'আমাদের কাছে কিন্তু খবর আছে আপনার আর একটি ছেলে আছে। কিন্তু যেহেতু সে আপনার বৈধ স্ত্রীর সন্তান নয়, আপনি তার পিতৃত্ব কোনও দিনই স্বীকার করেননি।'

'আপনার খবর ভুল। মিথ্যে। একটা ডাহা মিথ্যে দিয়ে আমাকে আপনারা ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।' বটুকবাবুর গলাটা সপ্তমে চড়ে গেছে। 'আপনারা এবার যান। দয়া করে যান। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।' বটুকবাবুর গলা তার সপ্তকে। উত্তেজনায় তিনি দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

'আমার খবরটা কিন্তু একেবারে পাকা।' আদিত্য নিচু গলায় বলল।

'না। পাকা নয়। মিথ্যে। মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যে।' বটুকবাবু হিস্টিরিক হয়ে গেছেন।

'মিথ্যে হবে কেন? আপনাদের খবরটা একেবারে সত্যি। একশোভাগ সত্যি। আর কতদিন সত্যিটাকে লুকিয়ে রাখবে? তোমার মতো কাপুরুষ, ইতর মানুষ আর দুটো দেখলাম না।' সুমনা ঘোষালের গলাও চড়ে গেছে। তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বটুক সামন্ত হতভম্ভ হয়ে গেছে।

আগুনঝরা দৃষ্টি নিয়ে বটুক সামন্ত আর সুমনা ঘোষাল পরস্পরের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে রইল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সুমনা আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা শুধু বাড়ির ভেতরটা দেখছেন কেন? বাইরেটাও দেখুন।'

বটুক সামন্তকে বাড়ির ভিতরে রেখে আদিত্য আর গৌতম বাইরে বেরিয়ে এল।

'আমরা এখানে আসার পর বাড়ি থেকে কেউ বেরোয়নি তো?' আদিত্য একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা কাউকে বেরোতে দিইনি স্যার। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার বেরোতে চেয়েছিল। বলল তেল ভরতে যাবে। আমরা তাকেও বেরোতে দিইনি।' পুলিশ অফিসারটি সসম্ভ্রমে জানাল।

'গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার বেরোতে চেয়েছিল? আগে জানাননি কেন?' আদিত্যর গলায় উত্তেজনা। গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটা সার্চ করতে হবে।'

ড্রাইভার গাড়িতেই বসেছিল। তাকে বেরিয়ে আসতে বলল আদিত্য। তারপর পার্শ্ববর্তী পুলিশটিকে বলল, 'সিটগুলো তুলে দেখুন, কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

সিট তুলে কিছুই পাওয়া গেল না। ডিকিতেও কিছু নেই। বনেট খুলে দেখা গেল সেখানেও কিছু নেই।

ড্রাইভারটা বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য পুলিশটিকে বলল, 'গাড়ির তলায় ঢুকে একটু দেখবেন, কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পুলিশটি গাড়ির তলায় ঢুকে গেল। যখন সে বেরোল তার পিঠে কাদার ছাপ, মুখে গ্রিজের কালি, কিন্তু হাতে দুটো মাঝারি সাইজের কালো বাক্সের মতো জিনিস রয়েছে। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় ডেস্কটপ কম্পিউটারের দুটি হার্ড ডিস্ক।

'গাড়ির নিচে সেলোটেপ দিয়ে লাগানো ছিল স্যার।' পুলিশটি ঈষৎ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

একটু পরে, খবর পেয়ে সুমনা সহ বটুক সামন্ত যখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে, গৌতম পুলিশি গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, 'আমাদের সার্চ শেষ হয়েছে। যা খুঁজছিলাম আমরা পেয়ে গেছি। আমরা এবার যাব। তবে বটুকবাবু, আমাদের সঙ্গে আপনাকেও লালবাজার যেতে হবে। আর সুমনা দেবী, আপনাকেও।'

'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমি আদালত থেকে জামিন পেয়েছি।' বটুক সামন্ত উদ্ধতভাবে বলল।

'ভুলিনি, বটুকবাবু। মোটেই ভুলিনি। আর তাই নতুন করে আদালত থেকে আপনার গ্রেপ্তারের অনুমতি করিয়ে এনেছি।' গৌতম ঠান্ডা গলায় বলল।

'কিন্তু আমাকে কেন আপনাদের সঙ্গে যেতে হবে? আমি কী করলাম?' সুমনা ঘোষাল নিরীহভাবে বলল।

'আপনি বটুকবাবুর ব্যাবসাপত্রের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানেন। তাই আপনাকেও আমাদের দরকার। আপনাকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্টও আমাদের আছে।' গৌতম ঠান্ডা গলায় জানাল।

৩

'আমরা একেবারে অন্ধকারে রয়েছি স্যার। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। আমাদের একটু খুলে বলবেন কেসটার ব্যাপারে কীভাবে আপনি এগোচ্ছেন? কাকে সন্দেহ করছেন? সবটা ডিটেলে জানতে চাই স্যার।' সাব-ইন্সপেক্টার চাকি ছেলেমানুষের মতো আবদারে গলায় বলল।

গৌতমের অফিস-সংলগ্ন যে মিটিং রুমটা আছে সেখানে আদিত্য, গৌতম, শিকদার, মুখুটি, প্রদীপ রাহা এবং চাকি ছাড়াও আরও কয়েকজন অফিসার জমায়েত হয়েছে। উপপত্নী সমেত বটুকবাবু গ্রেপ্তার হবার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে।

'কুমুদিনীর কেসটা আমি মোটামুটি সলভ করে ফেলেছি।' আদিত্য বলতে শুরু করল। 'যে উপাখ্যানটা আমি বিভিন্ন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছি তাতে কিছু অনুমানও আছে। তবে সেগুলো এলোপাথাড়ি অনুমান নয়, বলা যায় এডুকেটেড গেস। কুমুদিনী বিত্ত নিগম রহস্য বুঝতে গেলে কুমুদিনীর আসল বিজনেস মডেলটা দিয়ে শুরু করতে হবে। ওপর ওপর কুমুদিনী শেয়ার কেনাবেচার দালালি করত। আর একটু তলায় তলায় লোকের দুনম্বরি টাকা সিনেমা-যাত্রা-নাইট ক্লাবে খাটানোর ব্যবস্থা করে দিত। কিন্তু কুমুদিনীর আসল ব্যবসাটা এই দুটোর কোনওটাই ছিল না। বটুক সামন্তর মূল ব্যবসাটা আমরা প্রথমে ধরতে পারিনি। তারপর একদিন চাকি আমাকে বলল, মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট নামে একটা কম্পানি কুমুদিনী

মারফত শেয়ার বাজারে কোটি-কোটি টাকা খাটায়। ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক মনে হল। চাকি আর আমি মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানিতে গিয়ে দেখলাম একেবারে হতশ্রী একটা অফিস। দেখে মনে হয় না এরা কোটি-কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে। কম্পানির মালিকের ঠিকানা জোগাড় করে সেখানেও হানা দেওয়া হল। আস্তে আস্তে জানা গেল কুমুদিনীর আসল ব্যবসা উগ্রপন্থীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়া। কিছুদিন ধরে যে ব্যবস্থাটা চালু ছিল সেটা এইরকম। টাকাটা ইউ এস ডলারে বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে প্রথমে জাহাঙ্গির খানের কাছে আসত। হয়তো জাহাঙ্গিরের বাংলাদেশে বিড়ি রপ্তানির নেটওয়ার্কটা কোনওভাবে ব্যবহার করা হত। জাহাঙ্গির সেই ডলারটা পাঠিয়ে দিত বটুক সামন্তর কাছে। বটুক সামন্তর কাছ থেকে মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানি ডলারটা নিয়ে তাই দিয়ে ড্রাগ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বেআইনি জিনিসপত্র আমদানি করত। বলাই বাহুল্য, এই জিনিসগুলো কিনতে হত হার্ড ক্যাশ অর্থাৎ ডলার দিয়ে। তাই তাদের ডলারের দরকার হত। ডলারের বদলে সমান মূল্যের টাকা উগ্রপন্থীদের অ্যাকাউন্টে মহাদেব কম্পানি ট্রান্সফার করে দিত। এই উগ্রপন্থীরা ভারতে অপরেট করে। তাই তাদের দরকার ইন্ডিয়ান রুপি। পুরো ডিলটা থেকে কুমুদিনী যে টাকাটা পেত সেটা মহাদেব কম্পানির হয়ে শেয়ার কেনাবেচার কমিশন হিসেবে কুমুদিনীর খাতায় দেখানো হত। বলাই বাহুল্য, এসব ডিল থেকে জাহাঙ্গিরও একটা মোটা টাকা পেত।

'উগ্রপন্থীদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো মাঝেমাঝেই বদলে যেত। কোন অ্যাকাউন্টে কত টাকা পাঠাতে হবে তার একটা মাস্টার লিস্ট থাকত বটুকবাবুর ঘরের দুটো কম্পিউটারের মধ্যে। এই কম্পিউটার দুটোর মধ্যে কুমুদিনীর অন্যান্য জায়গায় খাটানো টাকার হিসেবও থাকত। মানে সিনেমা-যাত্রা-নাইট ক্লাব জাতীয় প্রকল্পে যে টাকাটা খাটত তার হিসেব। যেহেতু এই টাকারও অনেকটা দু-নম্বরি টাকা, বটুকবাবু নিজের কম্পিউটারে এই হিসেবটাও রাখতেন, অন্য কাউকে বিশ্বাস করতেন না।

'সব কিছুই বেশ ভাল চলছিল। লালবাজারে ছিল বটুকবাবুর অর্থভুক এক পুলিশ। পুলিশের দিক থেকে যাতে কোনও ঝামেলা-টামেলা না হয়, সেটা সে দেখত। পুরো ব্যবসাটার কথা জানত ঠিক তিনজন। বটুক সামন্ত, তার একান্ত বিশ্বাসী কর্মচারী ফিরদৌস রহমান আর বটুকবাবুর অর্থভুক সেই পুলিশ। আগে ডলার ঢুকত অন্য একটা চ্যানেলে। সেই চ্যানেলটায় কিছু একটা সমস্যা দেখা দেওয়ার ফলে একটা বিকল্পের দরকার হয়েছিল। ফিরদৌসই তখন জাহাঙ্গিরের সঙ্গে বটুকের আলাপ করিয়ে দেয়। ফিরদৌসকে বটুক সামন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত।

'জাহাঙ্গির খানও কিন্তু বটুক সামন্তর আসল ব্যবসার ব্যাপারটা পরিষ্কার জানত না। তাকে সেটা জানানো হয়নি। জানানোর দরকারও ছিল না। বস্তুত, এসব ব্যাপার যত কম লোক জানে তত ভাল। জাহাঙ্গির শুধু জানত কিছু বেআইনি ডলার বাংলাদেশ থেকে তার হাতে এসে পৌঁছলে তাকে সেই টাকা বটুক সামন্তর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কাজটা আদৌ শক্ত নয়। কিন্তু কাজ হয়ে গেলে মোটা টাকা তার ঘরে আসবে। সে সেই মতো কাজ করে ভাল টাকা কামাচ্ছিল।'

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। অফিসারদের জন্য কাগজের কাপে, অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেব এবং তাঁর বন্ধু আদিত্য মজুমদারের জন্য ফাইন চায়নার পেয়ালা-পিরিচে। পুলিশের মধ্যে এটুকু হায়ারারকি থাকবেই।

চিনি-দুধ দেওয়া চা, চমৎকার ফ্লেভার। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আদিত্যর মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল, ব্রিটিশ আমলের 'পুক্কা সাহিব'রা দুধ-চিনি দিয়েই দার্জিলিং চা পছন্দ করত।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল, হঠাৎ দিল্লি থেকে নির্দেশ এল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেআইনি ফিনান্স কম্পানিগুলোর ওপর ক্র্যাক ডাউন করতে হবে। কুমুদিনী অবশ্য ঠিক ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ফিনান্স কম্পানি নয়, তার ব্যবসা অনেক দিনের, কিন্তু ব্যবসাটা যে বেআইনি তাতে তো সন্দেহ নেই। তাই অন্যান্য কম্পানির সঙ্গে সঙ্গে কুমুদিনীও পুলিশ রেড-এর কোপে পড়ল। কুমুদিনী রেড হবে এই খবরটা বটুক সামন্তর কাছে পৌঁছল

একেবারে শেষ মুহূর্তে, যেদিন সকালে রেড হবে তার আগের রাত্তিরে। দুর্ভাগ্যবশত, কুমুদিনীর বেতনভুক পুলিশটি এর আগে খবরটা পায়নি, তাই বটুককেও জানাতে পারেনি।

'খবরটা শুনে বটুকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আগেই বলেছি, বটুকের ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তার ঘরের দুটো কম্পিউটারে থাকত। সেসব তথ্য পুলিশের হাতে পড়লে সমূহ সর্বনাশ। রেড হবার আগে এই কম্পিউটার দুটোর হার্ড ডিস্কগুলো খুলে বার করে নেবার সময় ছিল না। অত রাত্তিরে কম্পিউটার মেকানিক কোথায় পাওয়া যাবে? তাছাড়া হার্ড ডিস্ক ছাড়া দুটো কম্পিউটার পড়ে রয়েছে দেখতে পেলে পুলিশও সন্দেহ করবে। তাই রেড হবার আগের রাত্তিরে, সিপিইউ, মনিটার, কিপ্যাড সব সমেত কম্পিউটার দুটো একটা নীল ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরদৌস হাওয়া হয়ে গেল। বটুকবাবুই একটা গাড়িতে তুলে তাকে বিদায় করে দিলেন। ঠিক হল, অজ্ঞাতবাসের একটা নির্ভরযোগ্য আস্তানা খুঁজে নিয়ে সে পরে বটুকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। পরের দিন বেলা বারোটা নাগাদ সিতারা হোটেলে ফিরদৌস চেক ইন করল। সম্ভবত যুৎসই একটা আস্তানা খুঁজে পেতে তার একটু সময় লেগে গিয়েছিল।'

'এই নীল ব্যাগের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটার কথা ভাল করে বল।' গৌতম এতক্ষণ পরে মুখ খুলেছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নীল ব্যাগের প্রসঙ্গ বারবার আসবে। তাই জানিয়ে রাখি গত ক্রিসমাসে কুমুদিনী তার ক্লায়েন্টদের এবং কিছু কিছু কর্মচারীকে একটা করে বড় নীল ব্যাগ গিফট দিয়েছিল। অন্যদের মতো জাহাঙ্গির খানও ওইরকম একটা ব্যাগ উপহার পেয়েছিল, ফিরদৌসও পেয়েছিল। ব্যাগগুলো সব এক রকম দেখতে। ওই নীল ব্যাগটা করেই রেড হবার আগের দিন ফিরদৌসের হাত দিয়ে জাহাঙ্গির খান কুড়ি কোটি টাকা পাঠিয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট, ব্যাগটা টাকা ক্যারি করার কাজেই লাগত। যেদিন জাহাঙ্গির খানের লোক আমাকে হালিশহরে নিয়ে যেতে এসেছিল সেদিনও ব্যাগটা তাদের সঙ্গে ছিল। আমাকে জাহাঙ্গিরের ম্যানেজার তারক দাস বলেছিল কলকাতা থেকে কালেক্ট করা কিছু পেমেন্ট তারা ব্যাগটাতে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে, ব্যাগটা আমি দেখেছি। জাহাঙ্গির খানের কুড়ি কোটি টাকা পাঠানোর প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত বলি, সকলকে দেবার পরেও একটা ব্যাগ বেঁচে গিয়েছিল। সেটা কুমুদিনীর আপিসেই পড়েছিল। ফিরদৌস সেই ব্যাগটা করেই কম্পিউটার দুটো নিয়ে যায়।'

জানলায় চিৎপুর। ট্রাম। দুপুরে বাসগুলো কিছুটা ফাঁকা। রোদ্দুরে শহরটা ঝলসে যাচ্ছে। ঘরের ভেতর এসি চলছে বলে বাইরের গরমটা টের পাওয়া যায় না। চায়ের কাপের তলানিটা মুখে ঢেলে দিয়ে আদিত্য আবার শুরু করল।

'বটুকের সঙ্গে ফিরদৌসের একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হয়েছিল। যতদিন না পুলিশের ঝামেলা পুরোপুরি চুকে যায় ততদিন তারা পরস্পরকে ফোন করবে না। বটুক ধরে নিয়েছিল কুমুদিনী রেড হবার পর তার ফোন পুলিশ ট্যাপ করবে। তাই ফোনে গোপন কোনও কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সরাসরি ফোনে কথা না হোক, যোগাযোগ তো একটা রাখতেই হবে। অন্তত দুটো জিনিস বটুকের জানা দরকার। এক, জানতে হবে ফিরদৌস কোথায় গিয়ে লুকোল। দুই, জানতে হবে, হার্ড ডিস্ক দুটো কম্পিউটার থেকে বার করা গেল কিনা। কার মাধ্যমে বটুক ফিরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে? অর্থভুক পুলিশটি জানাল তার মাধ্যমে এই কাজ সম্ভব নয়। তার পক্ষে এই কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব বটুক, ফিরদৌস এবং অর্থভুক পুলিশ এই তিনজন ছাড়াও চতুর্থ এক ব্যক্তিকে বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসা হল, যার মাধ্যমে ফিরদৌস বটুক সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এই ব্যক্তিকে বটুকের ব্যবসার খানিকটা জানাতেই হল।'

'এই চতুর্থ ব্যক্তিটি কে সেটা কি জানতে পেরেছেন?' চাকি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'পেরেছি। তার কথায় একটু পরেই আসছি। আগে দেখা যাক ফিরদৌসের কী হল। সিতারা হোটেলে পৌঁছে ফিরদৌসের প্রথম কাজ হল দুটো কম্পিউটার থেকে দুটো হার্ড ডিস্ক বার করার ব্যবস্থা করা। কাজটা সে নিজে পারবে না। তার জানা একজন বিশ্বাসী কম্পিউটার মেকানিক আছে যে কাজটা পারবে। কিন্তু তার

ফোন নম্বরটা ফিরদৌসের কাছে নেই। সে স্ত্রীকে ফোন করে মেকানিকের নম্বরটা চেয়ে নিল। এটা তার স্ত্রী আমাকে বলেছে। মেকানিকের নাম জয়দেব। আমি জয়দেবের ফোন নম্বরটা ফিরদৌসের স্ত্রীর কাছ থেকে জোগাড় করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম সে ফিরদৌসের কথা মতো হোটেল সিতারায় এসে দুটো কম্পিউটার সমেত ব্যাগটা তার দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দুটো হার্ড ডিস্ক বার করে হোটেল সিতারায় ফিরদৌসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। ফিরদৌস তাকে কম্পিউটারের বাকি অংশগুলো রেখে দিতে বলেছিল। তাই সে সেগুলো রেখে দিয়েছে। কিন্তু যে ব্যাগটা করে সে কম্পিউটার দু-টো নিয়ে এসেছিল সেটা সে ফিরদৌসকে ফেরত দিয়েছিল। বস্তুত ওই ব্যাগটা করেই সে হার্ড ডিস্ক দুটো সিতারা হোটেলে ফেরত নিয়ে গিয়েছিল। হার্ড ডিস্ক দুটো পাবার পর ফিরদৌস সেগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছিল। আমরা তাই ব্যাগটা ফাঁকা দেখেছিলাম।

'হার্ড ডিস্ক দুটো ফিরদৌস কোথায় সরিয়ে রেখেছিল?' সোমেন মুখুটি প্রশ্ন করল।

'একটা ডিস্ক সে তার কলিগ গোবিন্দ রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। আর একটা সে তার ছোটবেলার সুইটহার্ট জয়া অধিকারীর বাড়িতে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। গোবিন্দ রায় যে ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেটা সিতারা হোটেলের সিসি টিভিতে ধরা পড়েছে। জয়া অধিকারীর কাছ থেকেও আমি জানতে পেরেছিলাম খুন হবার কয়েক দিন আগে ফিরদৌস তার বাড়িতে এসেছিল। যে কোনও কারণেই হোক, ফিরদৌস ডিস্ক দুটো নিজের কাছে রাখতে ভরসা পাচ্ছিল না।'

'তাও ফিরদৌস খুন হয়ে গেল?' এবার শিকদারের গলা।

'ডিস্ক দুটোর জন্যেই যে ফিরদৌসকে প্রাণ হারাতে হল তাতে সন্দেহ নেই। এবার ফিরদৌস কেন খুন হল তার উত্তরে আসি। যে চতুর্থ ব্যক্তিটিকে বটুক সামন্ত বিশ্বাস করে ফিরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগের ভার দিয়েছিল, সে কিন্তু বটুকের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। বস্তুত, সে ঠিক করল এই হার্ড ডিস্ক দিয়েই বটুককে পথে বসাবে। বটুকের ওপর তার অনেক দিনের রাগ ছিল যেটা বটুক আদৌ টের পায়নি। পূর্ব-পরিকল্পনা মতো ফিরদৌস তাকে ফোন করে জানাল সে সিতারা হোটেলে লুকিয়ে আছে এবং হার্ড ডিস্ক দুটো কম্পিউটার থেকে বার করা গেছে। বলল, খবরটা যেন বটুকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি কিন্তু ফিরদৌসের কথাটা স্রেফ চেপে গিয়ে বটুককে বলল, ফিরদৌস ফোন করে বলছে পঞ্চাশ কোটি টাকা না পেলে সে হার্ড ডিস্ক দুটো পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বটুককে সে একটা চিঠিও পাঠাল যাতে একই কথা লেখা আছে।

'এই ব্যক্তির কিন্তু ফিরদৌসের ওপর আলাদা করে কোনও রাগ ছিল না। তবে সে জানত বটুকের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গেলে হার্ড ডিস্ক দুটো তার হাতে আসা দরকার। তার জন্য অবশ্য যদি ফিরদৌসকে খুন করতে হয়, তার আপত্তি নেই। সে ফিরদৌসকে খুন করে হার্ড ডিস্ক দুটো হাতানোর জন্যে একজন কুখ্যাত সুপারি কিলারকে নিযুক্ত করল। এই সুপারি কিলারের নাম বাবলু মণ্ডল। সিতারা হোটেলের সিসি টিভি ফুটেজ থেকে আমরা জানতে পেরেছি বাবলু মণ্ডল এক্রামুল হক নাম নিয়ে সিতারা হোটেলে চেক ইন করে।'

'অনেকগুলো খুনের মামলায় বাবলু মণ্ডলকে পুলিশ খুঁজছিল। অবশেষে সিঙ্গুরের কাছে একটা বাড়িতে তাকে পাওয়া গেছে। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে বাবলু মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশেরও দুজন জখম হয়েছে, তার মধ্যে একজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।' গৌতম গম্ভীর গলায় বলল।

'ফিরদৌসের খুন হওয়ার ব্যাপারটা একটু ডিটেলে বলবেন স্যার? আমরা তো সিতারা হোটেলে একসঙ্গে ইনভেস্টিগেট করলাম। তাই ডিটেলে জানতে ইচ্ছে করছে ঠিক কীভাবে ফিরদৌস খুন হয়েছিল।' চাকি আদিত্যকে বলল।

'বলছি। সেটাই বলছি। যে বাবলু মণ্ডলকে নিযুক্ত করেছিল, সে জানত ফিরদৌস কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। সেই জায়গাটা, অর্থাৎ সিতারা হোটেলটা, সে বাবলু মণ্ডলকে দেখিয়ে দিয়েছিল। সে নিজে চেনায়নি। তার

একজন সহযোগী ছিল, সে চিনিয়ে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, তার পরেই এক্রামুল হক নাম নিয়ে বাবলু মণ্ডল সিতারা হোটেলে গিয়ে ওঠে। সে একজন পাকা খুনি। ফিরদৌসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিতে তার খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। দুজনের বন্ধুত্ব ভালই জমেছিল, অন্তত রমেশ বেয়ারার কথা শুনে তাই মনে হয়। আমার ধারণা, ঘটনার দিন রাত্তির এগারোটা নাগাদ গালে চাপদাড়ি লাগিয়ে দিলীপ সাক্সেনা নামে বাবলু মণ্ডল সিতারা হোটেলে আবার নতুন করে চেক ইন করে। রিসেপশনটা আধো-অন্ধকার ছিল বলে রিসেপশনের ছেলেটা তাকে চিনতে পারেনি। রাত্তির হয়ে গিয়েছিল বলে তাকে কোনও আইডিও দেখাতে হয়নি। নিজের ঘরে গিয়ে সে ইন্টারকম দিয়ে ফিরদৌসকে ফোন করে বলে সে এক্রামুল বলছে। তার অসম্ভব মাথা ধরেছে। ফিরদৌস কি তাকে একটা মাথা ধরা কমানোর ওষুধ দিতে পারে? সম্ভবত সে আগে থেকেই কথায় কথায় জেনে নিয়েছিল ফিরদৌসের কাছে মাথা ধরার ওষুধ সব সময় মজুত থাকে। মাথা ধরাটা আমি আন্দাজে বলছি। এটা মাথা ধরার জায়গায় অম্বলও হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা একই। যাই হোক, ফিরদৌস তাকে তার ঘরে চলে আসতে বলে। বাবলু মণ্ডল, ওরফে দিলীপ সাক্সেনা লিফট দিয়ে উঠে তারপর দাড়ি খুলে রেখে এক্রামুল হক সেজে ফিরদৌসের ঘরে গিয়ে তাকে যন্ত্রণা দিয়ে খুন করে। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ফিরদৌসের কাছ থেকে হার্ড ডিস্ক দুটো হাতানো। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফিরদৌস হার্ড ডিস্ক দুটো অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলেছিল। আগেই বলেছি, একটা ডিস্ক সে তার কলিগ গোবিন্দ রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। আর একটা সে তার ছোটবেলার বান্ধবী জয়া অধিকারীর বাড়িতে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। ডিস্কগুলো যে ফিরদৌসের কাছে নেই সেকথা আততায়ী বিশ্বাস করেনি। হয়তো কথা বার করার জন্যে সে ফিরদৌসকে আরও খানিকক্ষণ যন্ত্রণা দিত কিন্তু ফিরদৌস যখন আহত অবস্থায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিজের বন্দুকের কাছে প্রায় পৌঁছে গেল তখন তাকে মেরে ফেলা ছাড়া আততায়ীর আর কোনও উপায় রইল না। মনে হয়, ফিরদৌসের কাছেও যে বন্দুক থাকতে পারে সেটা আততায়ী আন্দাজ করতে পারেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় সে শেষ গুলিটা ফিরদৌসের বুকে করে।

'এখানে তিনটে জিনিস লক্ষ করতে হবে। এক, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ফিরদৌস বলে দিয়েছিল ডিস্ক গোবিন্দ রায়ের কাছে আছে যে কারণে পরে ওই বাবলু মণ্ডলের হাতেই গোবিন্দ খুন হয়। সে প্রসঙ্গে পরে বিশদে আসব। কিন্তু জয়ার কথা ফিরদৌস বলেনি। বললে জয়া এতদিন বেঁচে থাকত না। দুই, ফিরদৌসের সঙ্গে এক্রামুল সব সময় ইন্টারকমে কথাবার্তা বলেছে। তাই ফিরদৌসের মোবাইল থেকে এক্রামুলের কোনও হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এবং এই কারণেই খুনি ফিরদৌসকে খুন করে তার মোবাইল দুটো ফেলে রেখে গিয়েছিল। তিন, ফিরদৌসকে খুন করার পর এক্রামুল দিলীপ সাক্সেনা সেজে লিফট দিয়ে নেমে নিজের ঘরে ফিরে গেল। সিসি টিভি দেখে আমাদের মনে হল দিলীপ সাক্সেনা ফিরদৌসকে খুন করে লিফট দিয়ে নেমে গেল। আমরা ধরে নিলাম সে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সিকিউরিটি হলফ করে বলল সে কাউকে বাইরে যেতে দেখেনি। আমরা ভাবলাম সিকিউরিটি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। আসলে সে সত্যি কথাই বলছিল। সে সত্যিই কাউকে বেরোতে দেখেনি। খুন করার পর নিজের পুরোনো ঘরে গিয়ে বাবলু মণ্ডল ওরফে এক্রামুল আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল। পুলিশ যখন হন্যে হয়ে দিলীপ সাক্সেনাকে খুঁজছে তখন বাবলু মণ্ডল সম্ভবত আরাম করে ঘুমোচ্ছে।'

'কিন্তু বাবলু মণ্ডলকে কে নিযুক্ত করেছিল?' মুখুটি আবার জিজ্ঞেস করল। সে আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না।

'বলছি, বলছি। কিন্তু ধাপে ধাপে না এগোলে বোঝা যাবে না কেন আমরা তাকে অপরাধী মনে করছি।' আদিত্য মুখুটির দিকে তাকিয়ে বলল। 'আপাতত পরের খুন, অর্থাৎ গোবিন্দ রায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। গোবিন্দ তার মৃত্যুর আগের দিন আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল তার কাছে একটা কিছু আছে যেটা সে পুলিশের একেবারে বড় কর্তার হাতে তুলে দিতে চায়। আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তার কাছে খবর ছিল পুলিশের একটা অংশ তার শত্রুদের হয়ে কাজ করছে, যদিও কে তার শত্রু

সেটা সে বলেনি। এখন আমরা জানতে পেরেছি জিনিসটা আর কিছু নয়, দুটো হার্ড ডিস্কের একটা, যেটা সে ফিরদোসের কাছ থেকে পেয়েছিল। আসলে, দুটো ডিস্ক একসঙ্গে না মেলালে উগ্রপন্থীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো জানা সম্ভব ছিল না। একটা ডিস্কে আলাদা আলাদা ফাইলে অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলো ছিল। কিন্তু ফাইলগুলো খোলার জন্যে যে পাসওয়ার্ডগুলো দরকার, সেগুলো ছিল অন্য ডিস্কটাতে। অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট নাম্বারের ফাইল এবং ফাইল খোলার পাসওয়ার্ড আলাদা দুটো কম্পিউটারে থাকত। ফিরদৌস হয়তো ভেবেছিল শুধু একটা ডিস্ক নিয়ে গোবিন্দ খুব বেশি কিছু করতে পারবে না। তাই সাহস করে সে একটা ডিস্ক গোবিন্দর হাতে তুলে দিয়েছিল। অবশ্য গোবিন্দ এত কথা জানত বলে মনে হয় না। সে শুধু এইটুকু জানত যে কিছু লোকের কাছে এই ডিস্কের মূল্য অপরিসীম, তাই এই ডিস্কের জন্যে সে খুন হয়ে যেতে পারে।

'গোবিন্দ যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তার সঙ্গে একটা ব্যাকপ্যাক ছিল। আমি নিশ্চিত, সেই ব্যাকপ্যাকে ডিস্কটা নিয়ে সে ঘুরছিল। ওটা হোটেলে রেখে আসার ঝুঁকি তার নেবার কথা নয়। সে খুন হবার পর, বলাই বাহুল্য, ব্যাকপ্যাক সহ ডিস্কটা উধাও হয়ে যায়। খুনি কীভাবে জানলা দিয়ে গোবিন্দর ঘরে ঢুকেছিল সেটাও আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। খুনটা যে একজন পেশাদার খুনি করেছে সেটাও বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না খুনি বা খুনিকে যে নিযুক্ত করেছে সে গোবিন্দর গোপন ডেরার সন্ধান পেল কী করে?'

'আর এক প্রস্ত চা বলা যাক।' গৌতম বেল বাজিয়ে তার বেয়ারাকে ডাকল। তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই বলে যা। গল্প ভীষণ জমে গেছে। এখন থামা যাবে না।'

'গোবিন্দ রায় আমার কাছ থেকে একটা খবর জানতে পেরেছিল যেটা সে আগে জানত না। সে জানতে পেরেছিল পল্লবী ভদ্র খুন হয়েছে। খবরটা তাকে খুবই বিচলিত করেছিল। কারণ পল্লবীকে সে বেশ ভালই চিনত। পল্লবীর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডকেও চিনত। পিটার অরোরার সঙ্গে সম্পর্ক হবার আগে পল্লবী মাঝে মাঝে বুটল্যাগারের কাজ নিয়ে কুমুদিনীতে আসত। মনে হয় তখনই গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে তার পরিচয়। তার প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডও নানা কাজে কুমুদিনীতে আসত। হয়তো কখনও কখনও পল্লবী তার বয়ফ্রেন্ডকে সঙ্গে নিয়েই কুমুদিনীতে আসত। গোবিন্দ পল্লবীর ব্যাপারটা ভাল করে জানার জন্যে পল্লবীর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করে। পল্লবীর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডকে গোবিন্দ এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করেনি। তাই তার হোটেলের হদিশও তাকে বলে দিয়েছিল। বিষণ্ণ এই ছেলেটিকে গোবিন্দর ভাল লাগত। তার মনে হত ছেলেটির প্রতি পল্লবী অন্যায় করেছে। আমরা জানতে পেরেছি, সুমনা ঘোষাল আমাদের জানিয়েছেন, পল্লবীর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড ছিল তার ছেলে রণপ্রিয় ঘোষাল। অর্থাৎ রণপ্রিয় ঘোষালকেই গোবিন্দ তার হোটেলের ঠিকানাটা জানিয়েছিল। রনি বলেছিল গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। রনি ঘোষালই গোবিন্দ রায়ের ঠিকানাটা বাবলু মণ্ডলকে জানিয়ে দেয়, কারণ সুমনা ঘোষালের পাপকর্মের সহযোগী ছিল তার নিজের ছেলে, রণপ্রিয় ঘোষাল। আর যে চতুর্থ ব্যক্তির কথা একটু আগে বলছিলাম, যার মাধ্যমে বটুক ঠিক করেছিল ফিরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, সে আর কেউ নয়, সুমনা ঘোষাল। সুমনা ঘোষাল আর তার ছেলে মিলে বাবলু মণ্ডলকে নিযুক্ত করেছিল ফিরদৌসকে খুন করে ডিস্ক দুটো উদ্ধার করার জন্য।'

ঘরে নীরবতা। এতটাই যে একটা আলপিন পড়লেও শোনা যাবে। আদিত্য একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল।

'একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, যে চতুর্থ ব্যক্তির কাছে বটুক সামন্ত তার গোপন ব্যবসার কথা কিছুটা প্রকাশ করেছিল সেই ব্যক্তি সুমনা ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। সুমনা বটুকের কাছের মানুষ, তার সঙ্গে বটুকের রোজ দেখা হচ্ছে। ফলে গোপন কোনও তথ্য বটুকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সুমনাই আইডিয়াল। তাছাড়া বটুক ধরে নিয়েছিল সুমনার ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু বটুক জানত না সুমনা আর তার ছেলে তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। কেন সেটা বলছি। বটুক এবং সুমনা দুজনেরই যখন অল্প বয়েস সে সময় তাদের প্রথম সম্পর্ক হয়। সেই সম্পর্কের ফলে সুমনার যে সন্তান হয়, তার নাম রণপ্রিয়

ঘোষাল। রনি আসলে বটুকেরই ছেলে। কিন্তু বটুক সেই পিতৃত্ব অস্বীকার করে। সেই সময় সম্ভবত বটুক ছাড়াও আরও দু-একজনের সঙ্গে সুমনার বন্ধুত্ব ছিল, তাই বটুকের মনে হয়েছিল সে আগ বাড়িয়ে কেন সুমনার সন্তানের দায়িত্ব নিতে যাবে? সুমনা কিন্তু জানত কে তার ছেলের বাবা, তাই এটা নিয়ে তার মনে বিপুল অভিমান জমে ছিল। সে দু-একবার নিশ্চয় বটুক সামন্তকে রনির পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতে পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু বটুক সামন্ত রাজি হয়নি। এর পর কিছুদিনের জন্য সুমনা ঘোষাল মুম্বাই চলে গেল, বটুক-সুমনার সম্পর্কে ছেদ পড়ল। বেশ কয়েক বছর পরে যখন তাদের আবার দেখা হল, আস্তে আস্তে একটা সম্পর্কও তৈরি হল, তখন বটুক সামন্ত সুমনার ছেলের কথা প্রায় ভুলেই গেছে। সুমনার যেহেতু আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না সে বটুক সামন্তর সঙ্গে থাকতে শুরু করল। কিন্তু পুরোনো অপমানের কথা সে এক দিনের জন্যেও ভোলেনি। বটুকের প্রতি তার ঘৃণা সে একটু একটু করে তার ছেলে রনির মধ্যেও ভাল মতন চারিয়ে দিতে পেরেছিল। কিন্তু সুমনা যে তাকে এতটা ঘৃণা করে সেটা বটুক সামন্ত ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি। উলটে সে তার রক্ষিতা সুমনা ঘোষালকে পুরোপুরি বিশ্বাস করত। ফলে, ফিরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তাকেই বেছে নিয়েছিল।

'ফিরদৌস এবং হার্ড ডিস্ক দুটোর কথা জানার পর সুমনা সেই সব কথা তার ছেলেকে জানাল। দুজনে মিলে বটুক সামন্তকে সর্বস্বান্ত করার প্ল্যান তৈরি করল। এমনিতে তো আর বটুক সুমনার ছেলেকে কিছু দেবে না, তাই বাঁকা পথই নিতে হবে। বস্তুত, একটা পঁচিশ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের নমিনি হওয়া ছাড়া রনির কপালে আর কিছুই জোটেনি। হয়তো বটুক সামন্ত ভাবত সে সারা জীবন তার আইনসিদ্ধ স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি অবিচার করে এসেছে। তাই তার যা আছে সে তার আইনসিদ্ধ ছেলে শুভঙ্কর সামন্তকেই দিয়ে যেতে চেয়েছিল। আবার বলছি, বটুক যদি জানত সুমনার মনে বটুকের প্রতি পাহাড় প্রমাণ ক্ষোভ এবং ঘৃণা জমে আছে, তাহলে নিশ্চয় বটুক তার উপপত্নীকে এতটা বিশ্বাস করত না। সুমনাও কখনও তার পাহাড় প্রমাণ ঘৃণার কথা বটুককে টের পেতে দেয়নি। এ থেকে মনে হয় সুমনা একজন উঁচুদরের অভিনেত্রী ছিল।'

'তুই কী করে বুঝতে পারলি বটুক সামন্তই রনির বাবা?' গৌতম প্রশ্ন করল।

'পুরোপুরি বুঝিনি, তবে সন্দেহ করেছিলাম। রনিকে অনেকটাই তার মার মতো দেখতে, বটুক সামন্তর সঙ্গে তার চেহারায় খুব একটা মিল নেই। কিন্তু রনির কণ্ঠস্বর অবিকল বটুক সামন্তর মতো। এটা আমি রনির সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপেই খেয়াল করেছিলাম। তাছাড়া বটুক সামন্ত যে শুভঙ্করকে সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস করেছে এ-ব্যাপারে সুমনা ঘোষাল আমার সামনেই একদিন বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেছিল। এখন অবশ্য সুমনা ঘোষাল পরিষ্কার করে পুলিশকে বলে দিয়েছে যে রনি বটুক সামন্তরই ছেলে।'

'পল্লবী ভদ্রের খুনটা কি তাহলে আলাদা একটা ঘটনা? ওটার সঙ্গে কি কুমুদিনী মামলার কোনও সম্পর্কই নেই?' চাকি ঈষৎ চিন্তান্বিত গলায় প্রশ্ন করল। 'আমি তো ভাবলাম পল্লবী ভদ্রকে খুন করার জন্যেই আমরা রনিকে অ্যারেস্ট করলাম। ও অবশ্য বলছিল ও ইনোসেন্ট। ওকে মিছিমিছি হ্যারাস করা হচ্ছে।'

'না, না। রনি একেবারেই ইনোসেন্ট নয়। পল্লবীকে ও নিজের হাতে খুন করেছে। পল্লবী ওকে ছেড়ে পয়সার লোভে পিটার অরোরার রক্ষিতা হয়ে যাওয়াটা, বলাই বাহুল্য, রনি পছন্দ করেনি। কিন্তু শুধু সেইটুকু কারণে ও পল্লবীকে খুন করত না। পল্লবীকে ও খুন করে এক কোটি টাকার জন্য। খুন করার আগে ও পল্লবীকে টর্চার করেছিল। হয়তো টাকাটা কোথায় আছে জানার জন্যে। হয়তো নিছক ঘৃণা এবং আক্রোশবশত। কিন্তু টাকাটা রনির খুব দরকার ছিল। ওই টাকা দিয়েই বাবলু মণ্ডলকে হায়ার করেছিল রনি এবং সুমনা। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী বাবলু মণ্ডল বেশ এক্সপেনসিভ। আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না বাবলু মণ্ডলের টাকাটা সুমনা ঘোষালরা জোগাড় করল কোথা থেকে। তারপর একদিন টিভিতে পল্লবী ভদ্রর খুন হওয়ার খবরটা চোখে পড়ল। পরে গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম পিটার অরোরা তার জুয়ার আড্ডার জন্য কুমুদিনীতে টাকা ভাঙাতে এসেছিল। সে এনেছিল পঞ্চাশ বান্ডিল দু-হাজার টাকার নোট, অর্থাৎ এক কোটি টাকা। সেই টাকাটা আমরা বটুক সামন্তর লুকোনো দেয়াল আলমারিতে খুঁজে

পেয়েছিলাম। পঞ্চাশ বান্ডিল দু-হাজার টাকার নোটের বদলে বটুক সামন্ত তাকে দুশো বান্ডিল পাঁচশো টাকার নোট দিয়েছিল। এই রকম কিছু সার্ভিস কুমুদিনী তার ক্লায়েন্টদের দিত।

'ভাঙানো টাকাটা নিয়ে পিটার পল্লবীর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে সে তিন দিন কাটায়। তারপর তাকে সন্ধেবেলা দিল্লির ফ্লাইট ধরতে হয়েছিল। দিল্লি যাবার আগে সে টাকাটা পল্লবীর বাড়িতে রেখে যায়। পিটার অরোরা যে কুমুদিনী থেকে টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে সেটা বটুক সামন্ত মারফত সুমনা জানত। ফলে রনিও ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। তিন দিন পল্লবীর সঙ্গে কাটিয়ে পিটার দিল্লি চলে গেছে এটা সম্ভবত পল্লবীই রনিকে জানিয়েছিল। পল্লবীর এক পুরুষে মন উঠত না। পিটার শহরে না থাকলে সে রনিকে ডেকে নিত। যদিও রনির আর একজন বান্ধবী ছিল মাঝে মাঝে পল্লবীর সঙ্গে রাত্তির কাটাতে সম্ভবত রনিরও মন্দ লাগত না। পিটার যে রাত্তিরে দিল্লি চলে গেল সেই রাত্তিরেও রনিকে পল্লবী ডেকেছিল। কিংবা সম্ভবত রনিই পল্লবীর কাছ থেকে সেই রাত্তিরের জন্যে একটা নেমন্তন্ন আদায় করে নিয়েছিল। সে আন্দাজ করেছিল টাকাটা পল্লবীর বাড়িতেই আছে। পল্লবীকে খুন করে সে টাকাটা নিয়ে চলে যায়। যেহেতু বাড়িতে সিসি টিভি ছিল না আর সিকিউরিটি ছেলেটিও একটা উড়ো ফোন পেয়ে দেশের বাড়ি চলে গিয়েছিল, তাই পল্লবীর বাড়িতে ঢোকার সময় রনিকে কেউ দেখতে পায়নি। উড়ো ফোনটা মনে হয় রনিই করেছিল। অনুমান করছি, কোনও কারণ দেখিয়ে ফোন নম্বরটা রনি পল্লবীর কাছ থেকেই জোগাড় করেছিল। রনি যে মাঝে মাঝে পল্লবীর বাড়িতে রাত কাটাত সেটা সিকিউরিটি ছেলেটা আমাদের বলেছে। রনিকে ছবিতে দেখে চিনতে পেরেছে সে। রনির সঙ্গে পল্লবীর আর কোনও সম্পর্ক নেই, এটা তার মা মিথ্যে বলেছিল।'

'রনি তাহলে পল্লবীকে মারার প্ল্যান করেই তার বাড়িতে গিয়েছিল?' চাকি জিজ্ঞেস করল।

'আমার তো তাই মনে হয়। বটুক সামন্তর হার্ড ডিস্ক নিয়ে ফিরদৌস লুকিয়ে রয়েছে এই খবরটা জানার দিন তিনেক পরে পল্লবীর বাড়িতে রনি রাত কাটাতে যায়। ইতিমধ্যে সে নিশ্চয় তার মায়ের সঙ্গে বসে ঠিক করে ফেলেছে ফিরদৌসের কাছ থেকে হার্ড ডিস্ক দুটো হাতাতে হবে। কিন্তু এই কাজটা সরাসরি তার দ্বারা হবে না। এর জন্যে প্রফেশানাল কাউকে চাই। প্রফেশানাল কাউকে ভাড়া করতে গেলে আবার অনেক টাকার দরকার। রনি যখন শুনল পল্লবীর বাড়ি থেকে এক কোটি টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে, তখন সে সেই সুযোগটা লুফে নেয়।'

'আমরা কিন্তু আসল সমস্যাটা থেকে সরে যাচ্ছি। আমাদের ভুললে চলবে না, কুড়ি কোটি টাকা উধাও হয়ে গেছে। টাকাটা কোথায় গেল সেটা কিন্তু আমরা এখনও জানতে পারলাম না।' সোমেন মুখুটি মনে করিয়ে দিল।

'ঠিক বলেছেন। এবার তাহলে কুড়ি কোটি টাকা উধাও হয়ে যাবার প্রসঙ্গে আসি। মুখুটি সাহেব প্রশ্ন করেছেন, টাকাটা কোথায় গেল? আমার উত্তর, টাকাটা যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানেই গেছে। অর্থাৎ সত্যি এটাই যে টাকাটা, থুড়ি ডলারগুলো, ফিরদৌস ঠিক সময় মতোই বটুক সামন্তর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আর প্ল্যান-মাফিক সেগুলো একটু পরে মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানির লোক এসে নিয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু জামিল আর সহদেব যে বলেছিল পথে একটা লরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে তাদের থামতে হয়েছিল। তখন ফিরদৌস একা গাড়িতে ছিল। সেই সাক্ষীর কোনও দাম নেই? সেই সময় তো ফিরদৌস টাকাটা সরিয়ে ফেলতেই পারত? ফিরদৌসের ঘরে আমরা যে ফাঁকা নীল ব্যাগটা দেখেছিলাম হয়ত সেটাতেই ডলারগুলো ছিল। এমন তো হতেই পারে, ফিরদৌসকে খুন করে খুনি সেই ডলারগুলো নিয়ে গেছে।' মুখুটি এখনও তার তত্ত্বটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

'মুখুটি সাহেব, আপনার তত্ত্বটার কয়েকটা সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যা, খুনি ডলারগুলো ব্যাগ থেকে বার করে নিয়ে ব্যাগটা ফেলে রেখে গেল কেন? এটাই তো স্বাভাবিক যে সে ব্যাগসুদ্ধু টাকা নিয়ে চম্পট দেবে। এতে শুধু পরিশ্রম নয়, সময়ও বাঁচত। দু-নম্বর সমস্যা, ব্যাগটা এতটাই বড় যে ফিরদৌসের হোটেলের ঘরে সেটা ভাল করে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই সেটা বেরিয়ে পড়ত। তাহলে

ফিরদৌসের ওপর কথা বার করার জন্যে অত্যাচার করা হল কেন? তাহলে কি খুনি অন্য কিছু খুঁজছিল? তিন নম্বর সমস্যা, ফিরদৌসের সহযোগী ঠিক কে সেটা বোঝা গেল না। নিশ্চয় শিবেন মাইতি নয়, কারণ মুখুটির থিওরি অনুযায়ী সে-ই লোক পাঠিয়ে ফিরদৌসকে খুন করিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছিল। তাই যদি হয় তাহলে সে প্রথমে টাকাটা ফেরত দেবে কেন? সে তো কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে থেকে টাকাসুদ্ধু ব্যাগটা হাতে পেয়েই চম্পট দিতে পারত। আবার ফিরদৌসের খুনি গোবিন্দ রায়ও নয়। ফিরদৌস তাকে বিশ্বাস করত। সি সি টিভির ফুটেজ থেকে আমরা জানতে পেরেছি গোবিন্দ রায় ফিরদৌসের সঙ্গে দেখা করতে একবার হোটেল সিতারাতেও এসেছিল। কিন্তু সে যদি ফিরদৌসের সঙ্গে মিলে টাকাটা চুরিই করবে তাহলে সে আমার কাছে আসবে কেন? পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে কেন?'

'আর জামিল, সহদেব আর ড্রাইভার রবির সাক্ষ্য? সেটা কি আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করব?' মুখুটি আবার মনে করিয়ে দিল।

'আমরা জানতে পেরেছি, এবং সম্ভবত আপনিও জানেন যে জামিল, সহদেব এবং রবি তিনজনেই পুরোনো ক্রিমিনাল। বিশেষ করে একটা ডাকাতি এবং খুনের মামলায় পুলিশ তিনজনকেই সন্দেহ করছিল। জাহাঙ্গির খান টাকা খরচ করে তিনজনকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচায় এবং নিজের কম্পানিতে কাজ দেয়। তাই ওই তিনজন জাহাঙ্গিরের হাতের পুতুল হয়ে ছিল। কিন্তু আমার ধারণা, এক্ষেত্রে জাহাঙ্গির নয়, পুলিশেরই কেউ, ওদের অতীতটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে, ওদের দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিইয়েছে।'

মুখুটি মাথা নামিয়ে আছে। গৌতম সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে। বটুক সামন্ত কেন জাহাঙ্গির খানকে ধারণা দিল যে ফিরদৌস টাকা চুরি করে পালিয়েছে? সে তো এর মধ্যে জাহাঙ্গির খানকে না জড়ালেই পারত।'

'অনিবার্য প্রশ্ন। আমি এর উত্তর দিচ্ছি।' আদিত্য গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল। 'বটুক সামন্ত চেয়েছিল জাহাঙ্গির খান ফিরদৌসকে খুঁজে বার করুক। যেহেতু তার ওপর পুলিশের নজর রয়েছে সে নিজে কাজটা করতে পারছিল না। কিন্তু সে তো আর বলতে পারে না ফিরদৌস দুটো হার্ড ডিস্ক নিয়ে পালিয়ে গেছে। বললে তার গোপন ব্যবসার কথাও বলতে হতো। তার বদলে সে বলল ফিরদৌস টাকা মেরে পালিয়ে গেছে। সে জানত এটা বললে জাহাঙ্গির ফিরদৌসকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবেই। সব থেকে বড় কথা, বটুক সামন্ত ভেবেছিল, পুলিশ টাকা চুরির মামলার পেছনে দৌড়লে আসল ব্যাপারটা, অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক নিয়ে ফিরদৌসের উধাও হয়ে যাবার রহস্যটা চাপা পড়ে যাবে। কুড়ি কোটি টাকা চুরি যাবার ব্যাপারটা ছিল আসলে একটা স্মোকস স্ক্রিন, যার আড়ালে বটুক তার আসল ব্যবসাটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।'

'ফিরদৌস কোথায় লুকিয়ে আছে সেটা তার স্ত্রী কি জানত?' শিকদার প্রশ্নটা করল।

'না, জানত না। ফিরদৌস যে তার অজ্ঞাতবাস থেকে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলত সেটা সত্যি। কিন্তু সে ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে সেটা তার স্ত্রীকে সে বলেনি। সম্ভবত স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্যেই বলেনি। তাছাড়া সাবিনা খাতুন কলকাতার মেয়ে নয়। জ্যাকারিয়া স্ট্রিট অঞ্চলটা সে একেবারেই চেনে না। হয়তো সেই কারণেও ফিরদৌস সাবিনাকে বলেনি সে কোথায় লুকিয়ে আছে। বললেও সাবিনা বুঝতে পারত না। কিন্তু সাবিনা ফিরদৌসকে নিশ্চয় বলেছিল জাহাঙ্গির খান তাকে টাকা চুরির দায়ে খুঁজছে, কারণ বটুক সামন্ত বলেছে সে কুড়ি কোটি টাকা পায়নি। সন্দেহ নেই, এটা শুনে ফিরদৌস আকাশ থেকে পড়ল। তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল বটুক সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা। যোগাযোগ করে বটুককে বলা, সে তো নিজের হাতে বটুকের হাতে টাকাটা পৌঁছে দিয়েছে। তাহলে বটুক টাকাটা পায়নি বলছে কেন? এরকম কখনও আগে তো হয়নি। কিন্তু বটুকের ফোন সম্ভবত পুলিশ ট্যাপ করছে। তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করা নিরাপদ নয়। এই অবস্থায় ফিরদৌস সুমনা ঘোষালকে ফোন করেছিল। কিন্তু তার কথাগুলো সুমনা বটুককে জানায়নি।'

'আচ্ছা, বটুক সামন্ত তো ধুরন্ধর লোক। সে তার রক্ষিতাকে একবারের জন্যেও সন্দেহ করল না কেন? অন্তত সে তো সুমনার মোবাইলটা চেক করে দেখতে পারত ফিরদৌস কোনও ফোন করেছে কিনা? গৌতম

জিজ্ঞেস করল।

'বটুক সুমনাকে সন্দেহ করেনি সেটা সুমনার অসাধারণ অভিনয়ের গুণে। আর সুমনার মোবাইলটা চেক করার দরকার হয়নি। যে দুবার ফিরদৌস সুমনাকে কল করেছিল সেই দুবারই সুমনা নিজে বটুককে তার মোবাইলটা দেখিয়ে বলেছিল ফিরদৌস তাকে কল করেছিল। ফিরদৌস সুমনাকে যে কথাগুলো বলেছিল সেটা অবশ্য সে বটুককে বলেনি। তার বদলে সে বটুককে বলেছিল ফিরদৌস ফোন করে হার্ড ডিস্ক দুটো ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে টাকা চাইছে। সুমনা ভেবেছিল, পুলিশ হয়তো তাকে করা ফিরদৌসের কলগুলো একদিন ট্রেস করতে পারবে। তাই ফিরদৌস যে তাকে কল করেছিল সেটা লুকিয়ে লাভ নেই। শুধু তার সঙ্গে ফিরদৌসের আসলে কী কথা হয়েছিল সেটা বটুক না জানতে পারলেই হল। এদিকে পুলিশের ভয়ে ফিরদৌসও মোবাইল বন্ধ রেখেছিল। তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। তাই সুমনার মুখের কথার ওপর নির্ভর করা ছাড়া বটুকের উপায় ছিল না।'

'আমাদের খুব কৌতূহল আছে স্যার আপনি কী ভাবে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।' শিকদার মৃদু গলায় জানতে চাইল।

বেয়ারা আবার চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ক্রিম ক্র্যাকার।

'একদিনে বুঝিনি। একটু একটু করে বুঝেছি। জাহাঙ্গির খানের সঙ্গে প্রথম দিন কথা বলে তার গল্পে আমি দু-একটা অসঙ্গতি লক্ষ করলাম।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করেছে। 'একটা বড় অসঙ্গতি হল, যদি দু-হাজার টাকার নোটেও কাউকে কুড়ি কোটি টাকা নিয়ে যেতে হয় তাহলে যে বিপুল পরিমাণ নোট বহন করতে হবে সেটা একটা ব্যাগে আঁটানো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া এর ওজনটাও একজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। একটু হিসেব করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। একটা দু-হাজার টাকার নোটের বান্ডিলে থাকে একশোটা নোট, মানে দু-লক্ষ টাকা। তাহলে এক হাজারটা এরকম বান্ডিল নিলে তবে কুড়ি কোটি হবে। এক হাজারটা বান্ডিল একটা ব্যাগে আঁটানো সহজ নয়। তাছাড়া, এক একটা নোটের যদি এক গ্রাম করে ওজন হয়, তাহলে এক হাজার বাণ্ডিল অর্থাৎ এক লক্ষ নোটের ওজন হচ্ছে এক লক্ষ গ্রাম, মানে একশো কিলোগ্রাম। ওয়েট লিফটার ছাড়া একশো কিলো ওজন কেউ বহন করে নিয়ে যেতে পারে না।

'আরেকটা অসঙ্গতি হল, কুমুদিনী যেরকম শর্তে ব্যবসা করে বলে জাহাঙ্গির খান বলছে, তাতে কুমুদিনীর পক্ষে লাভ করা শক্ত। বিশেষ করে এই কারণে যে, যেসব জায়গায় কুমুদিনী টাকা খাটায় সেগুলোর সব ক-টাতেই বেশ ঝুঁকি আছে। 'নিউ এজ মুভিজ'-এর কথাই ধরা যাক। ওরা যেমন হিট ছবি প্রোডিউস করেছে তেমনি প্রচুর ফ্লপ ছবিও করেছে। হিট এবং ফ্লপ ছবির অনুপাত মোটামুটি অর্ধেক-অর্ধেক। এই রকম অবস্থায়, মানে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কুমুদিনীর বিজনেস মডেলটা চলা শক্ত। আমি অঙ্ক কষে দেখেছি। সেই অঙ্কের মধ্যে আর যাচ্ছি না। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, কুমুদিনী যে ব্যবসাটা করে বলে জাহাঙ্গির খান বলছে তা ছাড়াও আরও কোনও ব্যবসা কুমুদিনীর আছে বলে আমার মনে হল। বিশেষ করে বটুক সামন্তর লাইফ-স্টাইলটা দেখার পর।

'পরে ফিরদৌসের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম টাকাটা সে ইন্ডিয়ান রুপিতে নয়, ইউ এস ডলারে নিয়ে গিয়েছিল। কুড়ি লক্ষ ইউ এস ডলার, হাওয়ালা বাজারে যার দাম কুড়ি কোটি টাকা। একশো ডলারের কুড়ি হাজারটা নোট। এক একটা নোটের এক গ্রাম করে ওজন ধরলে মোট ওজন কুড়ি কিলোগ্রাম। একশোর বান্ডিল দুশোটা। জাহাঙ্গির খানের ব্যাগে অনায়াসে এঁটে যাবে। একজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াও কঠিন নয়। জাহাঙ্গির খানও পরে আমার কাছে স্বীকার করেছিল তার পাঠানো টাকাটা ইউ এস ডলারেই ছিল। যদিও প্রথমে সে কথাটা বেমালুম চেপে গিয়েছিল।'

'কিন্তু কেন ইউ এস ডলার? সেটা কি বয়ে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্যে?' শিকদার প্রশ্ন করল।

'আপাতদৃষ্টিতে সে রকম মনে হতে পারে বটে কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে সেটা হতেই পারে না। টাকাটা যদি ভারতীয় মুদ্রায় দরকার হয় তাহলে সেটা একবার ডলারে কনভার্ট করে আবার তাকে

ভারতীয় মুদ্রায় কনভার্ট করার কোনও মানেই হয় না। বিশেষ করে যখন একটা মুদ্রা থেকে আর একটা মুদ্রায় কনভার্ট করার ঝামেলা এবং খরচ দুই-ই আছে। সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল বটুক সামন্ত ইউ এস ডলারই চেয়েছিল। ডলার নিয়ে বটুক সামন্ত কী করবে? এই প্রশ্নটার উত্তর তখনই পেলাম যখন মহাদেব এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কম্পানির কথাটা চাকি জানাল। এর সঙ্গে আরও দুটো জিনিসকে মেলালাম। ফিরদৌসের জয়দেব মেকানিককে খবর দেওয়া এবং কুমুদিনী রেড করে সন্দেহজনক কিচ্ছু না পাওয়া। যদি হালকা বেআইনি কিছু কুমুদিনীর কম্পিউটারগুলো থেকে পাওয়া যেত তাহলে হয়তো আমার সন্দেহটা হার্ড ডিস্কের দিকে যেত না।'

'স্যার, একটা কথা বুঝলাম না। আদিত্যবাবুকে মারার জন্যে না হয় বাবলু মণ্ডলই বহরমপুরের লোকাল কোনও সুপারি কিলারকে হায়ার করেছিল। কিন্তু একটা ডিস্ক যে বহরমপুরে জয়া অধিকারীর বাড়িতে লুকোনো থাকতে পারে এটা বাবলু মণ্ডল আন্দাজ করল কী করে?' গৌতমের দিকে তাকিয়ে শিকদার বলল।

'উত্তরটা আদিত্যই দিক।' গৌতম আদিত্যর দিকে ফিরল।

'আমি সুমনা ঘোষাল আর তার ছেলের জন্যে একটা ফাঁদ পেতে ছিলাম। খানিকটা দৈবক্রমে আমি জানতে পেরেছিলাম জয়া অধিকারী বলে ফিরদৌসের একজন পুরোনো প্রেমিকা আছে যার সঙ্গে তার যোগাযোগ শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। জয়া অধিকারীর বাড়িতে গিয়ে আমার মনে হল ডিস্ক লুকিয়ে রাখার পক্ষে এটা আদর্শ জায়গা। তাছাড়া খুন হবার কয়েকদিন আগে ফিরদৌস জয়া অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতেও এসেছিল। তাই ডিস্কটা ওখানে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু জয়া অধিকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সুমনা ঘোষাল বা তার ছেলের জানার কথা নয়। তাই আমি ইচ্ছে করে সুমনার উপস্থিতিতে বটুকবাবুকে জয়া অধিকারীর কথাটা জানিয়ে দিলাম। ভাবলাম, এর পর যদি জয়ার বাড়িতে হামলা হয়, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাব সুমনা এর মধ্যে আছে।

'ঠিক সেটাই হল। কিন্তু আমার আন্দাজে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম রাত্তিরের অন্ধকারে আততায়ী জয়ার বাড়ি হামলা করবে। সেটা না করে সে আমার পেছনে একজনকে লেলিয়ে দিয়ে নিজে ফেরি পার হয়ে এসে জয়ার বাড়িতে ঢুকে অপেক্ষা করছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল জয়া প্রাণে বেঁচে গেছে। না হলে আমি নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারতাম না। যাই হোক, শেষ খবর পেয়েছি, তাকে দু-একদিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।

'আমি রনি ঘোষালের পেছনে আমার সহকারি বিমল গায়েনকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। রনিকে ফলো করে বিমল সিঙ্গুরের কাছে বাবলু মণ্ডলের গোপন আস্তানার কথা জানতে পারে। রনি সেখানে বাবলু মণ্ডলকে ব্রিফকেসে করে টাকা দিয়ে এসেছিল। পরে সে জয়া অধিকারীর বাড়ি থেকে লুট করা ডিস্কটা বাবলু মণ্ডলের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল। এই ডিস্কটা এবং আগেরটা যেটা গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, দুটো ডিস্কই সে একটা কালো সুটকেসে পুরে লিন্ডসে স্ট্রিটের হোটেল ক্রসরোড-এ রেখেছিল। কলকাতার কিছু হোটেল আছে যারা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেয়। হোটেল ক্রসরোড তাদের মধ্যে একটা। সেখান থেকে বটুকবাবু ডিস্ক দুটো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। বলাই বাহুল্য, এর জন্যে বটুকবাবুকে বেশ মোটা একটা টাকা রনির বেনামি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হয়েছে। টাকা জোগাড় করতে গিয়ে বি এম ডাবলুটাও বিক্রি করে দিতে হয়েছে। চাকির প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, ডিস্ক দুটোর জন্যে মোট দশ কোটি টাকা বটুকবাবুকে দিতে হয়েছিল। এর বেশি টাকা জোগাড় করা যায়নি। রনিও সেটা বুঝতে পেরেছিল।'

আদিত্য থামল। অফিসাররা এক এক করে চলে যাচ্ছে। গৌতম মুখুটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মিনিট পনেরো পরে একবার আমার ঘরে এস।' তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ঘরে চল। ওখানেই আর একবার চা খাওয়া যাবে।'

একটু পরে নিজের চেয়ারে বসে গৌতম বলল, 'আমার নিজের এখনও দুএকটা খটকা আছে। দেখি তুই সেগুলো পরিষ্কার করতে পারিস কিনা।'

'বল। চেষ্টা করে দেখি।' আদিত্য চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

'আমার প্রথম প্রশ্ন, সুমনা একদম শেষে বটুককে ধরিয়ে দিল কেন? সে যদি আমাদের হিন্ট না দিত আমরা সম্ভবত বাইরেটা খুঁজেই দেখতাম না।'

'সুমনা এবং তার ছেলে রনি বটুকের সর্বনাশ চেয়েছিল। টাকা যা পাবার সেটা তো তাদের পাওয়া হয়েই গিয়েছিল, বটুকের কাছ থেকে আর কিছু তাদের পাবার ছিল না। এরপর বটুক দেশদ্রোহীতার দায়ে জেলে গেলে তাদের প্রতিহিংসার ষোলো কলা পূর্ণ হত। তবু বলব, সুমনা হয়তো সেদিন আমাদের আগ বাড়িয়ে সাহায্য করত না, যদি না আমি তার ভেতরের ঘৃণাটাকে উসকে দিতে পারতাম। টাকা পাবার পর হয়তো সে বটুককে ক্ষমাই করে দিত। কিন্তু হার্ড ডিস্ক দুটো খুঁজে না পেয়ে আমি মরিয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করলাম। বটুকের অবৈধ ছেলের কথা পাড়লাম। বটুকের মুখ দিয়ে বলাতে পারলাম যে শুভঙ্কর ছাড়া তার আর কোনও ছেলে নেই। এটা শুনে সুমনার পুরোনো ঘৃণা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে বটুককে ধরিয়ে দিল।'

'আর একটা প্রশ্ন। ফিরদৌস যখন সাবিনার কাছে শুনল জাহাঙ্গির খান তাকে টাকা চুরির দায়ে সন্দেহ করছে তখন সে সরাসরি জাহাঙ্গির খানকে ফোন করল না কেন?'

প্রশ্নটা শুনে আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এই প্রশ্নটা আমাকেও ভাবিয়েছে। এর একেবারে সঠিক উত্তর আমার কাছে নেই। তবে একটা আনুমানিক উত্তর দিতে পারি। আমার অনুমান, ফিরদৌস জাহাঙ্গির খানকে ফোন করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে সে নির্দোষ। তখন জাহাঙ্গির খান সম্ভবত ফিরদৌসকে প্রশ্ন করেছিল, সে যদি সত্যিই নির্দোষ হয় তাহলে সে লুকিয়ে রয়েছে কেন? এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর ফিরদৌস দিতে পারেনি। সন্তোষজনক উত্তর দিতে গেলে তাকে হার্ড ডিস্ক দুটোর কথা বলতে হত, যেটা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফিরদৌসের ওপর বটুক সামন্তর কড়া নির্দেশ ছিল কুমুদিনীর আসল ব্যবসার কথা কাউকে বলা যাবে না।'

'কিংবা হয়তো জাহাঙ্গির এই রকম একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে পারে আশঙ্কা করে ফিরদৌস তাকে ফোনই করেনি।' গৌতম চিন্তা করতে করতে বলল।

'হ্যাঁ। সেটাও হতে পারে।' আদিত্য কথা বলতে বলতে দরজার দিকে তাকাল।

বেয়ারা চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। প্রায় তার পেছন পেছন সোমেন মুখুটি।

চায়ের কাপে একটা চুমুক লাগিয়ে গৌতম মুখুটিকে বলল, 'গোবিন্দ রায় আদিত্যকে বলেছিল পুলিশের ভেতরে কিছু ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে মোল। এই মোলটি পুলিশ বিভাগের গোপন খবর বটুক সামন্তকে জানিয়ে দিত। আমাদের জানা দরকার, সেই ব্যক্তিটি কে? তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে তোমাদের আয়ের তুলনায় সঞ্চয় অযৌক্তিকভাবে বেশি। এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি শিগগির শুরু হবে। ততদিন তোমাকে সাসপেন্ডেড থাকতে হবে। তুমি কাল-পরশুর মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবে।'

আদিত্য বলল, 'মুখুটি সাহেব, আপনি আমাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, আসল মামলাটা টাকা চুরির। একটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য কেসও আপনি সাজিয়ে ফেলেছিলেন। আপনার কাজ ছিল ডিস্ক উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা। আমার তখনই আপনার ওপর সন্দেহ হয় যখন আপনি টাকা চুরির কেসটার ওপর অতটা জোর দিচ্ছিলেন। আপনার ওপর সন্দেহ হবার পর থেকেই আমি ইন্সপেক্টার শিকদারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করি। বহরমপুর যাবার সময় ওকেও চলে আসতে বলি। বহরমপুরের হোটেলে উনি সময় মতো এসে না পৌঁছলে আমি এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

মুখুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর গৌতম বলল, 'আমার আরও কিছু প্রশ্ন আছে।'

'বল, বল, কী প্রশ্ন। আমি সাধ্যমতো উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।' আদিত্য সোফায় হেলান দিয়ে বসল।

'ভাবছিলাম, জাহাঙ্গির খানকে যে মহিলা ফোনে বলেছিলেন কুমুদিনীতে কুড়ি লক্ষ ডলার এসে পৌঁছয়নি, তিনি কি সুমনা ঘোষাল?'

'অবশ্যই। তিনি ছাড়া আর কে হবে? বটুক তাকে বলে রেখেছিল জাহাঙ্গির ফোন করলে তাকে বলে দিতে যে টাকা পৌঁছয়নি। এক্ষেত্রে সুমনা বটুকের অবাধ্য হয়নি। অবাধ্য হবার কোনও কারণ ছিল না।'

'আমার পরের প্রশ্ন, রনি ঘোষাল বাবলু মণ্ডলের মতো ক্রিমিনালের সঙ্গে যোগাযোগ করল কী ভাবে?'

'এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর আমিও জানি না। তবে চাকী তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে বাবলু মণ্ডল মাঝে মাঝে বুটলেগার ক্লাবে যেত। আর পল্লবী বুটলেগার ক্লাবে চাকরি নেওয়ার পর রনিও সেখানে যেত। পল্লবী নিউটাউনের ফ্ল্যাটে চলে আসার আগে, অর্থাৎ যখন তার সঙ্গে পিটার অরোরার প্রেম ততটা জমেনি তখন, রোজ রাত্তিরে রনিই পল্লবীকে বাড়ি পৌঁছে দিত। আমার অনুমান, বুটলেগার ক্লাবেই রনির সঙ্গে বাবলু মণ্ডলের আলাপ হয়।'

'আমার শেষ প্রশ্ন, 'ফেরারি' ছবির জন্য জাহাঙ্গির খানের কি আদৌ টাকা দেবার কথা ছিল?'

'ছিল। তবে কুড়ি কোটি নয়, পাঁচ কোটি। টাকাটা দেবার আগে অবশ্য খবর পাওয়া গেল ধামানির অর্থাভাবের কারণে প্রজেক্টটা ডুবতে বসেছে। তাই শেষ পর্যন্ত বটুক টাকাটা জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে নেয়নি। এটাও চাকী জেরা করে বার করেছে। ছেলেটা কিন্তু বেশ কাজের।'

'সন্দেহ নেই। দেখি, ওর আর শিকদারের জন্য একটা অ্যাওয়ার্ড-ট্যাওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ভুললে চলবে না, শিকদার তোর প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

৪

'আমি কাতার চলে যাচ্ছি। আমার ছোট ভাই-এর কাছে। সাবিনা আর তার মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আবার কবে আসতে পারব জানি না। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসার ইচ্ছে নেই। আমার আর সাবিনার দুজনের সংসারই তো একেবারে ছারখার হয়ে গেছে। দূরে থাকলে কিছুটা ভুলে থাকা যাবে।' নুসরতের গলাটা ভীষণ দুঃখী শোনাল।

'সাবিনা কেমন আছে?' আদিত্য সাবধানী গলায় বলল। তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'জয়া অধিকারীর সঙ্গে ফিরদৌসের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে?'

'না জেনে উপায় কি? খবর কাগজ আর টেলিভিশনগুলো তো দিনের পর দিন ওইসব নিয়েই বলে যাচ্ছে। এরকম রসাল খবর তো তারা চট করে পায় না। তবে আমি বলব শাপে বর হয়েছে। জয়া অধিকারীর ব্যাপারটা জানতে পারার পরে ফিরদৌসের মৃত্যুর শোকটা সাবিনা খানিকটা সামলে নিয়েছে।'

'মনে হয়, একটা শকের ওপর আর একটা শক কিছুটা পজিটিভ রেজাল্ট দিয়েছে। ওই নেগেটিভ-নেগেটিভ মেলালে যেমন পজিটিভ হয় আর কী।' নুসরতের দাদা ইনামুর হালকা গলায় বললেন।

'না, না। ঠিক তা নয়। আমার অনুমান, সাবিনার এখন মনে হচ্ছে যে-ফিরদৌসকে সে এতটা ভালবাসত, যে-ফিরদৌসের জন্যে সে এত কষ্ট পাচ্ছিল, সেই লোকটাই তো তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। অবিশ্বস্ত স্বামীর জন্য সে কেন কষ্ট পেতে যাবে?' নুসরত থেমে থেমে বললেন।

'সাবিনার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভাল লাগত। ওকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলেছিলাম। সাবিনা আসতে চাইল না। বোধহয় ফিরদৌস সংক্রান্ত সব কিছু ও ভুলে যেতে চায়। এখানে এলেই ওর ফিরদৌসের কথা মনে পড়ে যেত।' কথা বলতে বলতে নুসরত তাঁর হাতের ব্যাগটা খুললেন।

'জাহাঙ্গির খান তো এখনও পুলিশ হেফাজতেই আছেন?' আদিত্য খানিকটা দায়সারা ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আমার স্বামী পুলিশ হেফাজতেই আছে। তার উকিল বেল-এর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। পায়নি। দেশদ্রোহীরা বেল পায় না।' নুসরতের চোয়াল শক্ত হল। শুনেছি বটুক সামন্তও জেলে আছে।'

ঘরের আবহাওয়াটা ভারী হয়ে উঠছে। আদিত্য কথা ঘোরানোর জন্য ইনামুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি তো বহরমপুরের। আপনি ফিরদৌসের সঙ্গে জয়া অধিকারীর সম্পর্কের কথাটা জানতেন না?'

'অনেকদিন আগে একটা কেলেঙ্কারি হয়েছিল। সেটা জানতাম। কিন্তু তার পরেও এতদিন যে ফিরদৌস জয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছিল সেটা জানতাম না। আসলে আমি তো অনেকদিন বহরমপুর ছাড়া। তাই ওখানকার খবর-টবরও আর রাখা হয় না।' ইনামুল তাঁর কফির কাপে চুমুক লাগালেন।

'আপনারা কবে চলে যাচ্ছেন? টিকিট হয়ে গেছে?' আদিত্য নুসরতের দিকে তাকিয়ে বলল।

'সামনের বুধবার। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। হাতে সময় বেশি নেই। ভেবেছিলাম আপনার সম্মান-দক্ষিণাটা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করে পাঠিয়ে দেব।' নুসরত তাঁর খোলা ব্যাগ থেকে একটা চেক বার করলেন। 'কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে না গেলে অধর্ম হবে। আপনি আমার কতটা উপকার করেছেন আপনি নিজেই জানেন না।'

নুসরত উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁর দাদাও। আদিত্য চেকটা হাতে নিয়ে বলল, 'আপনারা ভাল থাকবেন। সাবিনার জন্যে আমার শুভ কামনা রইল।'

ওরা দুজন আদিত্যর আপিস থেকে বেরিয়ে যাবার পর আদিত্য আড়চোখে চেকটার দিকে তাকাল। এই টাকায় এখন তার বেশ কিছুদিন চলে যাবে।

মেসের দরজার সামনে আদিত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে দুটো সুটকেস, পিঠে ল্যাপটপের ব্যাগ। সুটকেস দুটো এত ভারী যে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে তাই ও-দুটোকে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছে। ব্যাগটাও নেহাত হালকা নয়। দুটো সুটকেস আর ব্যাগের মধ্যে তার জাগতিক সম্বল প্রায় সবটাই এঁটে গিয়েছে। বেশিরভাগটাই অবশ্য বই। তাই এত ভারী। এর বাইরে যেটুকু পড়ে রইল, দু-একবার এসে নিয়ে গেলেই চলবে।

'চললে তাহলে?' বলরাম এসে সামনে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ রে, চললাম। তবে ঘরটা এক্ষুনি ছাড়ছি না। কিছু জিনিসও রয়ে গেল। ওগুলো নেবার জন্যে দু-একবার আসতে হবে। তোরা সবাই ভাল থাকিস।' আদিত্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল।

'আমাদের আর ভাল থাকা। ম্যানেজার তার গাঁয়ের কাকে যেন ঢোকাতে চায়। আমাদের টিকতে দিচ্ছে না। খুব বেশি দিন এখানে থাকতে পারব বলে মনে হয় না।' বলরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'শোন। তুই যদি এখানকার কাজটা ছেড়ে দিবি ঠিক করে ফেলিস তাহলে আমাকে একটা খবর দিস। আমার ফোন নম্বর তো তোর কাছে আছে। আমাদের একটা লোক কিন্তু দরকার হবে।' আদিত্য দেখতে পেল একটা নীল রঙের মারুতি সুইফট ডিজায়ার আস্তে আস্তে তাদের মেসের গলিটায় ঢুকছে।

কেয়ার গাড়ি নিয়ে আসার কথা। সে কেয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছে। কেয়া এসে তাকে তুলে নেবে।

গতকাল একটা শনিবার ছিল, তার আগের শনিবার, খুব অনাড়ম্বরভাবে, সে আর কেয়া রেজিস্ট্রি বিয়েটা সেরে ফেলেছে।

আসলে ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। এতটাই তাড়াতাড়ি যে পুরো ব্যাপারটা এখনও আদিত্যর অবাস্তব মনে হচ্ছে। আবার এটাও ঠিক, খুব বেশি ভাবতে বসলে আদিত্য কোনও দিনই বিয়ে করে উঠতে পারত না। কুমুদিনী রহস্য সমাধান হয়ে যাবার তিন-চারদিন পরে আদিত্য আর কেয়া গঙ্গার ধারে সেই নতুন রেস্টোরেন্টটাতে খেতে গিয়েছিল। সেখানে বসে যখন তারা খাবারের অপেক্ষা করছে তখন হঠাৎ, আদিত্যর মাথায় কী ভূত চাপল কে জানে, সে কেয়াকে বলল, 'আমাকে বিয়ে করবে, কেয়া?' শুনে কেয়া কেঁদে-কেটে অস্থির।

সেখান থেকে সেই রাত্তিরেই সোজা অমিতাভদের বাড়ি। পথে সারাটা রাস্তা আদিত্য কেয়ার হাত দুটো ধরে ছিল। নইলে কেয়াকে সামলানো যাচ্ছিল না। কেয়াকে এতটা ইমোশানাল হতে আদিত্য আগে কখনও দেখেনি। অমিতাভর কাছে যাবার কারণ, আদিত্য জানত, অমিতাভর খুব চেনা একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছে। ইস্কুলের পুরোনো বন্ধু। সে নিশ্চয় আদিত্যদের সাহায্য করতে পারবে।

অমিতাভর বিস্ময়, রত্নার উচ্ছ্বাস, গৌতমের টিপ্পুনি ইত্যাদি টুকিটাকিগুলো বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে, এর পাঁচ সপ্তাহ পরে একটা শনিবার সতীশ মুখার্জী রোডে রেজিস্ট্রার সাহেবের বাড়িতে আদিত্য আর কেয়া সই করে বিয়েটা সেরে ফেলে। আদিত্যর দিকে ছিল অমিতাভ আর গৌতম, দু-জনেই সস্ত্রীক। কেয়ার দিকে তার চার-পাঁচজন বন্ধু। তারপর সকলে মিলে বালিগঞ্জের একটা রেস্টোরেন্টে খাওয়া-দাওয়া হল। সেটা আটদিন আগেকার কথা। আর আজ একটা রবিবার আদিত্য নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য সে আর কেয়া দেশবন্ধু পার্কের কাছে একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেলেছে। ছোট ফ্ল্যাট, তবে বাড়িটা নতুন। বাড়ির মালিকের মেয়ে কেয়ার কাছে টিউশান পড়ত। একটা রট-আইরনের খাট কেনা হয়েছে, ওটাই সস্তা পড়ল, আর রট-আইরনেরই কিছু অন্যান্য আসবাব। দামে কম হলেও দেখতে মন্দ নয়। আর একটা আলমারি। তাছাড়া ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, গ্যাস-স্টোভ। টিভি এখনও কেনা হয়নি। বাড়িটায় কয়েকটা আলো-পাখা লাগানো ছিল। তাই ওগুলো আর কিনতে হয়নি। সারাজীবন হস্টেলে হস্টেলে কাটিয়েছে বলে কেয়া রান্না-বান্না কিচ্ছু জানে না। তার তুলনায় আদিত্যই বরং খানিকটা রান্না করতে পারে। সবার ওপরে ইউ-টিউব তো আছেই।

নীল গাড়িটা কেয়াই নিয়ে এসেছে। কেয়ার হলদে ডুরে শাড়ি রোদ্দুরে ঝলমল করছে। কেয়া সিঁদুর পরেছে। গায়ে হালকা গয়না। একেবারে অচেনা দেখাচ্ছে কেয়াকে। গাড়ির ডিকিটা কেয়ার জিনিসপত্রে ভরে গেছে। আদিত্যর একটা সুটকেসের জায়গা হল ড্রাইভারের পাশে, গাড়ির সামনের সিটে। অন্যটা পিছনের সিটে রাখতে হল। সুটকেসটা রাখার পর পেছনে খুব বেশি জায়গা বাকি রইল না। দু-জনকে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসতে হয়েছে।

বলরাম মেসের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। ওই মেস, মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে বেরোনো এই গলি, গলির মোড়ে গোপাল-নেপালের মুদির দোকান, সাইকেল সারাই-এর দোকান, বড়রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে বেঞ্চি-পাতা চায়ের দোকান, আদিত্য টের পেল, খুব মায়ায় জড়িয়ে রেখেছিল তাকে। এত মায়া সে আগে কখনও টের পায়নি। কম দিন তো থাকা হল না এখানে। গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। কেয়ার নতুন শাড়ি থেকে একটা আশ্চর্য গন্ধ আসছে। কেয়ার শরীরের অবয়ব, স্পর্শ, ঘ্রাণ আদিত্যকে চুম্বকের মতো টানছে। তবু সেই তীব্র শরীরী আকর্ষণের মধ্যেও আদিত্য হঠাৎ খুব বিষণ্ণ বোধ করল।